বীরভূমের পথে-প্রান্তরে







রামায়ণ-মহাভারতের যুগের রাঢ়ভূমি এই বীরভূম। অসংখ্য শক্তিপীঠ আর উপপীঠের আনাচে-কানাচে আজও ঘটে ঠাকুরের ঠাকুরালী, ফকির-দরবেশ-বাউলের ছদ্মবেশে। পরিব্রাজক-লেখকের স্বচক্ষে দেখা আর মরমী অনুভবে, ধরা পড়েছে সেই সব কাহিনী; যা' শুধু অসীম রোমাঞ্চে শরীর-মন ভরে দেয়। প্রতিদিনের দেখার আর জানার বাইরে অকথিত পুণ্য-কাহিনী— যা'আজও কেউ লেখেননি।

সন্ধ্যা-সুমনস' পাবলিকেশানস্
গ্রাম--বিদ্যাধরপুর (রেল ষ্টেশনের ২নং প্লাটফর্মের কাছে)
পোষ্ট অফিস--সোনারপুর, কোলকাতা--৭০০১৫০, জেলা - ২৪ পরগণা (দঃ)
ফোন--৯৮৩০৪৭৯৩২৪

প্রকাশক :
প্রেমানন্দ প্রামাণিক
গ্রাম—বিদ্যাধরপুর, পোষ্ট অফিস—সোনারপুর
২৪ পরগনা (দক্ষিণ), কোলকাতা —৭০০১৫০
মোবাইল—৯৮৩০৪৭৯৩২৪

প্রকাশ কাল ঃ
ভাদ্র (জন্মাষ্টমী) ১৪০৭ সাল

মুদ্রণে ঃ
লতিকা ইনভেন্ট গ্রাফিক্স
বিদ্যাধরপুর (রামপুর)

পরিবেশক ঃ

(১) জ্ঞান সঞ্চয়
(২) দে বুক স্টোর্স
(৩) দে'জ পাবলিশিং
(৪) মহেশ লাইব্রেরী
(৫) বুক ফ্রেন্ড
(৬) বলাকা
(৭) দত্ত বুক স্টল

} **কলেজ ষ্ট্রীট বইপাড়া**

(৮) সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার
৩৮, বিধান সরণী, কোলকাতা-৬
(বিবেকানন্দ রোড ক্রশিং)

লেখক পরিচিতি

প্রকৃত নাম	:	প্রেমানন্দ প্রামাণিক
উপনাম (দীক্ষান্ত নাম)	:	সোমানন্দ অবধূত। পবিত্র নর্মদা-তীর্থ অমরকণ্টকে 'গুরুমা' বেদবতী মাইয়া এই নাম দিয়েছেন।
আদি নিবাস	:	গোপালচক, গেঁও[illegible] মেদিনীপুর।
পেশা	:	কলিকাতা হাইকোর্টের আপীল বিভাগের এক উচ্চতম শাখাধিকারিক। বর্ত্তমানে অবসরপ্রাপ্ত।
নেশা	:	তীর্থ পরিব্রাজন, সাধুসঙ্গ করা, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য চর্চা করা।

ফোন : ৯৮৩০৪৭৯৩২৪

সূচীপত্র

বীরভূমের পথে-প্রান্তরে

রাম তার নাম

প্রথম অধ্যায় :

বীরভূমের পথে-প্রান্তরে

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

টাটা-বিড়লা-ডালমিয়া, ফোর্ড-এন্ডারসন বা মরগান এন্ড মরগান ফ্যামিলিতে জন্মাতে পারিনি। জন্মেছিলাম হতদরিদ্র এক পরিবারে, পঞ্চাশের এক কুটীল **কালসর্প-যোগের মকরসংক্রান্তিতে**, পৌষের সেই শেষ দিনটাতে। সেই **পুণ্য-লগ্নে**, সকলের পবিত্র মকরস্নান হলেও, আমি স্নান করেছিলাম **অশ্রুজলের বন্যায়**—এক সদ্যজাতের চিল-চেঁচানো, **মরণকান্নায়** ভেসে ভেসে। কেন না, জন্মের আগে **দশ মাস ধরে**—যে বিশ্বপিতা প্রতি মায়ের বুকে, শিশুর খাবার **সঞ্চয় করে রাখে**; সেই ভদ্রলোক কোন সঞ্চয় রাখেনি, আমার **মার বুকে**।

আবার জন্মের পরেই নাকি আমার সেই **ভক্তিমতী-মা**, পড়েছিল শনি-রাহুর কোপে। তাই **ভুগেছিল** বছর খানিক মেয়াদের **সুতিকা জ্বরে**। যার ডাক্তারী পরিভাষা হলো **Peurparal septicimia/ Post natal fever**. তো সেই ঈশ্বর প্রেরিত রোগই নাকি, কেড়ে নিয়েছিল আমার **সেদিনের খাবার; মার বুক থেকে**। নবজাতক এই **শুকর-সন্তানের**, সুখ কেড়ে নিয়েছিল, সেই **উচ্চ কুলোদ্ভব ভগবান** নামক ভদ্রলোক। সোনার বা রূপোর চামচ, মুখে নিয়ে জন্মাইনি।-তা'—**ওই উঁচু জাতের ভগবান, নীচু জাতের বে-জন্মার জন্য**, কষ্টই বা করবে কেন? তারই বা কী **ঠ্যাকা-টা** পড়েছে? ঠগীরা তো ঠকায়-ই।

গোরুর গোয়ালের **ছাঁচতলায়**, নীচু জাতের আমি নাকি বেজায় **চেল্লিয়ে ছিলাম**; রক্তে লালায় পুরোটা মাখামাখি হয়ে। আর আমার সেই মহা **ভক্তিমতী মা** তখন, জ্বরে আর মূর্চ্ছার ঘোরে পড়ে ছিল গোয়ালের **পাল্লাহীন দরজার কাছে**,(ভেতরে আমার মতো কয়টা গোরু বাঁধা ছিলো কিনা)! একটাই মাত্র শোবার ঘর ছিলো, সেই কুঁড়েটার। যেটার আলাদা কোন কামরা (Room) ছিলই না।

তো, সেই **শোবার ঘরের মধ্যে**, আমার জন্ম হওয়াটা ছিল,**অশাস্ত্রীয়-জন্মাশৌচ আর বেদ-বিরুদ্ধ**। তাই ঠাঁই হয়েছিল, গোরুর গোয়ালের **ছাঁচতলায়—আমার আর মায়ের;**

সেই কঠিন শীতের সারাটা রাতে। গোয়ালে জন্ম বলে, আমার **স্বভাব-চরিত্র আর মোটা-বুদ্ধি**—সবই নাকি হয়েছে হাড় জিরজিরে পাতি-গোরুর মত। ইস্কুলে না যাওয়া, দু' পাঁচ জন **পণ্ডিতে** সে কথাই বলে।

পৌষের **নতুন-চালের** ভাতের **ফ্যেণ মেগে এনে**, আমার বড়-পক্ষের বড়-জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি থেকে; তা'তে দশ-ভাতারী এঁদো **পুকুরের জল** মিশিয়ে পাতলা-পাতলা করে, ঝিনুকের খোলায় করে, আমাকে খাওয়ানো হয়েছিল নাকি **দুধের বদলে**। বাঁচিয়ে রাখতে হবে কিনা। যেহেতু **দেবতাব বাচ্চা** ছিলাম না—ছিলাম **শুকর-সন্তান**, তাই সেই বাচ্চা বাঁচানোর কত যে **ঝক্কি**, সেটা আমার **ভক্তিমতী মা আর চুল্লুখোর পিতা**—**হাড়ে হাড়ে** প্রতিদিন বুঝতে-বুঝতে, **হাড়মাস কালি** করে ফেলেছিল।

সেই আমার **বড় জ্যেঠীমা**, ফ্যেণটুকু (ভাতের মাড়) ভিক্ষা দেবার সময়, প্রায়ই নাকি বলতো যে, তাদের **কুত্তাটার জন্য ফ্যেণ কম পড়ছে**। একেবারে **হক কথা**। মানুষের বাচ্চা দামী, না **লেড়ী কুত্তার** বাচ্চা দামী? নাই বা হলো বিলাতী কুত্তা? মানুষ বড় হয়ে **চোর-বদমাস-বিশ্বাসঘাতক হয়**। কিন্তু কুত্তা ও পাঠশালায় পড়েনি। সে জান-মান-প্রাণ দিয়েই **প্রভু-ভক্ত** হয়, বেদম হরদম লাথি-লাঠি-ঝাঁটা খেয়ে, ফ্যেণ খেয়ে; অথবা **কিছু না খেয়েও!**

বছর খানিক ধরে কষে কষে, **জীবনরস-সুখ-মেদ-মাংস** কেড়ে নিয়ে, আমার সেই মার শরীর থেকে, শুধু ক'টা হাড় আর চামড়াটুকু রেখে, শ্রীমান **ভগবান সাহেব**, ছেড়ে দিয়েছিল আমার মাকে। **সুতিকাজ্বরের** সূতোয় টান মেরে বলেছিলো, 'চলে আয় ব্যাটা, ওতে আর কিছুই নাই—**ক'টা হাড়মাস ছাড়া!**' সেই **জ্বর** ভদ্রলোক, **হাড়-চুষা** ছেড়ে দিয়ে যেতে চায়নি বলে, সেই **মিষ্টার ভগবান** নাকি বেজায় রেগে মেগে—তার **সিষ্টার মা-শীতলার কাছে**; তাকে **গচ্ছিত রেখে** চলে গিয়েছিল বৈকুণ্ঠে!

জগৎপুরের সেই যে **মা শীতলা**, তার খাস চ্যালা ছিল **জ্বরাসুর**। জ্বরে আর জরায় **দোস্তি** হলো। খুব **মস্তি করে** দু'জনে মিলে—মাঝে মাঝে **টাখনা** মারতো ওরা আমাদেরকে, **মুখ বদল** করার জন্য। মড়া খেতে খেতে তাদের নাকি, **জিভে কড়া** পড়ে গেছলো। মা শীতলা তার বাছাদের এ হেন **দুর্দ্দশা দেখে**, আমার ভক্তিমতী মা সুরবালাকে; খুব কড়কে দিয়ে **শপথ করিয়ে** নিয়েছিল যে—**প্রতি বছর শীতলা পূজোর সময়, মিনিমাম একটা কচিপাঁঠা অবশ্যই দেবে। আর সেই বলির পাঁঠার দড়ি ধরে, টেনে টেনে নিয়ে যেতে হবে মন্দির পর্য্যন্ত; আমার মতো এই গাছ-পাঁঠাকে।**

যাবার আগে আমার সেই ভক্তিমতী মাকে, শ্রীকৃষ্ণ—মা-কালী—**মা শীতলা** নাকি, **স্বপ্নে দেখা দিয়ে** বলে গেছলো যে, 'আমাদেব কৃপা পেতে গেলে, চুরাশীলক্ষ যোনী ঘুরে আসতে হবে **আবার**। এখন যে ক'টা **জন্ম ঘুরেছিস** তুই আর তোর ছেলে-মেয়েরা—

ওগুলো **ফাউ—আসল না**! তবে, তোদের একটা **খাবার ব্যবস্থা** করেই যাচ্ছি। রাস্তার ধারে, বনে জঙ্গলে কচু-ঘেঁচু, শাক-পাতা **রেখে যাচ্ছি**। খালে-বিলে শাঁপলা-মাছ রেখে যাচ্ছি, পুকুরে-ডোবায়—**গু্য আর মড়াপচা কাদাজল রেখে যাচ্ছি**; তোদের **পেটপুরে মন ভরে** খাবার জন্য।

ও'গুলো ফুরোলে, খ্রীষ্টান-পাড়ার **লঙ্গর-খানায়** তোরা যাবি। ওখানে **রেঙ্গুন থেকে আনা**, পোড়া-পোড়া মোটা লাল চালের **লপ্‌সি পাবি**—দু' সান্‌কী ভর্ত্তি, ভেলীগুড় মেশানো। পেটের **নাড়ীভুঁড়ি উঠে এলেও**, বমি করা **বারণ**। চোখবুজে গিলে নিবি, আর বাচ্চাগুলোকেও ওই রকম গিলতে **শেখাবি**। **অভ্যাসে—কী না হয় বল**!'

স্বয়ং **ঈশ্বরের কথা কিনা**! তাই আমার মা, **মহা ভক্তিমতী** হয়ে উঠলো এর পর থেকে; হাতে নিয়ে **শাবল আর মুগুর**। শাবল না থাকলে, কচু-ঘেঁচু খুঁড়া যাবে না। আর **মুগুর** না থাকলে, আমাদের মত **ত্যাঁদড়-বাঁদর শুয়োরের সন্তানকে, ভগবানে ভক্তির পাঠ**, একদম **পড়ানো** যাবে না। যত দিন যেতে লাগলো, মায়ের ভগবানের সংখ্যা **বাড়তে** লাগলো। আর তাদের যত **পাঁচালী** আছে, সবই জানতে হলো আমাদেরকে—সেই **মা লক্ষ্মী থেকে বাবা শনি ঠাকুর পর্যন্ত**!

তবুও প্রতিদিনের ক্ষুন্নিবৃত্তি হলো না, **নিশ্চিন্তে** কোন দিন। তাই এর গাছের আম-জাম-বেল তো, ওর গাছের তাল-নারকেল-আমড়া-তেঁতুল; **চুরি করতে লাগলাম** একটু বড় হতেই। সেই **কেষ্ট নামক ঈশ্বর** ভদ্রলোক সম্ভবতঃ, আমার এই ছোট জাতের **ছুটকো** বাঁদরামের কথা, মাকে বলে দিয়ে থাকবে **চুপি চুপি**।

তাই হঠাৎ হঠাৎই, মুগুরের মার পড়তো **পিঠে আর পাছায়**! আমার মার বিচারে, **মিথ্যা বলা, চুরি** করা, মানুষ **খুন** করার চেয়েও **জঘন্যতম** কাজ। **বিশ্বাসটাকেই তখন** খুন করা হয়, আর পাব্লিক—চোরকে **একদম বিশ্বাস** করে না। দু'টো কাজ অবশ্য হতো তা'তে। (১) **ভেজালহীন ভক্তি-শিক্ষা**, (২) **ঈশ্বরকে খুঁজবার ধোঁয়া-ধোঁয়া প্রেরণা**। যদিও ভূত ধরবার প্রেরণাটা, হঠাৎই একদিন **পটাশ** করে আমার মগজে **ধাক্কা** মেরেছিল। তখন মনে হ'তো **ভগবান is equal to ভূত**। দশচক্রে পড়ে নিজের **চক্রটাকে হারিয়ে**, যে লোকটা **ঠুঁটো জগন্নাথ** হলো—সেটা ভূত না তো কী? **ভূত ধরাও যা'—ভগবান ধরাও তাইই**। তবে কিনা একটা শ্মশান থাকতে হবে **পেল্লায় গোছের**, কোন এক **পুরানো পাকুড়** গাছের তলায়, বাঁক-মারা কোন এক নদীর কিনারে! অজয়-ময়ূরাক্ষী-বক্রেশ্বর হলে তো—কথায় নাই!

তাই বাড়ী থেকে **পালিয়ে কলকাতায়** চলে এলাম। **ভূতেশ্বর আর ভূতেশ্বরীদের**, কোন আপিসে যদি একটা **চাকরী** হয়! Part time-এ তখন, **ভূত খুঁজতে পারা যাবে**! ওদের **ঠেকগুলোর** হদিশ, ভাল মতো জানতে হবে **আগে**। হাঁ, চাকরী একটা পেয়েও

ছিলাম—সোনাগাছির খানকীপাড়ায়। চব্বিশ ঘণ্টার চাকরের কাজ। বদলে free খাওয়া-থাকা আর পরার জন্য মড়ার জামা-প্যান্ট।

মড়ার জামা-প্যান্ট, ভূত-ভূত গন্ধ থাকে তাতে। গাঁজাখোর মড়া হলে, free-তে গাঁজা খাওয়া শেখায়। হাতের গলসীতে কেমন করে কলকেটা ধরে রাখতে হয়, সেটাও ওরা শিখিয়ে দেয়। আমার হাতে খড়ি হলো নিমতলা শ্মশানে—ভূতনাথ মন্দিরের পিছাড়ে—গঙ্গার পাড় ঘেঁসে রবিঠাকুরের সমাধির আড়ালে। সেখানে প্রদীপ দেওয়ার জায়গাটায় একটা খোঁদল ছিল। যার ভেতরে থাকতো, নারকেল দড়ি আর গাঁজার কলকে, আর এক ফালি শাড়ী-ছেঁড়া; কোন এক সাধ্বী মেয়ে-মড়ার।

ওই শাড়ী-ছেঁড়া মুতে ভিজিয়ে, কলকের পঙায় জড়িয়ে কষে দম মারলে; ফটাস শব্দ করে—জ্বলে উঠতো কলকেটা। জানান দিতো পেত্নি আর ভূতেশ্বরের আগমন বার্তা। রবি ঠাকুরের প্রদীপটা বেচে, একদিন নাকি শিব-বাবাকে চরসভোগ খাওয়ানো হয়েছিল। ভালই চলছিল এই নূতন চাকরী। খানকীপাড়ার ইজ্জত বলে কথা। শুরু হতো প্রতিদিনের রঙ্গীন সন্ধ্যা—চুল্লু আর মা-কালী মার্কা আড়াই টাকার বোতলের সাথে। বেশ খোদার খাসী হয়ে উঠছিলাম দিনকে দিন। ওই শালা নক্সালরা দিল কেঁচিয়ে, খানকী পাড়ার সুখের সংসার আর ভূত ধরবার পবিত্র সাধন কর্ম্মগুলো। কয়টা পেত্নী কেঁদে কেটে বলেছিল—মুকে বিহা করে লে ক্যানে! রাজী হইনি ওই ফুসলানিতে।

রাজ্যপাল ধরমবীরা পুলিশকে বললো, 'পিটো জী, বহুত খতরনক। যুবালোগোঁকো সহবৎ শিখানা জরুরী হ্যায়!' মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় বললো, 'থেঁতো করো ওদের উর্বর মাথাগুলো। যা'তে বুদ্ধি আর বর্ব্বর বদমাসী না গজায় কোন দিন ওখানে!' ঝাঁপিয়ে পড়লো C.R.P.F. আর আধা মিলিটারী-ফোর্স, ফোঁস ফোঁস করতে করতে সমস্ত যুবকবৃন্দের উপর, বাছ-বিচার না করে!

তাই পালাতে হলো নিরাপদ জেলা বীরভূমে। হায় আল্লাহ, সেটাও নিরাপদ ছিল না এতটুকুও। শ্মশান-মশান, আখের খেত, ঝোপ-জঙ্গল কোথাও বাদ নাই; খানা-তল্লাসী করতে। তাই পরে নিলাম গেরুয়া, নিজেকে লুকাতে।

শুরু হলো অন্য রকম বাঁচার ফিকির। ফ্রি খাবার-দাবার, গাঁজা-মদ আর কচি-ডাঁশা-ঝুনো সাধনসঙ্গিনী পাওয়া শুরু হলো। কালী কি করে তালি বাজায়, শীতলা কি করে ঝ্যাঁটা মারে, শেয়াল কি করে প্রহর হাঁকে, মা শীতলার গাধা কী রকম চেল্লায়, ভূত-প্রেত-ডাইনিরা, কেমন করে মড়া চিবোয় আর হাড়গোড় চুষে; সবই খুঁজতে লাগলাম—শিখতে লাগলাম বিদ্যেটা টুকটাক-ও! আর এই বইটা হলো, সেই ভূত আর ঠাকুর খোঁজার আর খেয়োখেয়ির বিষফল!

ও'তে নাকি লেগে আছে, কালকূট বিষ, কেউটের হিস্-হিস্, ডাইনির ফিস্ ফিস্! মামদো ভূতেরা আমার গল্পে খানিকটা **টাখনা মারবার পর**—'**মা, মাগো**' বলো—সেই যা' কেটে পড়েছে; আর আমার ধারে কাছেও ঘেঁসেনি।

সং সাজা ল্যাংটা এক শিব-সাধু একদিন ওদেরকে খুঁজে না পেয়ে, গাঁজার ঘোরে আমাকে বলেছিল, "মামদো-গুলান্‌রে তারাইয়া ভুল কর-লা। অগো-রে বইখান দিসিলা ক্যান? গাঁজাখুর বই পরে, না বউরে পিটায়? ত্যর ক্যন আক্কেল নাই? ত্যরে একখান এমন চাকরী দিয়া দিমুনা, কইল্‌কেতার হাইকুটে, যে তুই মাথা কুইটাই মরবা। ত্যর মাইনাই হইব, তর আর্দালীর থিকা কম। হেইডাই ত্যর শাস্তি—ঝা।" করজোড়ে সেদিন বলেছিলাম, 'ভগবন, বইতো দিইনি ওদের। শুধু গল্প শুনতে চাইলে—বলেছিলাম **একটা গল্প মাত্র**! ওতেই ওরা হয়ে গেলো **পগার পার**! আমি এখন কি করি? প্রভু, আমার তো কোন দোষ নাই!'

তেমনি বিস্মিত রাগত স্বরে সেই বিশ্বপিতা রুদ্র বলেছিল, "কী ক্যইলা? একখান গল্প শুইনাই, সব মামদো-গুলান পালাইসে, ত্যর গপ্পে কী—ভয়-ডর মিশাইসিলা? ভূতেরে ডরাইছ্যস! ত্য' মনে লয় তুই গপ্পগুলান এমনই বানাইছ্যস যে, অগোর শরীলডায় **নিশ্চয় শিরশিরানি তুইলা দিসিল(অ)**! দুই চার-ডা আমারে শুনা ত্য' দেহি! আমারও **শরীলডা শির-শিরাইয়া উঠে কিনা** দেহি! তার আগে গাঁজার কল্কিডায় আর একবার ছিলিম চরা। দুই টান দিয়া লই। ত্যর **বিলাতী বোত্যলখান** আন **দেহি**! উই **শালী আইলেই ত'** সবটাই ফাঁকা করব(অ)! এই বেলায় দুই ঢোক দিয়া লই!"

বেশ জম্পেশ করে ঘণ্টা খানিক গল্প শুনবার পর সেই শিব-সাধু বললো,"হ'—হাল্যায়, এক্কেরে বরই সনত্যুষ্ট(অ) হইসি! শরীলডায় অহনো আমার শিরশিরানি লাগতাসে। তুই হালায় এক্কেরে আমারে **মারছ্যস**। তরে একখান বই লিখবার কই। যা' কিনা পণ্ডিতে পরব(অ)। **যা' দেখবা ওইই লিখবা, হুইনা হুইনা বুলি কপচাইবা না**—কইয়া দিলাম। যা'—লাইগ্যা পর, ত্যর পাপ মুকুব কইর্‌্যা দিলাম।'

বক্রেশ্বরের মহাশ্মশানে, প্রায়ই খুঁজে বেড়াই তাকে পাগলের মত, **বীরভূমে** গেলে। তাকে খুঁজতে খুঁজতে পরিচয় হয়, কত কিছু ঘটনার সাথে। **রোজ-নামচার** খাতা ভরে যায়। এক এক করে **কাহিনী**, আর **অনুভবের মালা** গেঁথে চলি।

হাজার হাজার মুনি-ঋষি-তান্ত্রিকের, তপস্যা আর সাধনার যে **চিৎকণা** ছড়িয়ে আছে; লালমাটির রঙ্গীলা **বীরভূমের পথে প্রান্তরে**; তার **অমল** আর **অমরস্পর্শ** পাই। আর সেই **স্পর্শসুধা**, ক্ষুধা বাড়িয়ে দেয় অজানাকে জানার। মহাকালীর খণ্ড দেহাংশ পড়ে, তৈরী হয়েছে যে **পীঠস্থানগুলো**; তাইই টানে বার বার **অমোঘ টানে**। পাগল করা সে টান, টান মারে বড় নির্দ্দয় ভাবে। ককিয়ে উঠি তখন—**মা-আ-আ** বলে। টনটন করে

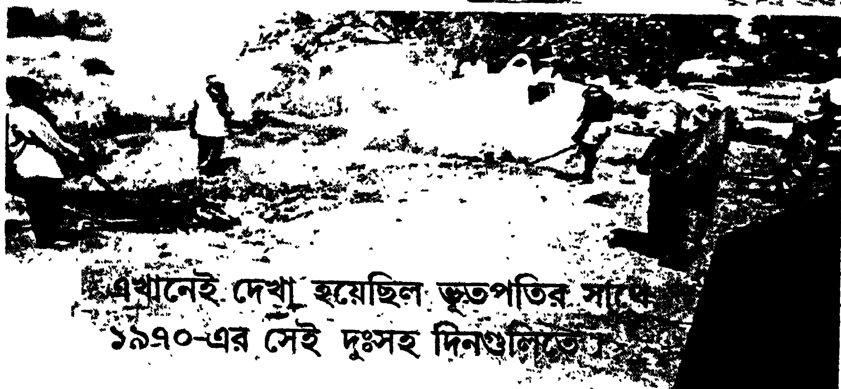
এই মনটা, সেই সম্বেদনার গর্ভগৃহে—যেখানে কালী কী শীতলা ঘাপটি মেরে থাকে, তাকে হাঁকুপাঁকু করে খুঁজতে গিয়ে।



← বৈশাখে বক্রেশ্বর নদী



মহাকাল-মহাকালীর
নর্ত্তনভূমি (মহাশ্মশান)



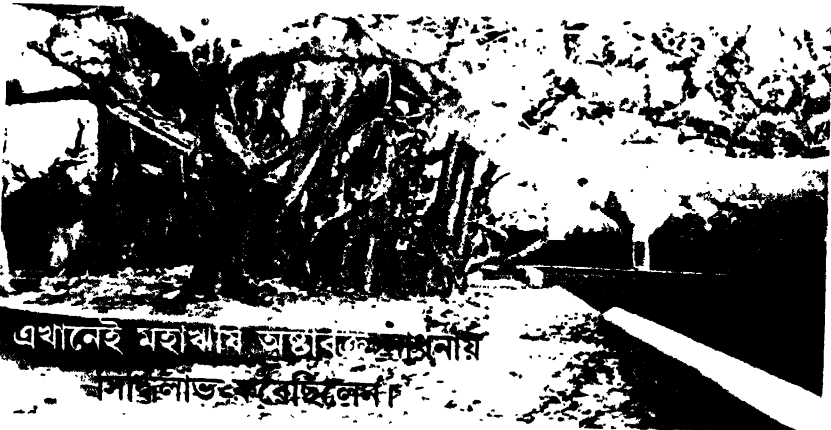
এখানেই দেখা হয়েছিল ভূতপতির সাথে
১৯৭০-এর সেই দুঃসহ দিনগুলিতে।



সিদ্ধসাধকদের মন্ত্রপূতঃ অস্থি এভাবেই পূজো পায় যুগে যুগে, ভক্তদের কাছ থেকে।



উন্মুক্ত আকাশের নীচে নির্জনে ভূতপতি লিঙ্গরূপে বিরাজমান।



এখানেই মহাঋষি অষ্টাবক্র সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

বীরভূমের পথে-প্রান্তরে



দুবরাজপুর পর্ব : অঘোরীর আনন্দকানন

বসে আছি একা একা। একটা চরম ঔদাসীন্য আমাকে গ্রাস করেছে। শেষ চত্তিরের বিকেল। দখনে হাওয়ারা **পাগলা-হাওয়া** হয়ে উঠেনি এ' কয়েকটা দিন, সামনের বোশেখের দিকে হাত বাড়িয়ে; হ্যান্ডশেক্ (hand shake) করতে। বীরভূমের দীঘিগুলোয় পদ্মফুলেরা, মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে **গুলবুল** করে, গল্প করে এই চত্তিরের বিকেলে। সামনে সন্ধ্যা আসছে, গোধূলির গেরুয়া শাড়ী পরে। যেই নাকি কালের[১] উঠোনে তার পা পড়ে, অমনি সে হয়ে যায় কালি[২]। কাল[৩] বলে, "আইলা নাকি?" কালী বলে, "হ'। ক্যান্, চিনবার পার না? কও, কী কইবা?"— ভোল্ পাল্টে যায় তার কালীতে[৪]।

এমনতরো অনেক কথাই, মনের মধ্যে তখন **ডন্** মারছে। আর আমি বসে আছি দীঘিটার পাড়ে। পেছনে **মামা-ভাগ্নে পাহাড়**, বাঁয়ে **অঘোরীবাবার সমাধি**। বক্রেশ্বরের সেই কিংবদন্তী সাধুপুরুষের **জটা** নাকি, ওখানে সব **জটিলতা** ত্যাগ করে, পড়ে আছে ঘাপটি মেরে। অবিশ্বাসীরা বলে **যদি বিজ্ঞানমঞ্চ** থাকতো, তবে সে ব্যাটা অঘোরকে; বেঘোরে মারা পড়তে হোত, একঘরে হ'য়ে। অথবা ওই বিজ্ঞানীরা ওকে **পেড়ে** ফেলতো, আমড়া পাড়ার মত করে **টিলিয়ে**। আর মেলাই ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ বন্ধ করে দিত রাম-কিলিয়ে। কারণ—এসব ওরা পছন্দ করে না। স্বাধীন দেশের জনগণকে **গুল্-তাপ্তি!**

বিনে পয়সায় পেলে, মড়ার মাথার **ঘিলুও** খাওয়া যায়। এই সহজ কথাটা বুঝতে, ঘিলুর দরকার নেই আদৌ। খালি দরকার চাট্টিখানি প্যারাক্‌টিস্ (Practice)। আর তা' করলেই হ'ল। পেত্থম পেত্থম তো গা গুলোয়। চুলোয় যায় যখন **ঘেন্নাপিত্তি**, তখনই নিক্তিতে মাপা হয় প্যারাক্‌টিসের বহর। আর তখনই হয়ে যাওয়া যায় **অঘোরীবাবা!**

১। সময়ের স্রোতের, ২। অন্ধকারময়ী, ছায়াঘনা রাত্রি। আমরা তাকে স্বাগত প্রণাম জানাই এই বলে, "**ওঁ রাত্রি পুরুত্রা......**" ৩। মহাকাল শংকর। মহাকালীকে কাছে না পেলে, যার ধ্বংসলীলা সমাপ্ত হয় না। শিবানী সে সিবা হ'য়ে মৃত্যুর প্রহর হাঁকে— খেলা ফেলে ঘুমোতে যা বাছা-রা। ৪। মহাকালী। সন্তানের সমস্ত কালিমা মুছে নিয়ে, যে কলকলিয়ে উঠে **বিপরীত-বিহারে** মহাকালের সাথে, শ্মশানভূমিতে। যেখানে বিশ্বচরাচরকে সে ঘুম পাড়িয়ে রাখে, আর শিবকে বলে, "তুমিও শোও—পাহারা দাও ওদের ভোলানাথ— প্রহর হাঁকো তোমার ডুগডুগিতে"। শ্মশান ছেড়ে তাই সে মহাকাল, পারে না পালাতে। তারপর যখন তার পায়ের নূপুরের কিঙ্কিনী শুনে, গাঁজার ঘোরে বলে "আইলা নাকি"?

তা' মাছের মুড়ো—কী মুরগীর মুড়ো, যাদের চিবুনোর অভ্যেস আছে, মবা মানুষের মুড়ো চিবুতে; তাদের আপত্তি হবে বা কেন? ও'তো ওদের কাছে নস্যি। আগের মুড়োগুলোয় পয়সা লাগে, মড়ার মুড়োয় পয়সা লাগে না। মহড়া দাও বছর খানিক, মাণিক আমার—সব ঠিক হয়ে যাবে। শুধু যা—ভূতের ভয়। না না, ভয় করলে চলবে না। ভয়ডর থাকলে, ওরা জ্যান্ত মানুষের হাড়ে হাড়ে খটাখটি বাধিয়ে দেয়। পেঁচো ভূতেরা মাঝে মাঝে, ছ্যাঁচড়ামো করে হাড় ছুঁড়ে মারে; পাকুড় গাছের মগডাল থেকে। ওদের বাপেরা, শ্মশানের ইজারা নিয়ে রেখেছে নাকি? গোপাল সাধু আগে, না ভূত আগে?

বরং ওদের না চটিয়ে, বুদ্ধি খাটিয়ে, হিসেব কষে, বেশ মোলায়েম করে বলতে হয়—

"ভুত আমার আসল পুত,
পেত্নি আমার নকল ঝি—
আয় খাবি আয় মড়ার ঘিলুর,
গলে যাওয়া ভারী সুন্দর ঘি।
ইস্‌স্ মাইরি, মিছ্যা বলিনি।
আয়-না ক্যানে গাছের থিঞা—
সন্দ করিস্ নি!" .... সোমানন্দ অবধূত

"প্রতিদিন নিশুত রাতে শ্মশানে, একশ' আটবার বলতে হবে, ওই মন্তরটা জোরে জোরে পাকুড়-তলায় খেড়িয়ে। সেখানে ওই ভূতেরা বাদুড় হয়ে ঝুলে মুখ নীচু করে, কোল্ প্যাঁচাদের স্যাঙ্গাৎ বানিয়ে। বড় বড় চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে ওরা—

"লোটন ঘোষের মা,
তার গুটা তিনেক ছা।
সি বুড়িটো মর‍্যে যেচেক্
শাদ্দ হবেক্ লা।
লাশটা উয়ার পুড়া ক্যানে,
গিলু টুকান্ খা।
নিবা চিতার কাঠগুলান্
ধরাই লিগে যা। তার গুটা তিনেক ছা—
ফ্যেলাঞ যেছেক্ লাশটো উয়ার,
চিতা জ্বালবেক্ লা।" .... সোমানন্দ অবধূত

তা' একশ' আটবার গুনতি তো করতে হবে। কিন্তু কেমন করে সেটা হবে সেটাই

ভাবনা! "লুড়ি পাত্থর লাও ক্যানে? দিনের বেলাই রাখ্য ক্যানে গুন্‌তি ক্যোরাঁ। রাতির বেলাই ওই মন্তরটা জপ ক্যানে গলা ফাটিয়ে—চিল চেঁচিয়ে পাকুড় তলায় খেড়িয়ে। উয়ারা পালাইবেক্ ব্যাবাক্ গুলান্ ডানা ঝাপট্যে। উ শালারা মনিষ্যি মানছেক্ লাই ক্যান গ' তুকে সাদুবাবা? তুর কী ভূতের সাথে আড়ি আছেক? তু ডরবার লাগছিস বটে! তুকে শিখাঞি দুবক্ সাধুবাবা।

রাতির বেলাই শ্মশানে আসিস্ ক্যানে! একবার মনতর্ বুলবি, আর একবার পাত্থর মারবি উয়াদের মুখে। পাত্থর শেষ, ত' মন্তর শেষ। একশ' আটবার হোল বট্যে? দে দে ক'টা পয়সা, দশটাকা কী তিন টাকা। কারণ খেঞ্যা লাগবি কাজে। আইন্‌ব সোন্‌ঝা বেলাই। মা, দে ক্যানে পাঁচ ট্যাকা! কারণ করি! পায় দি', পোচ্যা যেছেক গ'। শ্মশানের হাড়টো শালা, ফুট্যা যেছেক। ভাল হয় লাই গ', যন্‌তনা হোছে!"

কথাগুলো বলেছিল গুপাল সাধু। কেউ কেউ বলে সে নাকি বাউল। মা বলে, "গোপাল—সাধুও না, বাউলও না। বোকা আর পাগল। ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, আর ভূত ধরবার বিদ্যেটা শেখাবে বলে বলে; সবাইকে ঠকায়। অনেক তার Part time শিষ্য আছে বটে, তবে সব সময় নয়। ঠিক—সে যখন একটা বড় বোতলের (liquor) পয়সা রোজগার করে, তখন। ওরা আসে, আশেপাশে—পাশে পাশে—কেশে কেশে প্যাসাদ পেতে, ফ্যাসাদের মত। ওদের যত কিছু ভক্তি, তলানিটুকু থাকা পর্য্যন্ত। বোতল শেষ, তো ভক্তিও শেষ।

রেশ্ থাকতে থাকতে রেসের ঘোড়ার মত পালায় মাঠ ভেঙ্গে, পাকুড়তলার পাশ দিয়ে, বাঁয়ে রেখে অঘোর নদীটাকে, হেতমপুরের রাজবাড়ির দিকে। এলেমও'লা গুপালকে এলাম্ গ বলে। কারণের ঘোরে, অকারণে গুপাল প্যাচাল পাড়ে না। তখন খালি শুধোয়—তুর‍্যা "যেছিস?" ওরা তালে তালে মাথা হেলিয়ে— পৈতে দুলিয়ে— পেট ফুলিয়ে বলে "হঁ গুর্‌জী, যেছি বটেক। কাল ভূত ধরা শিখেঁ লুব ক্যানে! পাত্থর কুড়াই রাখবক্ গ'। মুক্যে বিশ্বাস লাই?"

গোপালও ভাবে—"শিষ্য হলো, সন্তান! বিশ্বাসটো করবার্ লাগবেক বটে।" কাল আবার ওরা আসবে গুরুর কাছে, চালভাজা আর কড়াইভাজা নিয়ে। চাঁট হবে একটা একটা গোটা বোতলের সাথে। গোপাল বসে বসে ঝিমোয় পাকুড়তলায়। মড়ার হাড় পায়ের তলায় ফুটে, পচা ঘা হয়েছে সেখানে—গ্যাংগ্রীন হ'বার উপক্রম। তা'কে দশ টাকা কী তিন টাকা দিলে, সে কারণ-বারি ঢালবে সেই পচা ঘায়ের উপর। আর মা তারার দয়ায় তার পা ভাল হয়ে যাবে। যদি তা' না হয় তো তার পিসি[৬] মা-কালীকে সে বলে দেবে যে, তারা তা'র কথা শুনেনি। গোপালের সাধনায় সে ইচ্ছে করেই বিঘ্ন ঘটাচ্ছে।

৬। গোপালের মতে, মা তারা-র পিসি হ'ল, মা-কালী। কেন যে সে তার পিসি, সেই গল্প যেমন আমাকে গোপাল বলেছে, সেই রকম বলব, সময় এলে পরে। এখন অন্য কথা বলছি।

মা-কালীর হাতের খাঁড়াটা অনেক বড়। তারাকে 'খাড়া' বলে, এমন তাড়া তাকে করবে যে, ছোট খাঁড়া নিয়ে— সে কালীর সাথে লড়ে উঠতে পারবে না। তারার পায়ে শাড়ী জড়িয়ে গেলে, সে পড়ে যাবে, দৌড়াতে পারবে না। কালীতো উদ্যোম ল্যাংটো। কালীর সেই পড়ে যাবার ব্যাপারটাই নাই। যা'তে তারা ভাল করে ঠ্যাং মুড়ে পড়ে যায়, তাই তাকে একটা নতুন শাড়ী কিনে দিয়েছে গোপাল; কারণের বোতলের থেকে খানিকটা খরচ ছেঁটে। বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিয়ে সে, বসে থাকে প্রতিদিন বক্কোমুনির পাকুড়তলায়। আর ভাবে, এই বুঝি তাড়া করলো তারাকে **মা-কালী**। কালই একটা হেস্তনেস্ত সে করতে চায়।

মা-কালী আসে না। আর ব্যাপারটার **ফয়শালা** না হ'লে, তা'র ভূত ধরার ব্যাপারটাও এগোয় না। একটার পর একটা কাজ, করতে হবে তো তাকে। একেবারে যা'কে বলে— ওয়ান্ আফ্‌টার অ্যানাদার্—সিরিয়ালি—সিরিয়াস্‌লি। আস্‌লি কথা হ'ল, মা-কালীটা আর আসছে না, অনেক অনেক অভিযোগ—টাটকা টাটকা দায়ের করেও তা'র কাছে। গোপাল এমত অনুযোগের বস্তাটা খুলে মেলে ধরেছে, মাঝ রাস্তায় 'বিশে'র রিকসা থামিয়ে, মাকে আর আমাকে পাকড়ে।

মা'র সাথে আমার মত একখানা **পেঁজী সাধুকে** দেখে, সে আমাকে **গুল্** মেরেছে যে, ভূত ধরা সে আমায় শিখিয়ে দেবে। মন্তরটা আগে ভাগে বলে দিয়েছে—মুখস্থ করে ফেলবার জন্য। **"ভূত আমার আসল পুত....."**। মাকে সাক্ষী রেখেছে সে। ক'টা দিন পরে অমাবস্যা এলে, নিশুত রাতে সে আমাকে নিয়ে যাবে; বক্কোমুনির শ্মশানে। শাসনে রেখে, গুরুগৃহে থাকার মত করে পাঠ পড়াবে, একশ আটটা পাথর ছুঁড়ে ভূতের দিকে। বাদুড়-প্যাঁচা মার্কা ভূতেরা, তার কাছে বহু আগে **মার্কড্** (marked) হয়ে গেছে । এখন শুধু একশ' আটটা পাথর-নুড়ি জোগাড় করা, আর দশ কী তিন টাকায় একটা বড় বোতল এনে, কচুরিপানার মধ্যে পুঁতে রাখা। তা'হলে সেটা আর কেউ, **গেঁড়িয়ে** দিতে পারবে না। গোপালের সাথে চালাকি! **পূজার দোব্য** কিনা!

অতি সরল এই গোপাল, মাকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করে, দু'টো কারণে। প্রথমতঃ মা'র এক বিঘৎ চওড়া, বিনুনী করা—ফুট চার-পাঁচেক লম্বা জটা আছে। সেটা গোপালের মাথায় ঠ্যাকালে, সেদিন তার তাড়াতাড়ি বউনি হয়। পায়ের পচা ঘা-টা ঘাঁটায় না তা'কে। আর দ্বিতীয়তঃ মা কখনো সখনো গোপালকে, নিজেই একটা-আধটা বোতল দেয়, যা'তে কিনা শংকর খ্যাপার সমাধিতে, সে ঝাড়পোঁচ করে ধূপ দীপ জ্বালাতে ভুলে না যায়।

সে বেটী আবার গোপালকে ভয়ও দেখিয়ে রেখেছে যে, অনাসৃষ্টি হ'লে বুড়ো-খ্যাপা ত্রিশূল নিয়ে তা'কে তাড়া করবে। ভয়ে ভয়ে সে, সব কাজ ঠিক ঠিক করে। ক্ষোভ তার দু'টো। এক হ'ল— প্রতিদিন তার বউনি হয় **বড্ড দেরীতে**। আর দুই হ'ল—মা-কালী কেন এখনও তারা-মাকে খাঁড়া নিয়ে তাড়া করলো না! ভূতেরা নাকি প্রতিদিন রাতের বেলায়, **মজলিস বসায়**। সে কিছু করতে পারেনি বলে **ভ্যাঙচায়**। আর প্যাঁচা-ভূতেরা

তা'কে চোখ মারে—সীমাহীন **অপমান** করে। হৃদয়ের গোড়ায় তার, অনেক অনেক দুঃখ জমেছে; **পাললিক শিলার** মত!

রিক্সার হাতল ছেড়ে দিয়ে সে, আমাকে চুপি চুপি এক পাশে ডেকে নিয়ে, কানের কাছে ফিসফিসিয়ে—এই **চরম সত্যি** কথাটা বলেছিল মাকে এড়িয়ে। সে বেটীও যখন তা'কে শংকর-খ্যাপার* ভয় দেখিয়েছে, তখন আড়ি তার সাথেও । আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে রাস্তার উপর, যখন এসব গোপন শলাপরামর্শ চলছে, সে সময় বে-আক্কেল একটা স্টেটবাস; রাসভারী ভেঁপু বাজিয়ে কেঁচিয়ে দিল সবটা তার।

কী আর করা যায়। মা-ই সমাধান করলো তার ব্যাপারটার। শংকর খ্যাপাকে গোপালের ব্যাপারটা বলবে মা। মা'র গুরু কী না সে। আর কথা দিল যে, আমার মত একটা **কচি-পাঁঠাকে** তার একদম **খাস্ চ্যালা** বানিয়ে দেবে। হাইকোর্টের বাঁ-হাতের পয়সায়, আমি বানিয়ে দেবো তার আশ্রম, অঘোর নদীর পাড় ঘেঁসে। সেখানে একটা **দ'য়ের** মধ্যে, চ্যাংগুড়ি [চ্যাং আর গড়াই (ল্যাটা)] মাছেরা; চ্যাংড়ামো করে চোত-বোশেখের শুখার দিনে।

প্রতিদিন সেই **মাছপোড়া** দিয়ে, সে ভোগ চড়াবে ভূতের রাজা, তিন-মাথাওলা **শ্যাওড়াগাছ নিবাসী** মামদোকে। দুটো মাথা যার বাদুড়ের আর বাকীটা প্যাঁচার। কোন প্যাঁচপাঁচ নাই তার কথায়। শুনলে ব্যথা জুড়িয়ে যায় আর মনটা খই-মুড়্কীর মত হাল্কা-পল্কা হয়। দুঃখটা তার মুড়কীর মত **মিষ্টি মিষ্টি** কিনা!

খুব খুশী হ'য়ে, লম্বা হয়ে সে প্রণাম করলো মাকে। আর আমাকে সে বললো তা'কে (গোপালকে) প্রণাম করতে। মা বললো যে, যখন থেকে আমি তার **চ্যালা** হবো তখন থেকে আমার **সেলাম** শুরু হবে। তার আগে হয় কী করে? মা আমাকে নির্ঘাৎ রকম **সেদ্ধ** করে, শুদ্ধ করে না দিলে? অকাট্য যুক্তিতে মুক্তি পেলাম আমরা, সেদিন তার হাত থেকে।

গোপালের বহু জ্যান্তগল্প আমি বলবো পরে, অন্ত নাই যার। চার-পাঁচখানা খণ্ডে সেটা বলতে হবে। অণ্ডের **কুসুমের** মত, সে ব্যাপারটা এখন থাক না হয় , ঘুমিয়ে খোলের ভেতর। ঘটনার **মামলেট্** বানাবার সময়, প্যাঁজ-লংকা দিয়ে **বঢ়িয়াঁ** করে বানাবো—পাঠককে **লবডংকা** দেখাবো না, পাকা কথা দিচ্ছি।

তো এই যে গোপালবাবা, সে কেমন দেখতে? কত বয়স তার? মা বলে চল্লিশ-বেয়াল্লিশ। গোপাল নিজে বলে **পনের-ষোল**! এতটুকুও মিথ্যা নাকি গোপাল বলে নি।

*** শংকর খ্যাপার নাম নিয়ে বিভ্রান্তি আছে। এই শংকর খ্যাপা লালবাবা নামেও পরিচিত ছিলেন।**

অত বয়স হলে কী, তার দাড়ি গোঁফ গজাতো না? আসল ব্যাপারটা হ'ল যে, সে জন্মসেদ্ধ **পিচেশ** তান্ত্রিক। তাই বয়সটা তার বাড়েনি, এতটুকুও সামনের দিকে তার পার্মিশান্ ছাড়া। পার্মিশান দিলেই হল? বয়সটা পাশের দু'দিকে বাড়বার চেষ্টা করেছিল কিছুদিন। পায়ের পচা ঘা-টা, বাড়াবাড়ি করতে দেয়নি। ঘা-কতক **সেঁটিয়ে** দেবার পর নাকি, ঠাণ্ডা হয়েছে। ভুড়ি কী চর্বি বাড়েনি। তা'র মনের কৈশোর কাড়েনি।

আমার খুব ইচ্ছে হ'ল, গোপালকে আরও একটু **উসকে** দিতে। কোমরের গেরুয়ার কসি থেকে, এক ঝটকায় কুড়ি টাকার একটা **ঝাঁ-চকচকে** নোট বের করে বললাম, "আজ তুমি মা-কালীকে, কারণে **চুবিয়ে** রাখবে ঘাড় ধরে। এই নাও কুড়ি টাকা। পাঁচ বোতল মাল হবে। একটুকুও গ্যাঁড়াবে না ওর থেকে। তা'হলে ওতে আর মাকে, চুবিয়ে রাখতে পারবে না। আর সে নিঃশ্বাস নিতে পারলে, তোমার কাজও হবে না। **দম বন্ধ** হয়ে যখন ছটপট করবে—তখন ওরই খাঁড়াটা নিয়ে, ওকেই **কাটতে** চাইবে। দেখো, মা-কালী রাজী হবে তোমার কথায়, আর ওর ভাই-ঝি তারা-কে **দৌড়** করিয়ে ছাড়বে। তুমি শুধু তারা'র **ঠেক্‌টা** দেখে এসে, মা-কালীকে **চুপি চুপি** জানিয়ে দাও যে, সে ওই **ঠেকে** কখন থাকে আর কী করে! এমনিতেই ওর মুখে রক্ত লেগে আছে, মা-কালী এবার ওরই মুখে **রক্ত তুলবে,** বেদম ঠ্যাঙানীর চোটে।"

আমার যুক্তি তার মনে লাগলো। সে ঢপাস্ করে প্রণাম করলো আমাকে, দুপায়ে হাত দিয়ে, যদিও সে পা দুটো ছিল বিশুর। মানে বিশে সাঁওতালের। মা এতক্ষণ ধরে, মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসি চাপছে। তাড়াতাড়ি কেটে পড়লাম, বিশুকে চোখ মেরে। সে জোরে চালিয়ে দিল তার গাড়ী, শংকর খ্যাপার সমাধির দিকে। এখনও অনেকটা যেতে হবে তো।

এ সব কথা **ভাবছি** বসে বসে, অঘোরীবাবার **সমাধি** থেকে একটু দূরে, দীঘির পাড়ে। ভেসে আসছে একতারাতে গান—

"জনম জনম হম রূপ নিহারলুঁ,
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনল,
শ্রুতিপথে পরশ ন গেল।।
কত মধু যামিনী রভসে গয়াঁয়লু,
না বুঝন কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয় রাখলুঁ,
তৈঅ হিয় জুড়ন না গেল।।" .... কবি বিদ্যাপতি

হায় রে—মধুবসন্তে এ'কী গান গায় ওরা। একতারায় সুরে সুর মিলিয়ে, কা'রা

যেন গেয়ে এই দিকেই আসছে সন্ধ্যার মুখে। এই দীঘির পাশের রাস্তা দিয়েই ও'রা যাবে। নারী-পুরুষের যুগল সুর, মাতিয়ে তুলছে চৈত্র মাসের নরম নরম সাঁঝকে। গেরুয়া মাটির বীরভূমের সাঁঝকে।

জনম জনম ধরে, কে কার রূপ দেখলো? কেনইবা— যে দেখলো, তার নয়ন তৃপ্ত হোলো না? যে মিষ্টি কথা কান দিয়ে সে শুনলো—তার কানের গহীন পথে কেন তা' ঢুকলো না— কেন স্পর্শ করলো না, তার মনের মাটি? প্রেমের খেলায় যে কতশত রাত্রি ব্যয় করলো, সেই বা বুঝতে পারলো না কেন, সেটা কী ধরনের খেলা? লক্ষ লক্ষ যুগ ধরে এক হিয়ার ডোরে, আর এক হৃদয়কে যে বেঁধেছে, একটু জ্বালা জুড়ানোর আশা নিয়ে—তার যন্ত্রণা কেনইবা জুড়ালো না? বসন্তে বিচ্ছেদের এই সুর কেন? বসন্ত কী তাইই বয়ে আনে, বিরহীদের কাছে !

এ'কী বলছে এরা! তবে কী সব মিথ্যা, ফক্কিকার? হৃদয়ছেঁড়া পাগল করা গান, ওরা কারা গাইছে ! ভাবতে ভাবতেই এক অচিন ঔদাসীন্য যেন আমাকে ঘিরে ধরেছে। পাশ দিয়ে চলে গেল এক বাউল আর তার সাধিকা। পঞ্চদশী প্রায় হবে সে। বুকের মুকুল তার দুকূল ছাপিয়ে তখনও জানান দেয়নি যে, সে ডাঁটার মত পুরুষের মুড়ো চিবোতে প্রস্তুত। সবে হয়তো সে নেমতন্ন পেয়েছে!

সাধুসন্তকে সম্মান জানানোর, একটা রীতি আছে। তাই তাদের স্বাগত জানালাম জ্যয় তারা বলে। বসে আছি শিব াভোগ দেখবো বলে। ব্যাপারটা কী সেটা বুঝতে হবে, নিজের চোখে দেখে। মা বলেছে, "অনেক কিছু দেখবি প্যামানন্দো।" তাই সেই অনেক কিছু-টা যে কী, তাকে ধরবার—বুঝবার তালে আছি। অঘোরী বাবার সমাধিটা, বাঁ দিকে পেছন ঘেঁসে। সেখানেই হবে শিবাভোগ সন্ধ্যে বেলায়। কিন্তু তার তো, অনেক দেরী আছে এখনও।

সেদিন ঘটেছিল যে ব্যাপারটা, সেটাই এখন বলবো। সাধুমা সকাল বেলায় বলেছিল, "বাজারে যা প্যামানন্দো। যা পাবি—যা খাবি, তাই নিবি। তাই দিয়েই ভোগ হবে মা-কালীর।" পকেট হাতড়ে দেখে ছিলাম যে, ন'শ টাকার মত আছে। একা মানুষ আমি। দরকার বুঝলে আমি, ওখানে দেড় দু'মাস কাটিয়ে দিতে পারি, বিনা পয়সায়। খাবো ভিক্ষা করে, আর থাকবো মন্দিরের বারান্দায়। আমাকে খাওয়ানোর দায় তো—ওদের। ওরাই আমাকে ডেকেছে, চিঠি পাঠিয়ে।

তেমন তেমন বুঝলে, ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেই হ'ল। চাল কলা আলু, কিছু না কিছু তো মিলবেই! এখন দেখি উল্টো ঠ্যালা! বহু প্রাচীন মন্দির এই জলকালীতলায়। প্রতি বছর চৈত্র সংক্রান্তিতে, কী পয়লা বৈশাখে সেখান বিরাট উৎসব হয়। আর মা'র গরীব ভক্তেরা সেখানে আসে প্রসাদ পেতে। একেবারে হারামের পয়সায়

খায়, আর আরামে থাকে, ট্যাকের কড়ি খরচ না করে। লাই দিতে দিতে ও'রা মাথায় উঠেছে, দলে দলে তাই এসে জুটেছে। বিনা পয়সায় পেলে, পয়সা দেয় কে?

শংকর খ্যাপার (লালবাবা) শিষ্যা এই মায়ের উপর, ভর হয় মেলার সময়। সবাই বলে জ্যান্ত কালী। গোটা দুবরাজপুর-বক্রেশ্বরের লোকেরা, এক ডাকে তাকে চেনে—সমীহ করে। সাঁইথিয়া, কংকালীতলা কী তারাপীঠে গেলে তো, সবাই সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়ায়, মন্দিরের দরজা খুলে দিয়ে; তার এক বিঘৎ চওড়া আর ফুট-চারেক লম্বা বিনুনী করা জটা দেখলে।

তা' এ' হেন জ্যান্ত মা-কালী, এক কাপ চা সকাল সকাল দিয়ে, আমাকে বললো বাজারে যেতে। বললাম, " টাকা দাও। জনা পঞ্চাশ ষাট লোক তো , এসে গেছে দেখছি। সবাই কিছু কিছু টাকা মন্দিরে দিক। আর তা'ছাড়া, অত লোকের বাজার-হাট আমি; একাই বা আনবো কেমন করে? পাঁচ সাতজন চলুক আমার সাথে? এক রিক্সাভ্যান মাল হবে। আর তোমারই বা কী দরকার ও'সবে? যার দরকার সে হোটেলে খেয়ে আসুক। আমাদের জন্য এ' বেলা শুধু, ডাল ভাত হোক। ওই দিয়েই ভোগ চড়াও।"

সবাই যে যার কাজ আছে বলে, কেটে পড়লো। একটাকেও দেখা গেল না, আমার সাথে বাজারে যাবার জন্য। কারণ ছিল—দু'টো। এক—বাজারে গেলে তো, আমি তা'র কাছে পয়সা চাইতে পারি। আর দুই হ'ল—মাল বয়ে আনতে হবে। তাই কোন রকমে গা বাঁচিয়ে সবাই কেটে পড়েছে—আমার মত দুর্মুখ লোকের সাথে, কেউ যাবে না। মাথা গুঁজে বসে রইলাম মন্দিরের বারান্দায়।

অরূপদা নাকি বলে গেছে মাকে যে, আমি যেন বাজারে যাই। সকাল বেলায় আমার, চার-পাঁচ কাপ চা লাগে। মা সে ব্যাপারটা জানে। রাগের উপর জল ঢালতে, সে বেটী আরও দু'কাপ চা বানিয়ে নিয়ে, ধপাস করে বসে পড়লো আমার পাশে। চা খেতে খেতে বললো, "আমি না খেয়ে থাকি, তুই কী তাই চাস? সবাই কেন দেবে? তুই দে না বাবা। মন্দিরটা ভেঙ্গে পড়ছে, সারিয়ে দে না বাপ। শংকর খ্যাপার সমাধিটাও সারিয়ে দে। সবাইকে দিয়ে কী সব হয়? আমি জানি, তুই পারবি। তাইতো, তোকে বলি!"

বললাম, "তুমি খাও না, কে মানা করছে। প্রতিদিন আমিই বা তোমার, পঞ্চাশ ষাটজন ভক্ত শিষ্যকে, খাওয়াতে যাব কেন? কোন্ সুখটা আছে শুনি? আমি কী টাটা না বিড়লা? সে আমার দ্বারা হবে না। এত করে বললাম, "আমাকে চোর করে দাও, তা'তো করলে না। সাধু সেজে আমার কী লাভটা হোল? সকলের চড় চাপড় খাচ্ছি, আর নিজের কপাল চাপড়াচ্ছি ।"

—— চোর তো তুকে বানাই দিছিরে বাপ। বউমার টাকা তুই চুরি করিসনি বুলিস? আমার কাছে আসবি বুল্যা, তুই বউমার টাকা চুরি করেছিস। তুই চোর না তো

কী? চোরের পয়সা তো ভূতে খায়। যারা পালাঞ যেছে, তারা তো ভূত রে। ভোগের সময় খেতে আসবে, সবাই দলে দলে। চুরি করলে ভুগতে হয়। যা বাবা, ভূতের ব্যাগার দে। বিশ্বনাথ, তুই যা ক্যানে ছোট বাবার সাথে। ত্যুর গাড়ীটা লিয়ে যা, ভূতের বোঝা বয়ে আন্ ক্যানে। একটাকাও চুরি, কোটি টাকাও চুরি—ননীও চুরি— চোর সব ব্যাটা বটেক।"

চোখের তারার পানে এমন করে তাকিয়ে, মা কথাগুলো বললো যে, না মেনে উপায় নাই। মনের ভেতরে সেঁদোয়নি, সেগুলো তখনও সবটা। মাথা গোঁজ করে বসে বসে, সেই কথাগুলো বুঝবার চেষ্টা করলাম। ঠাণ্ডা হতে লাগল আমার চায়ের কাপ। মা এবার আমার মাথায়, হাত বুলাতে বুলাতে বলতে লাগল—**ত্যু কালীকে খেবার দিবি, ভূতকে দিবি না? শিয়াল-ভূত-যুগিনীকে বাদ দিয়ে কি, ত্যু পূজা-হোম করিস্? ত্যুর জন্যি মন্ত্র ছেঁটে বাদ দ্যুব নাকি? ত্যু কী শিখ্‌লি বাপ?**

আমি একলা খেলে, অরা কী দেইড়ে দেইড়ে দেখবে নাকি? তখুন ত' হাইনা বাঘের মত অরা, আমাকেই ছিঁড়ে খাবেক। ত্যু অত বোকা ক্যেনে বাপ? অরা ত' আমার সংগী। আমি একা খেবার পারি—তুই-ই বল! ভূত-শিয়াল-পেত্নী ছাড়া কালীকে কুথাও দেখিস বাপ? বিকালে তো আবার, ত্যু "শিবা ভোগ" দেখতে যাবি, অঘোরীবাবার মন্দিরে। দলে দলে ওরা ত্যুর হাত থিঞা, খাবার নিয়ে খাবেক। তখন ত্যু কত করেয় চাঁদা লিবি উয়াদের কাছ থিঞা? শিয়াল-ভূতেরা চাঁদা দেয় বুঝ্যি ? কলকাতার ভূতেরা, শিয়ালেরা চাঁদা দিতেও পারে! আবার জম্মে কোলকাতায় মন্দির কইরবো ক্যানে!"

বলেই, মা আমার চুলের মুঠি ধরে নাড়িয়ে দিয়ে, এক গভীর চুম্বন এঁকে দিল দাড়িভর্ত্তি গালে। চোখে উথলে উঠছে আমার, বাঁধভাঙ্গা বোবাঅশ্রুর ঢল। কথাগুলো এক এক করে, মগজে ঢুকে শেকড় চারিয়েছে ততক্ষণে।

——— এ' কী কথা তুমি শুনালে মা? মাগো, আমি তো এতদিন বুঝতে পারিনি, কেন পটুয়ারা শেয়াল বানায়—ভূত-ডাইনি-যোগিনী বানায়, তোমার মূর্ত্তির পাশে। বুঝি নি এতদিন, কেন তুমি ওদের নিয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াও! কেন ওরা তোমার সব সময়ের সাথী! আমার চিন্তায় এ' কীসের মিশেল তুমি রাখলে মা? দাও তোমার দু'টো পা। আমি মরে যাই, ও' দু'টোকে আমার বুকে আঁকড়ে ধরে। আর হয়তো সময় পাবো না!" লাফ দিয়ে বারান্দা থেকে নেমে, জড়িয়ে ধরলাম মা'র পা দুটো।

"আরে, ছাড়্ ছাড়্" বলে, মা জড়িয়ে ধরলো আমাকে বুকে। ঝরঝর করে কাঁদতে লাগলো সে বেটী। বিশ্বনাথ হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো, আমার আর মায়ের যুগল কান্না। সাঁওতাল মানুষ, বড় সরল হয় ওরা। অবাক চোখে দেখতে দেখতে সে বললো—**তুকে কাঁদাই দিছেক মা-রে? ছুটো সাধুবাবা (আমি) সাধক বটেক। তুকে খ্যেঞা লিছেক গ'। বড় সাধুবাবাকে বুলবক্ আইলি পরে বটে। তুকে ফাড়াক্ ফাঁই কোর্য়া দিছেক রে**

মা। ছুটো বাবা মারাংকাডা (ষাঁড়মার্কা) আছে বটেক।"

বড় সাধুবাবা স্বামী অরূপানন্দ, আমার গুরুভাই। সারা ভারতবর্ষ সে ঘুরে বেড়ায়, বগলে একটা বোঁচকা আর কাঁধে দুটো কম্বল নিয়ে। সকাল থেকে বেরিয়েছে মাধুকরীতে বীরভূমের গাঁয়ে-গঞ্জে। বিশ্বভারতীর ছাত্র—বিরাট পণ্ডিত মানুষ—ভিক্ষা করে। ভূতকে খাওয়ায়, তার মাধুকরীর চাল-ডালে। আমার মত একটা অপগণ্ড ভূতকে, চিঠি দিয়ে ডাকিয়ে নিয়েছিল সেই-ই, মায়ের পায়ের কাছে ফেলবে বলে। বিশে পাগলা ভাবছে—ছোটা সাধুবাবার (এই আমার) ক্ষমতা আছে বটে। জ্যান্ত মা-কালীকে আমি কাঁদিয়ে ছেড়েছি। বড় সাধুবাবা তো কোন দিন এ কম্মটি করতে পারেনি!

মা আমার মনের ঘৃণা-মূর্খতা-উষ্মাকে, উসকে দিয়েছিল সেদিন। চিরকালই কালী মূর্ত্তি তৈরী হয়, একই নিয়মে। আমরা সেটা দেখি মাত্র, মনপ্রাণ দিয়ে বুঝিনি কখনো। বুঝায়ওনি কেউ ওই ব্যাপারটা, জীবনের পটভূমিকায় সেটা টেনে এনে; মা-র মত অমন করে। আমি কোনদিন এর আগে, ও'ভাবে ভাবতে শিখিনি যে, সব কিছু দেখতে হয় জীবনের আয়নায়। কবির বা মূর্খের কল্পনায় নয়।

আর সমস্ত জগৎ জুড়ে, যে ডাইনি-যোগিনী-শেয়ালেরা দাপাদাপি করে বেড়ায়, মহামায়ার ঘোরে পড়ে; সেই কথাটায় সত্যের ক্ষণিক আলোর ছটা মেরে—তার স্বরূপটাকে উদ্‌ঘাটিত করেছিল; এই জলকালী-মা। আজন্মলালিত আমার অজ্ঞতা, সেদিন ঠোক্কর খেয়ে, তার খোলস খুইয়ে. বাইরে যখন বেরিয়ে এল সজ্ঞতা হয়ে—তখন চোখ দুটো বললো—আমি কাঁদবো। মন বলল—তাই বুঝি তবে কাঁদ না ব্যাটা পায়ে ধরে। ও'খেনটায় যা না মরে—বল্‌না ক্যানে—"তম্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ।"

চড়ে চলেছি, বিশে মারাণ্ডীর রিক্সাভ্যানে, বাজারের দিকে। তিন চারটে বিড়ি একসাথে ধরিয়ে, কলকে ফোঁকার মত সে টান মারে, বাঁ-হাতের গলসীতে রেখে। কখনও কখনও তাতে সে, গাঁজার মিশেল মারে। লুকিয়ে লুকিয়ে সে, দু-চারটা গাঁজা গাছ চাষ করে রেখেছে, কারখানাটার ঝোপের মধ্যে। পাতাগুলো পেড়ে এনে সে, মাঝে মাঝে শুকিয়ে রাখে। আমাকেও দেয় খানিকটা মাঝে মাঝে। বড় সাধুবাবা তার, আট-আনার একনম্বর বাঁধা খদ্দের।

তো সেই বিশু মারাণ্ডী, আমাকে রিক্সায় চড়িয়ে নিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে পেছন ফিরে, তার লাল কটকটে চোখে দেখছে যে, স্বয়ং ভগবানের বেটা এই প্যামাসাধু, যাদুমনির মতো ঠিকঠাক বসে আছে কিনা তার রিক্সায়—নাকি উবে গেছে ধোঁয়ার পারা! তাই সে মাঝে মাঝে দেখে নিচ্ছে। সকাল থেকে সে বেটা, পচাই টেনেছে—পান্তাও খেয়েছে। দুই-এর মিশ্রণ হাতে হাত ধরে গেঁজছে, এখন তার পেটের মধ্যে। আর মনের মধ্যে সুড়সুড়ি মারছে সেই কথাটা—"সাধুবাবা কী পালাঞ যেছেক ধুঁয়ার পারা!"

যাই হোক, বাজারে পৌঁছে দরাদরি করতে শুরু করলাম, তরিতরকারী মাছ চাল-ডাল ইত্যাদি। নতুন লোক দেখে, কেউ কেউ দাম বেশি বলছে। আবার কেউ কেউ ভণ্ড সাধুকে, পাত্তাই দিচ্ছে না। কত চোর তো সাধুর আলখাল্লা পরে, লোক ঠকায়! তো সেই যাই হোক, অতগুলো লোকের বাজার করতে কবতে, মনে মনে আজ তৃপ্তি পাচ্ছি। নতুন আলোকে ভাবছি ব্যাপারগুলো। এখন আর তেমন খারাপ লাগছে না।

আমার পাশে ঘুরঘুর করছে বিশে। বাজারের এক কোনায় দাঁড় করানো তার সেই ভ্যান। সবাই জানে, ওটা মায়ের। বিশে— কে দিয়েছে মা, খেটে খাবে বলে। মাঝে মাঝে ওটায় চড়িয়ে, সে মাকে কি অরূপদাকে নিয়ে যায়, বক্রেশ্বরের বক্রমুনির বটতলায়। এই সেদিন আমাকে আর মাকে, সেখানে নিয়ে গেছল। রাস্তা আগলে দাঁড়িয়ে ছিল, সেদিন গোপাল-সাধু।

দু' চারজন লোক যারা বিশে-কে চিনতো, তা'রা আমার পরিচয় জানতে চাইলে, বিশ্বনাথ শ্রদ্ধায় আর সকালে **প্রথম খেপ চুল্লুর ঘোরে,** বলতে শুরু করছে যে আমি হলাম, **"ছোটসাধুবাবা। সাধন শক্তি উয়ার আছে বটেক। মা-কে কাঁদাই দিছেকগ'। মা-কে লিয়ে লিছেক। ধুঁয়ার পারা বানায় দিছেক গ' "।**

যারা কস্মিন কালেও, আজ ৬৫-৭০ বছরেও মাকে কোনদিন কাঁদতে দেখেনি, বা শুনেনি—তারা এখন আমার পেছনে ঘুরতে লাগলো, এতটুকু বিভূতি কী তাবিজ কবচের জন্য। আর সেই সুযোগে আর পরম বিশ্বাসে, বিশে বলে উঠলো, **"আজ খুব ভোগ পূজা করবেক্ ছোট সাধুবাবা। আজা ফাটাই দিবেক গ"। বলেই সজোরে লাথি মারলো, মাটির বুকে দড়াম করে। এক অজানা ঘোর যেন, তার চোখে-মুখে উবজে উঠছে।**

বিশ্বনাথের রিক্সা-ভ্যানে, চড়াচ্চড় চড়তে লাগল, তরিতরকারি-মাছ, চাল-ডালের বস্তা, আটা-ময়দা, আখের গুড়ের টিন, তেলেব টিন, পূজার সামগ্রী। কেউ কেউ এসে, পায়ের ধূলোও নিল আমার। আমি তখন পালাতে পারলে বাঁচি। বিশে তখনও চেঁচিয়ে বলছে, **"লিয়ার ক্যানে শালোরা, ছোটবাবা আজ পূজা চড়াবেক। কালীর মাকে লাবাই লিবেক, আকাশ থিএ্যা (মা-কালীকে আকাশ থেকে নামিয়ে আনবে)।** আমার পকেটের টাকা পকেটেই রইল। কেউই টাকা নিতে চাইল না।

কোন রকমে ওদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে, বাজারের বাইরে বেরিয়ে এসে বিশে-কে বললাম," মাকে বলিস, আমার ফিরতে দেরী হবে। ভোগের আগেই আমি ফিরে যাবো, ভোগ চড়াবো। তুই আর মালফাল খাস্ না। তা' হলে কাজ করতে পারবি না। তোর বউ ফুলমোতিয়াকে, মুরল্যা মাছ ধরতে বলিস, টক হবে তেঁতুল দিয়ে।" বিশে মাথা নাড়তে নাড়তে চলে গেল, ভ্যান নিয়ে প্যাঁকর প্যাঁক করতে করতে।

আমি চললাম, পাহাড় আর বন বাদাড় সার্ভে করতে যে, সেখানে কোন শেয়ালের

গর্ত্ত আছে কিনা। না হলে আসে কোথা থেকে ওরা? মা বলেছিল, পালে পালে নাকি আসে ওরা। হতেও পারে, প্রতিদিন আসতে আসতে, পোষা হয়ে গেছে হয়তো। যাই হোক— সেট্যা দেখতে হবে সন্ধ্যেবেলায়।

না, খুঁজে পেলাম না একটাও গর্ত্ত। কত লোককে জিজ্ঞেস করলাম, শেয়ালের গর্ত্ত আছে কিনা। সবাই বললো, ওরা নাকি আকাশ ফুঁড়ে আসে। **আকাশ ফুঁড়ে শেয়াল ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে আসে**—এরকম অসম্ভব ব্যাপারটা, মানতে পারছি না। শালা, সাঁওতাল জাতটা বড্ড বোকা। যা শুনে, তাই-ই বিশ্বাস করে। মামা-ভাগ্নে পাহাড়ের শিব-শিলার পূজারীও বললো যে, সত্যিই নাকি শেয়ালের গর্ত্ত কোথাও নাই।

ঠিক আছে, বিকালেই পরীক্ষা হবে। কেমন করে আসে ওরা, আর কিইবা করে অঘোরীর সমাধিতে। ফিরে গেলাম হাঁটতে হাঁটতে, জলকালী মন্দিরে। দেরী হচ্ছে দেখে, দাদা **(অরূপানন্দ মহারাজ)**, খুঁজতে বেরিয়েছে আমাকে। বিনা সাধনায় যে এক ভ্যান মালের ব্যবস্থা করেছে, বড় সাধক হলে সে কী না করে বসবে; তাই বা কে বলতে পারে। সুতরাং অমন একটা **চীজকে**, চোখে চোখে রাখো। বিশু সব বলেছে মাকে। আর মাও **ঠ্যালা মেরেছে** দাদাকে।

দু'টো বিড়ি ধরিয়ে, দাদা আমাকে একটা দিলো, আর আমি সেটা নিয়ে ফুঁকতে ফুঁকতে বললাম, "বিশের বউ মাছ ধরছে?" দাদা বললো—হাঁ, বিশে মাছ কুড়াচ্ছে। ফুলমতিয়া জাল ছুঁড়ছে। অনেক মাছ ধরেছে। আমি কাঁচা কাঁচা তেঁতুল, পাড়তে বলেছি গাছ থেকে। ওটা তুই রান্না করবি। তোদের মেদ্নীপুরের, কুকিং প্রসেসটা (Cooking Process) ভাল। খারাপ হবে না।"

"তাড়াতাড়ি চল, ভোগ রান্না হয়ে এলো বলে। এ্যারোমেটিক্ (aromatic) লংকা কয়টা, এনেছি তোর জন্য! তোদের বাড়ীর সেই লংকার চাষটা, এখনও আছে ? সম্মতির মাথা ঝাঁকালাম। জোরে জোরে পা চালালাম আমরা। গিয়ে দেখি বিশে বিশ গুণ মাল চড়িয়ে, বৌয়ের পেছন পেছন মাছ কুড়োচ্ছে, আর টলে টলে পড়ছে । আর ফুলমতিয়া হাসছে খিলখিল করে তাই দেখে। সে আমাকে একদিন **বাবা** বলেছিল। আমি বলেছি **দাদা** বলে ডাকতে। তাই সে **দাদা** বলে।

মা'র কাছে আমরা সবাই ছেলে-মেয়ে। বলল—"দাদা, ত্যু দ্যাখ্ ক্যানে, ফের্ পচাই খ্যেছে । উয়ার গানটো শুনে লে বটেক।" বললাম—"কী বলছে ও?" ফুলমতিয়া যা' বলল, বিশুর গানের সুরে সুরে, বীরভূমের এই কথাগুলো বসিয়ে দিলাম—

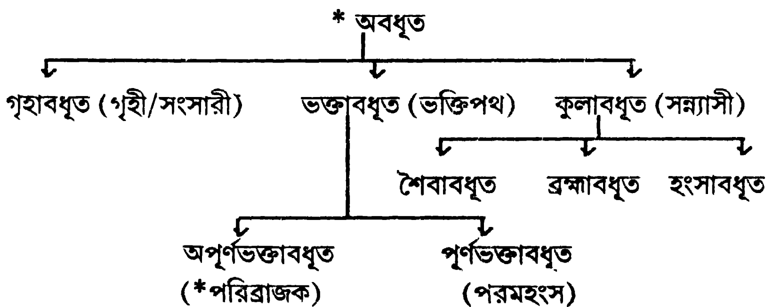
"ছলাস্ কোর‍্যা ফ্যেলাঞ দিছেক্ রে!
মুরল্যা মাছের ঘাড়ের উপুর—
শাল ছ্যানা কী কাটল্ ছ্যানার,

পণ্ডার পিছে খ্যাপলা সি জাল;
ছলাস্ কোর‍্যাঁ ফ্যেলাঞ দিছেক্ রে।।

সি শালোটা পালাঞ যেছেক্,
রোঞা যেছেক্ মুরুল্যা—
ও' মাগীটো, লিয়ার ক্যানে চার-তেঁতুল্যা;
টকের পানি হবেক্ লা।

লাচবো শালী—উদ্মা লাচন,
ছাইড়বক্ লাই—মরণ-বাঁচন;
সোনঝ্যা বেলাই ত্যুকে লিয়া—
বটের পণ্ডায় লাচ্ কইরবক্ রে!
সি জালোটা ছলাস্ ক্যোরাঁ—
ফুলমতিয়া ফ্যেলাঞ দিছেক্ রে!! .... সোমানন্দ অবধূত *

বিশু মাতালের গান আর সুর, মাদলের তালে তালে, নাচবার আর গাইবার জন্য। বীরভূমের রঙিলা মাটির সুর আর গন্ধ, মনের গন্ধমাদনটাকে ঠেলে পাশে সরিয়ে রাখে। টক্ রান্না করতে করতে, গানটা সেদিন লিখে ফেলেছিলাম, অরূপদা'র হাত দিয়ে। আমি সেদিন **ব্যাসদেব** বনে গেছলাম—হাতে আমার ছিল খুন্তি। আমার কথাগুলো রেকর্ড করেছিল **গণেশরূপী অরূপদা**। **ব্যাসকুট** সেখানে ছিল না, খালি কথাগুলো **ফুট কাটছিল** কই মাছের মত মনের মধ্যে। খুনতি হাতে নিয়ে সেটা **উগরে** দিয়েছিলাম—সুরকার ছিল বিশে মারাণ্ডী।



লেখক এই শ্রেণীভুক্ত।

রান্না হ'ল ভোগ। দলে দলে আসতে লাগল, মায়ের সেই ভক্ত-ভূতের দল। ভোগারতির ঘন্টা, তাদেরকে ডেকে এনেছে। তিড়িং তিড়িং করে নেচে-কুঁদে, ভোগ লাগালাম মা-কালীকে। জ্যান্তকালী তখন উনুনের কালিঝুলি মেখে, গলায় গেরুয়ার আঁচল জড়িয়ে বিড়বিড় করছে। আরও এক ভ্যান মালপত্তর, গ্যাঁড়াবার তালে আছে সে বেটী হয়তো। যাই হোক, বলা নেই কওয়া নেই, প্রায় শত্ খানিক লোক পাতা পেড়ে বসে পড়েছে। তাদের পরিবেশন করছে দাদা। মা চোখ বুজে তেমনিই বসে আছে। ফুলমতিয়া ব্যাপারটা বেসুরো বুঝে, ফের চড়িয়ে দিয়েছে পাঁচ-সাত কেজি চাল। বিশুকে ঠেলেও উঠানো গেল না। বললাম, "ও'কে ঘুমাতে দে, ঘুম ভাঙ্গলে খাবে।"

খাওয়া দাওয়া শেষ হতে, আমি চললাম অঘোরী বাবার আশ্রমের দিকে, আনন্দ কাননে। সন্ধ্যে সাতটার সময়, শিবা-ভোগ হয়। তাই বসে ছিলাম, ওই দীঘিটার পাড়ে একা একা। বেশী লোকজন আমার পছন্দ হয় না। আর সেই সময়ই, ওই বাউল আর তার সাধিকা, আমার পাশ দিয়েই গান গাইতে গাইতে চলে গেছল। সে কথাতো আগেই বলেছি। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে এক পা দু'পা করে হাঁটতে লাগলাম, অঘোরীর সমাধির দিকে। উঠোনে সেখানে জমায়েত হয়েছে, জনা পনের কুড়ি লোক। সবাই অসম্ভব চুপচাপ হয়ে, বসে আছে মাদুরে। সবাই নৈবেদ্যর মত, সাজিয়ে রেখেছে খাবার। আমার গুলো আমি রেখেছি ঠোঙায়। ছোটবেলা থেকে, শেয়াল আমার বহু চরানো আছে। ফলে আমার ভয়ডর নাই।

শুধু এ'টা দেখার যে, ওরা এসে হাত থেকে খায় কিনা! বা খেতে খেতে মারপিট করে কিনা! পুজারিনী হাঁকছে "আয়—আয়।" আর দলে দলে একেবারে মিলিটারীর মত, প্যারেড করতে করতে, সবাই আসছে— কেউই বিশৃঙ্খল নয়। পাশে পাশে ঘুরছে ওরা, পোষা বেড়ালের বা কুকুরের মত। একটা তো আমার, পদ্ম-আসন করা ঠ্যাং-এর উপর ঠ্যাং তুলে, যেন বললে, "খেতে দে ব্যাটা!" তেলে ভাজা-বেগুনী বের করে ওদের দিলাম। বেজায় খুশী মনে হ'ল ওরা।

এক এক করে পনের কুড়িটা শেয়াল তেলে ভাজা খেয়ে, আবার চাইল অন্য কিছু। এবার জিলীপির ঠোঙা থেকে, সেগুলো বের করে ওদের দিলাম। সবাই আমার কাছে গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুড়ি-মুড়কি দিলাম ছড়িয়ে, আর ওরা খুঁটে খেতে লাগল সেগুলো। ঘন্টা খানিকের বেশী তখন হয়ে গেছে। সবাই এর খাওয়ানো হ'লে, ওরা চলে গেল সুশৃঙ্খল ভাবে। একটু দুরে গিয়ে প্রহর হাঁকল ওরা। আমরা অঘোরীবাবার সমাধি বেদীতে, প্রণাম করে উঠে পড়লাম, ফিরতে হবে জলকালী আশ্রমে।

অন্ধকার কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর বন্ধ্যা রাত। শুনশান্ মামা-ভাগ্নে পাহাড়ের আশপাশ। পাশের মদের দোকানেও, মাতালদের ভিড় নাই। একজনকেও পেলাম না সঙ্গী হিসাবে। অতটা পথ হাঁটতে হবে, একা আমাকে। তাই শর্টকাট (Short cut) করতে গিয়ে, পাহাড়ের

পাশ দিয়ে হাঁটছি । রাত তখন প্রায় সাড়ে ন'টা। পর্বতের মাথায় প্রশস্থ উপত্যকার মত জায়গায়, দু' একটা মন্দির আছে জানি। কিন্তু অত রাতে কেউ তো ওখানে থাকে না, ভূত আর গোখ্‌রো সাপের ভয়ে! রাত্রে তাহলে ওখানে কারা কথা বলছে?

একবার ভাবলাম পালাই, আবার ভাবলাম দেখতেই হবে। অনেকবার উঠেছি ওই পাহাড়টায়, দিনের আলোয় মিঠুকে সাথে নিয়ে। কিন্তু রাতের বেলায় গড়িয়ে পড়লে তো, হাড়গোড় ভাঙ্গবে। তাছাড়া, গোখরো সাপেরাও, গরমে বেরুতে পারে ফাটল থেকে। কিন্তু আর্ত্তিভরা কথাগুলো যেন, আমাকে চুম্বকের মত টানছে উপরে যেতে।

কোন রকমে চুপিচুপি, পাথর বেয়ে উপরে উঠলাম। আর যা দেখলাম, তাতে আমার চক্ষু ছানাবড়ার মত; গোল পাকাতে শুরু করেছে । মৃদু মোমবাতির আলোয় দেখলাম, এমন এক আজব জিনিষ, যা' আমার মনের আর এক দিগন্তকে, খুলে দিল আমার সামনে। অন্তঃহীন জিজ্ঞাসা আমাকে, গ্রাস করতে লাগল। মনে হল যেন, ভুল দেখেছি । চশমা খুলে কচলে নিলাম চোখ দু'টো। ফের দেখলাম বিকালের সেই নওল কিশোরী সাধিকা, সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে বসে আছে, চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা বাউলের কোলের উপর।

উন্মত্ত আবেগে সে যেন ফেটে পড়ছে । বিপরীত এই বিহার, শিরশিরিয়ে দিচ্ছে, আমার সমস্ত সত্তাকে। স্ফুরিত লাস্যময় হাসি, ছলকে উঠছে তার ঠোঁটে। চুলগুলো খোলা, পিঠ ছাড়িয়ে নেমেছে কোমরের দিকে। স্তনাগ্র-চূড়া কেঁপে কেঁপে উঠছে, শরীরের তালে তালে। আর বাউল তার পা দু'টোকে বুকের উপর জড়িয়ে ধরে, বলে চলেছে পরম আর্তিতেঃ—

"মাগো, তুমি আমার শ্বাসে প্রশ্বাসে নেমে এসো। এসো আমার সত্ত্বার গভীরে। এসো মন্দাকিনী হয়ে আমার রক্তস্রোতে— তুফান তুলো আমার পৌরুষে। এসো মহামায়া, আমার শ্যাম আর রাধা হয়ে, এসো কালী হয়ে কাল হয়ে; এসো বৃন্দাবনের মাধুরী লুটে— এসো শ্মশান জাগানিয়া করালী—কালিকারূপে বালিকা রূপে। নামো, নৃমুণ্ডমালিনী শ্যামা হয়ে; নামো—ওঁ ক্রীং ক্রীং, হুং হুং, হ্রীং হ্রীং ওঁ হয়ে!" প্রমত্তা সে কিশোরী সাধিকা চোখ বুজে তন্ময় হয়ে বিপরীত বিহারে জপে চলেছে—"ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় বাসুদেবায় স্বাহা।"

আর দেখতে পারলাম না। ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগলাম, পাহাড় থেকে কোনক্রমে নেমে, জলকালী মন্দিরের দিকে। রাতের রাস্তার কুকুরগুলো তাড়া করেছে, আমাকে চোর ভেবে। পাকা রাস্তা ছাড়িয়ে বাঁশবাগানের পাশ দিয়ে, যখন আশ্রমে পৌঁছালাম, দেখলাম দাদা বসে আছে আমার অপেক্ষায়। বিকালের সেই বাউল আর তার কিশোরী সাধিকা, মার' কাছে বসে গানে গানে, মশ্‌গুল করেছে মন্দিরটাকে। বেজে চলেছে তাদের একতারাটা। বিকাল থেকে নাকি, তারা আমাকে খুঁজছে । দাদা বলেছে ফিরতে দেরী হবে। মা বললো, "কেমন দেখ্‌লি বাপ?" কোন কথা বলতে পারলাম না। শুধু বললাম, "একটু জল দাও, তেষ্টায় ছাতি ফাটছে !"

দুবরাজপুরের
মামা-ভাগ্নে পাহাড়







অঘোরীবাবার
আনন্দকানন (দুবরাজপুর)

বীরভূমের পথে-প্রান্তরে

দুবরাজপুর পর্ব : কারণ খেএ্যা পিটাইছে গ'

জলকালীতলায় আজকাল যতদিন থাকি, বা বক্রেশ্বর কী জয়দেবের কেঁদুলীতে গেলেও, আমি আর প্যান্ট-শার্ট পরি না। সবাই এমন চিনে ফেলেছে যে, আমাকে দেখলেই ভক্তি গদগদ হয়ে, প্রণাম করতে শুরু করে। দুটো সুবিধে আমি নেবার চেষ্টা করি। এক—সাধু সাজলে, গরীব সাধুমার ভাঁড়ারে, কিছু আসে হারামের পথে—একদম আরামে। আর দুই—সবাইয়ের ভক্তিতে **অভক্তি** নামক **কুয়াসা** জমলে, আমাকেই ওরা দেখতে পাবে না। ফলে আমার দু'নম্বরী সাধুত্ব—**এক নম্বরীও** হবে না। প্যান্টশার্ট পরলে তো, সবাই বুঝতে পেরে, জুতো-পেটা করবে।

কেউ কেউ দু'টো হাতও, সমানে কচলায়। অরূপদার (স্বামী অরূপানন্দ), ভালই **মুরগী** *[1] জুটছে আজকাল। ছোট সাধুবাবা (আমি) যদি এতবড়, তো এই বড় সাধুবাবা তাহ'লে কত বড়! সে ব্যাপারে ধন্দ লেগে গেছে, পাব্‌লিকের মনে। সবাই ভেবে বসে আছে যে, বড় সাধুবাবা তাহ'লে—খুব চাপা-স্বভাবের সাধুই হবে! নিজেকে **প্যাঁজের মত ছাড়াইতে** চায় না সে। যতই গোপনতা সে রক্ষে করে চলে, ততই মুরগীরা বেজায় রকম **কোঁক্‌র কোঁক্‌** করে, উড়ে উড়ে এসে পড়ে অরূপদার কাছে। ভাল মতো ওদের রগ্‌ড়ে **ডিম** *[2] বের করে নিয়ে, তবেই অরূপদা' ছেড়ে দেয় ও'দের।

সোনালী সোনালী ডিম, রূপোলী রূপোলী হ'য়ে সেঁদিয়ে যায়, তার আলখাল্লার পকেটের ভেতর। আল্লাই জানে, পরিমানটা কত। ছট্‌কে-পড়া **মুরগীদের** বুঝালেও, ব্যাটারা শুনে না। ভাবে ওরা যে, বাবার **'লিশ্চই'** বড় রকমের গোঁসা হয়েছে। **"ত্যু লে ক্যানে বাবা, ম্যুরা গরীব মনিষ্যি হ'ছি গ'। কারণ *[3] পেছি না গ'। ব্যোম্‌-শংকরের প্যাসাদ্‌ লেসিছি গ' বাবা, টুকান ছিলিম্‌ জ্বলাঞ দে ক্যানে শিবের পায়!"**

ওই সব ফ্যাসাদ বিদেয় করতে, জোরে জোরে হাঁকাড় মারে অরূপদা, "জয়, ভোলেনাথ"। ওরাও তিন গুণ করে গলা ফাটিয়ে বলে উঠে, "জ্যয়—জ্যয়—ভোলেনাথ!" পলিটিক্যাল পার্টির আঁতেলদের মত—জল উপরে যায়, নীচে যায়, পাশে যায়, এরকম 'সায়' তো মারতেই হবে। না হলে হকার কী বেকার, কী ঠিকাদার

---

*[1] — বোকা ভক্ত / *[2] — দেশী বা বিলাতী মদ। / *[3] — টাকা পয়সা।

বা ভক্ত হওয়া যাবে না। অরূপদা'র **গমগমে গলায়** অসম্ভব সুন্দর সুরেলা আওয়াজ বেরোয়। আর তার উচ্চারণের **গমক**, মূর্খ অথচ **বাঞ্চোৎ** ওই ব্যাটাদের, **বেটে** ফেলবার মত বিশেষ অবস্থায় নিয়ে যায়।

আর তার ওই সুরেলা আওয়াজটাই যেন হিমালয় থেকে, সে ব্যাটা শিবের জটা ধরে, **টেনে আনে** জলকালীতলায়। দাদার এক নম্বর **চ্যালা** ওই বিশু। তার কোমরের চার-হাতি ধূতিটা, কোথায় যে সে রেখেছে খুঁজে না পেয়ে, শিবের মত **দিগ্বসন * মূর্ত্তি** ধরে, আরও জোরে জোরে **হাঁকাড়** ম্যারে—**"জ্যয়, জ্যয়—শঙ্কর।"** ফুলী ছুটে এসে পরিয়ে দেয়, তার ফেলে আসা ধূতিটা। সেটা কিছুক্ষণ তার কোমরে থেকে, আবার **পালাবার** চেষ্টা করে মাটি **আঁকড়ে**।

আবার পরা'তে গেলে, বিশু হয় ক্ষেপে **কাঁই**। বলে, ''ত্যু শালী, কাপ্যড়টো পরাইছিস্ ক্যানে? মাইরব্য শালী ত্যুকে, ম্যুর লাঠিটো ত্যু লিয়ায় বটেক। ত্যুকে, দ্যাখ্ত্যে লার্ছি গ', ত্যু যা ক্যানে হোথা।'' বিশু **মারবে** তার বৌ ফুলীকে, আর ফুলীই এনে দেবে তার **সেই লাঠিটা**। দোষটা কি ফুলীর? তার দোষ হ'ল এই যে, সে কেন বিশুকে শিবের মত **ল্যাংটা** থাকতে দেয়নি। বিশুর মাথায় এটা খেলেছে যে, **শিবকে পাঁজাকোল্ করে ধরতে গেলে, তাকেও তার মত ল্যাংটা থাকতে হবেই।**

ফুলমণিকে তাই সে একদিন, এই **অত্যন্ত গোপন** সাধন-রহস্যটা, খোলসা করে বলেছিল। আরও বলেছিল যে, **"তুকে শালী কালী হ'বার লাগবেক্। দেখাঞ যা ক্যানে পট্টের ভিতর, কালী-মা বাবার বুকে পা-টো দিছে । পা-টো লিয়া বুকের উপ্প্যর, সি বাবা-শিব ঘুমাঞ যেছেক গ'। লিব ক্যানে ত্যুর উ পা, ম্যুর্ বুকের উপ্পর। ত্যু জিবটো দ্যেখাঞ দে ম্যুকে!"**

জিভ-ভেংচে ফুলী পালিয়েছিল, বিশের কাছ থেকে। বিশু কিন্তু ফুলীর মধ্যে **অত্যন্ত সুলক্ষণা** এক সাধিকাকে, সেদিন মোক্ষমভাবে আবিষ্কার করে ফেলেছিল, সকাল বেলার প্রথম দফার **মহুয়ার (চুল্লুর)** ঘোরে। তার মাদলের চামড়াটা ফেটে গিয়েই তো, সেদিন সমূহ **গোলমালটা** বাধিয়েছে । না হলে তো সেই দিনই, তার সদ্য আবিষ্কৃত এই রহস্যটার **আগাপাশতলা**, সে নিঁখুত ভাবে পরীক্ষা করে নিতে পারতো। **মাদল না বাজলে, মা কালী জিভ বের করে কী ভাবে ল্যাংটা নাচবে?**

ব্যাপারটা ঠিক মত জমেনি বলেই, সে আরও **একদফা মহুয়া (চুল্লু)** খেয়ে টলতে টলতে, তার সেই মাদলটার চামড়া ঠিকঠাক করছিল। ফুলী গুমোরে ফুলে উঠে জিভ বের করে বলেছিল—ত্যুকে বাজারের লোক্যেরা মাইরব্যেক্ বুল্ছে ।

* দিগ্বসন — ল্যাংটা।

ত্যু হামার পা-টো **ধইরবিক্ লাই**। ম্যুকে ত্যু ল্যাংটা হ'বার লেগ্যা বুলছিস্ বটে, **কিন্তু ম্যু লারবক্**। জিবটো **টাটাইছে** গ'।

লজ্জার মাথা খেয়ে ফুলী **ল্যাংটা** হ'তে পারেনি। বিশুরও আর, মা-কালীকে **নাচানো হয়নি**। সেই ফুলী লুকিয়ে লুকিয়ে, উল্টে মার আর দাদার কাছে বলে দিয়েছে, বিশুর অকথ্য **পাগলামির** কথা। বিশু সেটা বুঝতে পেরে, আর তার বৌ ফুলমণিকে ঘাঁটায়নি, এই যা। তো সে যাই হোক, মন্দির সারা'তে গেলে তো টাকা পয়সা লাগবেই। সিমেন্ট-বালি মিস্ত্রি-খরচা, সবইতো করতে হবে! তাই এক একটা **মুরগী*** ধরে তার **ডিম*** কেড়ে নিচ্ছে অরূপদা'। আর মাঝে মাঝে, **জ্যয় জ্যয় ভোলেনাথ** বলে **হাঁকাড়** মারছে । বিশু ভাবছে এই বুঝি **সগ্গ থেকে** গাঁজাখোর বাবা শিবকে, বড় সাধুবাবা **লামিয়ে** আনলো!

মা আর আমি তা'র ঘরের এক চিলতে বারান্দায় বসে, দু'জনে দেখছি তার **রগড়**। পিঠটা বড্ড ব্যথা-ব্যথা করছিল বলে, সরষের তেল গরম করে ফুলী, সেটা মালিস করছে আমার পিঠে। আমি বারণ করলেও শুনছে না। মা সেই কাজটা তাকে করতে বলেছে কিনা। বিশুকে **রগড়াবার** জন্য বললাম, ''হ্যাঁরে বিশু, মা-কালী বলেছে, তোর **গাড়ীতে করে** বালি-নুড়ি-সিমেন্ট না এলে, মা-কালী **খুশী** হবে না। রাতে আমাকে **স্বপ্যনে** মা বলেছে এই কথা। তোকে জানিয়ে দিলাম, জলকালী **মায়ের ইচ্ছা**। তুই কী করবি, সেটা **তোর ইচ্ছা**।''

আমার **সম্বন্ধে**, তার **দুর্বলতা** আছে জেনেই, আমি তাকে **উসকে** দিলাম। আর বিশু সেটা শুনে, বুঝে নিয়েছে যে, জল-মা-কালী সত্যি সত্যি আমার উপর; **ভর** করেছিল কাল রাতে। তা' হ'লে তো—**সাংঘাতিক** রকম একটা ব্যাপার। তাছাড়া আমি আর ফুলী **কেন যে**, জলকালীমার **গা ঘেঁসে** বসে আছি— সেই সকাল থেকে, সেটাও তার **বোধগম্য** হচ্ছে না। এদিকে ফুলীও আমার পিঠে মালিশ করছে। ও ভাবছে, না জানি ওকে না আমরা, **পালিশ** করবার মতলব **ভাঁজছি** ।

মাকে যখন আমি সেদিন **কাঁদিয়ে ছেড়েছি**, বিনা চাওয়ায় যখন, এক রিক্সাভ্যান-ভর্ত্তি ভোগের মাল **গ্যাঁড়াতে পেরেছি**; তবে ও'কে **গুঁড়িয়ে** দিতে আমার লিশ্চয়ই, এক **মিলিট্** লাগবে। তাই সে আমাকে, **ভয়ে-ভক্তিতে** এড়িয়ে চলে। ফুলী চুপিচুপি বলেছে—ওকে বকে দিতে, না হলে সে **নির্ঘাৎ** মালের ঘোরে, তাকে ল্যাংটা হ'তে বলবে। সে এক **মহা সমস্যা**—কালী ঠাকুর সাজাবার।

নানারকম বুদ্ধি ফিকির করেও যখন পথ খুঁজে পাইনি, তখনই হঠাৎ মনে হল যে, ভরের **গল্পটা** বললে ও' ব্যাটা, **বাটা-মাছের** মত খাবি খাবে। গম্ভীর গলায়

* মুরগী— বোকা ভক্ত। / * ডিম— টাকা-পয়সা।

তাই বললাম, "বিশে জানিস, মা-কালী আমাকে কাল কী বলেছে? তুই শালা একটা, পাজীর **পা-ঝাড়া**। ফুলীকে কালী বানাবার তালে আছিস? তাহ'লে এই সাধুমা কী সাজবে রে শালা, বলতে পারিস? ফুলী কী মা'র জায়গা নিতে পারবে? ফুলীর কী মা'র মতো, চার-হাত লম্বা-চওড়া জটা আছে?

ফুলী তো গ্যাঁড়া*[1] পুড়িয়ে চূণ*[2] বানায়। রেগে গিয়ে কখনও যদি তোর গালে চূণ ঘসে দেয়, তবে তোর গোটা মুখটা পুড়ে, সাদা হয়ে যাবে রে শালা। তোর পুরোটা কালো আর মুখটা সাদা—তবে কী তোকে আর তোদের সাঁওতালেরা সমাজে নেবে? তোকে একঘরে করবে না? আর তা'ছাড়া **কালীর ছেলে শিব**, না কালীর **ভাতার শিব**— সে জবাবটা, আগে দে বাপ্পোৎ। তুই যদি শিব সাজবি, তবে এই সাধুমা কী, তোর **মাগ** হবে রে শালা"?

দিলাম গুলিয়ে শালাকে। চোখ বড় বড় করে সে, ব্যাপারটা বুঝবার **চেষ্টা করলো** বার কতক। তারপর খেই হারিয়ে ফেলে, ছুটে এসে জাপটে ধরলো **ফুলীর পা**। কেঁদে কেঁদে সে বলতে লাগলো, "মাগো, আম্যু ত্যুর **ভাতার** হতে **লারবক্** গ'। ভুল করিছি মা গ', সি ম্যুর **পাপ** হবেক।" বুঝেছি যে সে সাধুমাকেই ওই কথাগুলো বলতে চায়। কিন্তু যার পায়ে **ধরার কথা**, তার পা না ধরে, ধরেছে সে ফুলীর পা **তরাসে**। জোরে দু'হাত দিয়ে তার দু' হাত ছাড়িয়ে, ধরিয়ে দিলাম **সাধুমায়ের পা**।

ছাড়া পেয়ে ফুলী কেটে পড়েছে ততক্ষণে, মুখে আঁচল চাপা দিয়ে। হাসলেই সমূহ **বিপদ**। বললাম—**পালা এক্ষুণি**। মা-ও তার মুখটাতে কাপড় পুরো জড়িয়ে, ততক্ষণে পেটফাটা হাসি সামলাবার চেষ্টা করছে। আমি সমানে তাকে তড়্পে যাচ্ছি তখনও, "বল, এ' পাপের **শাস্তি** তুই কী লিবি? তাড়াতাড়ি বল, না হলে শিবকে ত্রিশূল নিয়ে ডাকতে হবে। তুই শালা, **তার মাগ্‌কে, গ্যাঁড়াবার তালে ছিলি**, সে কী তোকে ছেড়ে দেবে? তোকে নির্ঘাৎ **অজয়** কী **দ্বার্‌কার** চরে ফেলে, ত্রিশূল দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে **মারবে**। বাঁচতে চাস্ কী না বল?"

এবারে সে একটা পা সাধু-মা'র আর একটা পা **আমার**, জাপটে ধরে ভ্যা ভ্যা করে, সত্যি সত্যি কাঁদতে লাগল। আর তার বৌ ফুলীকে গালি দিতে লাগল এই বলে যে, ফুলী কেন ব্যাপারটা বুঝিয়ে তাকে বলেনি। সে মাল্-গাঁজা খায় বলে, ব্যাপারটা তার মাথায় ঢুকেনি। **দোষটা ফুলীর**, আর তার নিজের **হেঁড়ে মাথার**। সেঁটিয়ে সে কিল মারতে লাগলো নিজের ব্রহ্মতালুতে।

দাদা এতক্ষণ রগড় দেখছিলো দূর থেকে। ততক্ষণে তার সব মুরগীরা, **ডিম**

*[1] গ্যাঁড়া— শামুক / *[2] চূণ—Snail Calcium

পেড়ে পালিয়ে গেছে। সেগুলো **আলখাল্লার** পকেটে রেখে, সে **'তা' দিচ্ছিল**। বেলা তখন সাড়ে আটটা কী ন'টা হবে। আস্তে আস্তে উঠে এসে বললো—"**এতক্ষণ ধ্যান**-জপ করে আমি জানলাম যে, মা-কালী একদম **ক্ষমা করে** দিয়েছে বিশে-কে। কারণ বিশে **যখনই মাল খায়**, তখনই আগেই মা-কালীকে একটু **মাটিতে ঢেলে দেয়**, তারপর সে নিজে খায়। এখন থেকে মাটির চা-খাওয়া **নূতন ভাঁড়ে** করে, কারণ দিতে হবে মা-কালীকে— সে রকমই **আদেশ হয়েছে***।

আরও আদেশ হয়েছে যে নুড়ি পাথর, অজয়ের বালি, সিমেন্ট সব কিছু বিশে-কেই বয়ে এনে দিতে হবে, মন্দির সারাবার জন্য। আর বিশে-কেই হ'তে হবে মজুরদের **সর্দার**। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত, খালি **জয় কালী—ব্যোম্ কালী** বলে, হাঁকাড় মারতে হবে **আকাশের দিকে তাকিয়ে**। ফুলীর উপর ভাত আর চা বানানোর **আদেশ** হয়েছে। কেউ পালাতে পারবে না, কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত"।

তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো বিশু। বললো, "চল ক্যানে ত্যু হামার্ সাথে। সব লিয়ে এসে দুবক্ গ'। উ্য শালী ফুলী কুথা বটেক। লিয়ার ক্যানে **ঝাঁটাটো**—ঝাঁটাইবার লাগবেক্।" বললাম, "তুই ফুলীকে গাড়িতে চড়িয়ে নিয়ে যা। পাড়ার সবাই দেখুক যে, তুই বউকে বৌকে কত **ভালবাসিস**, শালা। আমি মাঠ ভেঙ্গে, দুবরাজপুর স্টেশনের কাছে গিয়ে; তোদের জন্য অপেক্ষা করবো। তোদের তো ওখানে যেতে, অনেক সময় লাগবে। আমি তার আগেই **ছু-মন্তর** করে, ওখানে চলে যাবো।" অগত্যা বিশু আর কী করে? ফুলীকে ভ্যানে চড়িয়ে সে চলে গেল, দুবরাজপুর ষ্টেশনের দিকে।

ফুলী হাতের **ধূমাবতীর মত** ঝাঁটা, উঁচিয়ে আছে রিক্সার উপর। রাস্তাব লোকেরা সবাই বিশে-মাতালের **ব্যাপার স্যাপার** দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। এতক্ষণে মা মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে, খিলখিল করে হাসছে। অরূপদা বললো—"প্যামা, তুই এক জব্বর ফন্দি, বের করেছিলি বটে। না হলে ও' শালা **পাজী**, মেয়েটাকে সত্যিই **ল্যাংটা** করে মা-কালী সাজাতে **বাধ্য** করতো? তোর মাথায় এত **বদবুদ্ধি** কী করে খেলে বুঝি না! মাথার ভেতর চাষ করিস নাকি?

যাক্‌গে, ওমা—তুমি আমাদের দু' কাপ চা দাও। না হলে মেজাজটা ঠিক হবে না"। মা উঠে গেল চা তৈরী করতে। আমি নুতন একপ্রস্থ গেরুয়া কাপড় পরে, রেডি হলাম ষ্টেশনের দিকে যাবো বলে। রাস্তা অনেকটাই দূর। কিলো-মিটার তিনেক তো হবেই। বিশুকে যেতে হবে প্রায় চার-পাঁচ কিলো মিটার পথ **ঘুরে ঘুরে**।

জলকালীতলা থেকে ষ্টেশন দেখা যায়। ময়ূরাক্ষী **'ইস্‌পিরিস্'** (Express)

*** সেই ভাঁড়ের মদটুকু কে খায়, সে ব্যাপারটা পরে বলবো, সময় হলে।**

যখন যায় ভেঁপু বাজিয়ে, তখন বেশ দেখতে লাগে। চা খেয়ে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে, যাবো ভাবলাম। মা বললো, "হিটারের কয়েল (Coil) কেটে গেছে। চা বানানো আর হবে না।" দাদা আর কী করে, ফের সেই বাজারে যেতে হবে? সকাল থেকে সেই ব্যাটা মিঠুর দেখা নাই। ব্যাগ হাতড়ে একটা বিলাতী পাঁইট বের করে বললো, "ওমা, তুমি ওটা ঠাকুরের কাছে **নৈবেদ্য দাও**। আমরা **প্রসাদ** নেবো।"

মা সেটা খুলে দেবী-শিলার উপর, ছড়িয়ে দিল খানিকটা। তারপর নিজের জন্য **নর-কপালে*** খানিকটা ঢেলে নিয়ে, বাকীটা আমাদের দু'জনকে দিয়ে দিল। তিন পেগ করে **কারণ-প্রসাদ** গলাধঃকরণ করে, বেরিয়ে পড়লাম মাঠ ভেঙ্গে; সেই দুবরাজপুর ষ্টেশনের দিকে। একটু একটু করে জমছে নেশা। সকালের খালি পেট, তায় পড়েছে **কাঁচা হুইস্কি**। শরীরটা এখন হাল্কা—হাল্কা লাগছে। মালিশের ঠ্যালায় পিঠের ব্যথাটা, **পিঠটান** দিয়েছে। শালী, ফুলীর গায়ে জোর আছে বটে। চার পাঁচটা মরদের হাড়ে সে, **ভেলকি খেলিয়ে** দিতে পারে।

দুবরাজপুর ষ্টেশনের আশেপাশে, ছড়ানো ছিটানো নুড়ি পাথর পড়ে থাকে, লাল লাল নুড়ি, বীরভূমের সর্বত্রই পাওয়া যায়। আধা—পাহাড়ী এলাকা কিনা। সেখানে গিয়ে দেখলাম, বিশে আর ফুলী দু'জনেই, নুড়ি কুড়ানোর কাজে লেগে গেছে। ফুলীর হাত থেকে ঝ্যাটা কেড়ে নিয়ে, বিশে ঝাঁট দিয়ে **শিখিয়ে দিচ্ছে** ফুলীকে যে—কেমন করে ঝাঁট দিতে হয়। টলে টলে পড়ছে সে। ফুলী বলছে যে, সে অতবার **ধপাস-ধপাস** করে, **পড়তে পারবে না**। তার পেটে বাচ্চা আছে, **কড়ে আঙ্গুলের** মত ছোট। সে **লিশ্চই** কাঁদবে তার **পেট্যের ভিত্যরে**।

বিশু বলছে যে—তাকে একবারও **পড়ে যেতে হবে না**। ফুলী বুঝতে পারছে না যে, যদি **পড়তে হবে না**, তো তাহলে সে কেনই বা, **পড়ে পড়ে** দেখিয়ে দিচ্ছে যে, **কেমন করে ঝাঁট দিয়ে** নুড়ি কুড়াতে হয়? বলবে **এক রকম**, আর দেখাবে **অন্য এক রকম**? রাগের চোটে সে গালে হাত দিয়ে বসে আছে, আর তার নুড়ি ঝাঁটানো দেখছে। ফুলী বললো যে বিশে নাকি, আরও **এক দফা** মাল টেনেছে রাস্তায়। তাকেও খানিকটা **প্যাসাদ** দিয়েছে সে, **ঠাণ্ডা বেগুনীর সাথে**।

আরও বলেছে যে, সে তাকে আর কখনো মা-কালী সাজতে বলবে না। তার **ঠাকুর-বদল** হয়ে গেছে **রাতারাতি**। এখন সে বলেছে যে, কোন্ ঠাকুরটাকে **ধরলে** তার খুব সুবিধে হবে, সে ব্যাপারে ফুলী যেন তার **সুচিন্তিত মতামত, পেশ করে** তার কাছে। আগেরটার মত সে **গুলিয়ে** ফেলতে চায় না। ফুলীও একটু একটু মৌতাত, **অনুভব** করতে করতে, বুঝতে পারছে না যে সে **কা'কে ধরবে**।

---

* মড়ার খুলির পাত্র। শাক্ত সাধক সাধিকারা মদের পাত্র হিসাবে ব্যবহার করেন।

ঠাকুরের বড্ড **আকাল** আজকাল। ঝেঁটিয়ে সব নাকি—**"ক্যাইলকাতায় পালাঞ যেছেক গ**। সিখানে **চাক্‌রী** কইরবার লাগছ্যে গ।"

ঠাকুরেরা কী করে ক্যাইলকাতায় **চাকরী করে**, সেটা বিশু আর ফুলী আমাকে বলেছে। পরে বলবো সে **আজব কাহিনী**, একটু ধৈর্য্য দরকার। আমি যেন পরের বারে এখানে আসবার সময়, দু'চারটাকে **ঘাড় ধরে কী বেঁধে আনি**। বীরভূম যেন কোন ভাবেই ফাঁকা না থাকে। ফুলীর উদ্বেগ এখন তুঙ্গে। আমার **সাহায্য** সে চায়। আমাকে **দাদা** বলে, তাই তার মত **বোনের দাবী** এখন আমাকে মেটাতে হবেই। বললাম, "আমাকে **তুই** তো চিনিস্ ফুলী। তিন **তুড়ি** মাইরব্যো, আর ঠাকুরেরা গড় গড় করে **আসতে লাগবেক**। খালি ক'টা **লিবি** বল? বিশে, তুই **ক'টা লিবি**?"

দু'জনে বসে গেল **হিসেব কষতে**, কটা করে নেওয়া যায়। অনেকক্ষণ **যুক্তি-যাক্তা** করে, দু'জনে বললো যে, বেশী তাদের **দরকার লাই**, খালি তিনটা কী একটা। শুধু যেন **লাচ্** করতে পারে **মাদ্দলের সেথে**। একটা "মাদ্দল্ যদি **উ লিয়ে আসে, টিন্যের বটেক্"** তাহ'লে খুব ভাল হবে। চামড়ার মাদলটার তার **ফেট্যে যেছে**। টিনের হলে ফাটবে না। আলকাতরা দিয়ে রং করে দিলে **টিকবেও না** বহুদিন। আলকাতরার **ব্যবস্থাও** সে নাকি করে রেখেছে, ষ্টেশন মাষ্টার **মুকাজ্জী বাবুকে বুলে**।

খালি ঠাকুরটাকে **ধরে এনে** দিলেই হলো। **পালিয়ে যেন না যায়**। সে রকম একটা **মন্তর্** করে দিতে **হবেক**। ফুলীও সায় দিল বিশের কথায়। দেখলাম কাজ **গুবলেট** পাকাচ্ছে ওরা। এখন ঠাকুর নিয়ে পড়েছে। রোদ চড়ছে মাথার উপর। বললাম, "সব হয়ে যাবে। মন্দিরটা আগে সারিয়ে ফেল। না হলে তা'রা **থাকবে কোথায়**? তোদের **ঝোপড়াতে** কী ঠাকুর থাকতে পারে! পাকা মন্দির চাই।"

যুক্তিটা **জব্বর** হয়েছে। ওরা লেগে গেল কাজে। ফুলীকে বললাম, "মাকে বলিস, আমার **দেরী হবে** ফিরতে। পূজা আর ভোগ যেন মা লাগায়। বড় সাধুবাবা যেন আমাকে না খুঁজে। তোরা তাড়াতাড়ি ফিরে যা'। এ'বেলা আর আসতে হবে না। বিকালে এলেই হবে। ভোগ লাগানো হয়ে গেলে, সবাই খেয়ে লিস্। আমার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না।" ওরা মাথা নাড়তে নাড়তে, নুড়ি ঝাঁটাতে লাগল। আমি ধরলাম ষ্টেশনে যাবার রাস্তা, ইউক্যালিপটাসের সারির ভেতর দিয়ে।

আজব এই জায়গা বীরভূম আর বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া কী পুরুলিয়া। সমস্ত এই মনটাতে বৈরাগীর রং লাগায়। আর সঙ্গে হুইস্কি রাম কী মহুয়ার মিশেল থাকলে তো কথাই নাই। যেন সোনায় সোহাগা, ভুলিয়ে দেয় দুঃখ-ব্যথার টনটনানি! ঘ্যান ঘ্যানানির এই জীবনটাতে, ঘানি টানতে টানতে ঘুণ লেগে যায় যখন হাড়ে হাড়ে, কেড়ে নেয় তখন সে ব্যথার অশ্রু—এই উদাসী বৈরাগী বীরভূম। ছুটে আসি, আসতে

হয় কলকাতা ছেড়ে, 'বেড়ে মজাদার' এই ময়ূরাক্ষী কী অজয়ের জলবিধৌত বৈরাগী-বাউলের একতারা-বাজা, মাদলের ডিডিম্ ডিডিম্ শব্দভরা সন্ধ্যার সাঁওতাল পাড়ায়।

মূর্খ-নিরন্ন বাউল-বাউলানি, সাধু-দরবেশ, যার নব্বুই শতাংশ শুধু গেরুয়া ধরেছে লোক ঠকাতে, সহজে প্রাত্যহিক ক্ষুন্নিবৃত্তির রেস্ত যোগাড় করতে; তা'রা জানে না—তা'রা কী করে, কী খায় কী গায়। তবুও ভেখ্ নিয়ে ঘুরে বেড়ানো, লোক ঠকানো এই হাজারো মানুষের মাঝে, মাঝে মাঝে আমি ধরে ফেলেছি ঠাকুরের ঠাকুরালি। আমার সত্ত্বায় মননে দর্শণে, ধরা পড়েছে তার নিটোল রূপ, একবার নয়—বার বার! আর তাই বিশু কী গোপাল-সাধুর কাহিনী আমাকে লিখতে হচ্ছে।

গল্প আমি লিখি না। কল্পলোকের দরজা খুলে দিতে আসিনি, অল্প করে অলপ্পেয়ের মত। পাঠককে ঠকাতে চাই না—আষাঢ়ে গপ্পো ফেঁদে। যা দেখি সেটাই বলি, ছেঁকে নিই আমার অধীত বিদ্যার ছাঁকনিতে। সে বিদ্যা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের যেমন আছে, তেমনি আছে বিশ্বমাতার পাঠশালার পাঠগুলোতেও, আর প্রতিদিনের নিরবচ্ছিন্ন কারিক্যুলামে। আর আমার অস্তিত্বে মোচড় মেরে, যে সাধু মহাজনেরা পথে নামিয়েছে, তারাই দুঃখ-দরদ ভালবাসা দিয়ে বলেছে, "মূর্খকে জানবার জন্য তুই এসেছিস, আর এক মূর্খ দম্পতির ঔরসে—ওরা কী সত্যি মুর্খ? তুই একাই পণ্ডিত?

নিজেকে বড্ড অহংকারী করে তুলেছিস বলেই, তুই মুর্খ হরিণের মত চোখ বুজে বসে আছিস। সবটাই পণ্ড করার পণ্ডিত তুই। এমন করে সবজান্তা ভণ্ড সাজিস না। মিশে যা' ওদের সাথে। ওদের প্রাত্যহিক জীবনে-মননে, লোভে-লালসায়, অসহায়তার ফেনিল গরলে, হয়ে যা নীলকণ্ঠ। তারা*[১] একদিন আসবেই। তোকে বলতে হবে তাদের কথা, অংশীদার হতে হবে তাদের অশ্রু আর আনন্দের। এরাই তোর ঈশ্বর, এদের খুদ কুঁড়ো জুটলে, জুটবে তোরও।

জীবনের তিন ভাগ তোকে দেখিয়েছি ঘাট থেকে ঘাটে, হাটে-বাটে-মাঠে, মঠে-মন্দিরে-মসজিদে-গীর্জায়; মজ্জায় মজ্জায় তোর তার অনুরণন-প্রতিফলন দেখবি। থামিস না, লিখে যা। লেখাও এক রকমের এগুনো তার দিকে, তাকে ধরতে"। "আউগাইয়া ঝা, ডরস্ ক্যা.....কলম্ ধর, লিখ্যা ফালা যা দ্যাখছস্-দ্যাখতাছস-দ্যাখবা। লিখনের সময় আম্যু থাকুম। কইয়্যা দুমুনি, কি থ্যিকা কী হয়!" বার বার করে বেজে চলে কথাগুলো মনের মধ্যে, যখন একা একা থাকি। সে অন্তর্যামী গুরু অন্তরে লুকিয়ে থেকে, বার বার করে কেন যে আমার উদাসী বাউলের একতারাটার তারে, নিষ্ঠুরভাবে টান মারে বুঝি না!

* তারা— মহাকালীর দ্বিতীয় রূপ, দ্বিতীয়া মহাবিদ্যা—ত্রাণকর্ত্রী।

অদ্ভুত এক বিষন্ন মানসিকতা ঘিরে ধরে, আর আমার রোজনামচার পাতায় পাতায় লেখা হয় তা' অশ্রু-আখরে। 'আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন'*[1] লুকিয়ে থাকে যে, আমার অপনায়*[1] সাক্ষীরূপে-দ্রষ্টারূপে, সেইই হয়তো এমনি করে অস্থির কণ্ঠে বলে, "সব্ গুলান্ লিইখ্যা ফালা"। নুন-মাটিতে লেখা-পড়া শেখা এই দুর্বল হাতগুলো, এতবছরেও সবল হয়নি। দরকচা মারা মনটা এখন মানুষ দেখলে ভয় পায়। মনে হয় এই বুঝি চাঁদার খাতা বের করে কোন দাবী সনৎ পেশ করে, অথবা লাল-নীল-সবুজ-হলুদ পার্টির মিছিলে যোগ দিতে বলে।

এই কোলাহল, প্রতিদিনের ক্লেদাক্ত জীবন, যা আমরাই তৈরী করেছি; সে জীবন থেকে তাই সে ঈশ্বর পালিয়ে গেছে; চরম নীরবতা আর নৈঃশব্দের রাজ্যে, যেখানে সে হয়েছে ধ্যান-মগ্ন। কালকূট বিষ শুষে নিয়েও যার নিস্তার নাই, রাখতে হয়েছে কণ্ঠায়। দূরের ঘন্টায় ঢং ঢং করে যখন-সংগীত বাজবে, সে উগরে দেবে সে বিষ, আমাদের তৈরী করা বিষকে ঝেঁটিয়ে দিতে।

সেদিন তারা আসবে না তার অমৃতনিস্যন্দী পয়োধর উন্মুক্ত করে, সে জ্বালা নিবারণ করতে। আসবে মহাকালকে পায়ের তলায় ঘুম পাড়িয়ে রাখা ঘোররূপা সে মহাকালী, লোলজিহ্বা বিস্তার করে চুল ছড়িয়ে সেই শ্মশান-ভূমিতে, বলবে— আয়, আয়! কিন্তু অনেক দূরে যে সে দিনগুলো। কই, সে অঘোরীর শেয়ালগুলো তো, মারণ-সন্ধ্যার প্রহর হাঁকছে না! আর কত দেরী মাগো! পথের ক্লান্তি ভুলে*[2] তোর ওই স্নেহভরা কোলে করে তুই তুলে নিবি মা মহামায়া! বড্ড কষ্ট হচ্ছে এই জীবনটা বয়ে বেড়াতে! বড় ব্যথা যে এই বুকে!

মহাকালের 'ঘড়িটা বলে টিক্ টিক্ টিক্ , যা কিছু করতে আছে করে ফেল ঠিক'*[3]। সবাই বলে সে ঠিকই করেছে, আর ঘড়িটাও বলে যে সেও ঠিক করছে। তার সময়তো মাপা কালের নিক্তিতে, টিক টিক করে সে ছেঁটে দেয় সময়কে, তার গজিয়ে উঠা ডালপালাকে নিষ্ঠুর হাতে। মহাকালের ত্রিশূল ঠেকানো আছে তার পিঠে। ওই বিরাট আকাশ ঘন্টায়, যখন ঢং ঢং শব্দ হবে ঘোর রবে, জীবনের দোলক ওই সূর্য্যের নিভে যাওয়ার ইংগিত বয়ে আনবে। মহাকাল তার শিঙায় মারবে ফুঁ; কংসরূপী তারের পুতুলেরা, কাৎ হয়ে পড়ে থাকবে স্টেজের উপর। পোষাক খুলবার সময়ও হবে না তখন। শেষ গাড়ীটা তখন 'গ্রীণ সিগন্যাল' পেয়ে, চলতে শুরু করবে, রুকবে না বুক ফাটিয়ে কাঁদলেও। বাতাসে ভাসবে সেই নিষ্ফল ক্রন্দন, "এই রোকো, পৃথিবীর গাড়ীটা থামাও!"*[4] ইথারে ইথারে ছড়িয়ে, উল্টে বাজবে অন্য রকম হয়ে, ভেংচি কাটার মত।

আমার সব ব্যর্থতার গ্লানি যখন, অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ে, যখন মুছে নিই

[1] কবি কাজী নজরুল ইসলাম। / *[2] বিখ্যাত গান—(?)। / *[3] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। / *[4] সলিল চৌধুরী।

দু'হাতে এমনি করে নির্জনে, যখন কেউ থাকে না সেখানে—আমি আর আমার নির্বাক নিরাকার ঈশ্বর ছাড়া, তখন যেন কারও অমল স্পর্শ পাই—সব হারিয়ে যখন মনে হয়, "কই হারাইনি তো কিছু! আমার তো কিছু ছিল না, তবে হারালামটা কী! দেখতো কেমন পাগলামী!"

আজ তেমনি হয়েছে । যখন চোখ মুছে রেল লাইনের উত্তরে তাকিয়েছি—দেখি একটা মাঝবয়সী **তিনফুটী লোক, ল্যাংড়াতে ল্যাংড়াতে** মাঠ ভেঙ্গে, দৌড়ে আসছে প্লাটফর্মের দিকে। একটাও লোক নাই দুবরাজপুর প্লাটফর্মে। এমন কি যে লোকটা সবুজ ফ্ল্যাগ দেখায়, সেও না। আর **আমি চেয়েছিলাম আমার নিরুদ্দেশ বোবা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে, এই রৌদ্রদগ্ধ চৈত্রের নিরালায়, একটু কাঁদব বলে আপন মনে; ব্যথার ডালি সাজিয়ে পূজা দেবো তাকে; অশ্রুনিসিক্ত নৈবেদ্যে। নিরাশ করেনি সে আপনভোলা মহাকাল!**

অশ্রুভরা পূজা নেবার শেষে, **আশীর্বাদের মত** পাঠিয়ে দিয়েছে ওই ল্যাংড়া, **পচে-যাওয়া পা-ওলা**, সেই পাগলা গোপালবাবাকে। মুখে যার ভুরভুর করে; মহুয়ার গন্ধ তখনও বেরুচ্ছে। রক্ত ঝরে পড়ছে পচা ঘা থেকে। গোদের মত ফুলে উঠেছে পা-টা। কুচকীতেও ব্যথা তার। টেঁসে যাওয়ার সমূহ লক্ষণ নিয়ে হাজির সে। গাড়ীটা সে ধরতে পারলো না। মালগাড়ীটা তার মত **বে-ওয়ারীশ** মালকে, নেবার জন্য দাঁড়ালো না। শুধু 'ভোঁ-অঁ-অঁ' করে, যেন **ভাগ্ শালা** বলে, আমার কাছে **গছিয়ে** দিয়ে গেল; চৈত্রের ভরদুপুর বেলায়।

মহাকাল আড়াল থেকে যেন বললো—"প্যামা, ওর অশ্রু মুছে দে। ও' কালীকে খুঁজছে । মন্দিরটা দেখিয়ে দে, আর্জি পেশ করবে ও'—তুই পেশকার হয়ে যা। ফাইল রেডি করে দে, বিচারের বাণী (order) ঝাড়বে মহাকালী। সে বাণী ভালোমত বউনি না হলে, কোন দিনই কার্য্যকরী (implemented) হবে না। কংসের রাজত্ব এখন চলছে । তবুও তুই এই নাটকে অংশ নে, খানিকটা যদি কিছু করতে পারিস"।

হঠাৎ বেজে উঠল কালের ঘন্টা, ঝুলিয়ে রাখা স্টেশনের রেলের পাতে। মুখ থুবড়ে পড়া গোপালকে জাপটে ধরে, রিক্সা স্ট্যাণ্ডে নিয়ে এসে দেখলাম, একটাও রিক্সা নাই। মহা মুস্কিলে পড়লাম। হাঁটিয়েও তো নিয়ে যাওয়া যাবে না। বসিয়ে দিলাম তাকে, একটা ইউক্যালিপটাস গাছের তলায়। বললাম, "এখানে বসো, একটা রিক্সা ডেকে আনি।"

বাস রাস্তায় বেরিয়ে দেখলাম, দূরে একটা রিক্সা আসছে । মনে হ'ল সে যেন বাড়ী ফিরছে। তবুও তাকে বললাম, "জল-কালীতলা চলো।" যেতে রাজী হ'ল না সে। বললো **খেতে যাবে** সে বাড়ীতে। বললাম, "খেতেই যদি চাও, তবে আমার সাথে

এসো। **প্রসাদ** পাবে মন্দিরে, মা'র কাছে **আশীর্বাদও** পাবে। পয়সাও দেবো, **কারণ-প্রসাদও** পাবে। তোমাদের বিশে আমাকে চেনে। শুধু একটা রুগী আছে বলে তোমাকে বলছি। না হলে আমি তো, মাঠ দিয়েই চলে যেতে পারতাম। রিক্সাটা একটুখানি ওই পাহাড়ের কাছের মদের দোকানে নিয়ে যাবে, ওখান থেকে দু'বোতল **কারণ** নেবো''।

রাজী হয়ে গেল লোকটা। সে সাঁওতাল নয়। **হিসাব** করে দেখলো যে, সবটাই **তার লাভ**। মন্দিরে মার কাছে **যাওয়া হবে, প্রসাদ পাওয়া হবে, কারণ-প্রসাদও মিলবে—মিলবে ভাড়াটাও**। সে ছুটে গিয়ে গোপালকে পাঁজাকোল করে তুলে, চড়িয়ে দিল তার রিক্সার বাঁ দিকে। আর ডান দিকে আমি বসলাম, গোপালকে বাঁ-হাতে জাপটে ধরে। নাম তার শ্যাম কাহার। জোরে ছুটিয়ে দিল শ্যাম তার রিক্সাটা। নতুন-সাধু আমাকে সে না চিনলেও, এটা সে বুঝেছে যে, মার কাছে একটা **ডাক্তার-সাধু** আসে। এ' হয়তো সেইই হবে। না হলে সাধুর সাথে **রুগী কেন**? রুগীকে **হাসপাতালে** না নিয়ে গিয়েইবা কেন তাকে **মন্দিরে** নিয়ে যাচ্ছে ?

সে শুনেছে যে, মার সেই **ডাক্তারভক্ত** এলে, মা সে কথাটা বলে দেয় **সকলকে**। যার যা' রোগ বালাই আছে, সবাই যেন আসে **সারিয়ে নিতে**। মনের রোগের ওষুধও মেলে মা'র কাছে। সেটা আর কিছু না, খালি—ঠাকুরের বেদীর **কয়টা শুকনো ফুল**। তামার **মাদুলিতে ভরে** সেটা শুধু গলায় পরা। ব্যস, সব কম্ম খতম। মা বলে—**সুখে থাক্ বাপেরা**। ভূতে তোদের **কিলোবে** না আর।

প্রথমে মনে হয়েছিল, রোদের তাপের চোটে গোপালের **গা গরম** হয়ে উঠেছে। এখন দেখি **বিষম জ্বরে** তার গা পুড়ে যাচ্ছে। ভুল বকতে শুরু করেছে সে ব্যাটা। মরে গেলেও, ডাক্তারের কাছে যাবে না সে ব্যাটা। তাছাড়া তার পয়সাইবা কোথায়? হাসপাতালে যেতে চাইলে, অনেক দূরে গাড়ী করে যেতে হয়। সকাল থেকে লাইন দিতে হয়। তাছাড়া তার মত **সাধুকে** ডাক্তারেরা, দিদিমণিরা **পাত্তা দেয় না**। উল্টে ওরা বলে ঠ্যাংটা **কেটে** দেবে। তাই সে আর ও'মুখো হয় না। ওষুধ দিলেও সে খাবে না।

যেদিন সে আমাদের রিক্সাকে ঘিরে ধরে, তার সব অভিযোগ **উজাড় করে** দিয়েছিল, আর আমাকে ভূত ধরবার, **মোক্ষম মন্ত্রটা শেখাবে** বলেছিল, সেদিন বুঝেছিলাম যে, সে মাল-টি কী বস্তু। মা বলেছিল, ''দে ক্যানে ভাল কোরাঞ উয়াকে''। ভেবেছিলাম মার ওখানে বেশী দিন না থেকে, তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে আসবো। **কিন্তু** দাদা **(স্বামী আরূপানন্দ)** আসতে দিল না। বললো, ''মন্দিরটা ঠিক করে **সারিয়ে দিয়ে** যা। আমি ওই ব্যাপারটার কিছু বুঝি না। টাকা পয়সা **যা লাগবে**, সব আমি জোগাড় করে দেবো। তুই ক'টা দিন Supervisory করে, তবে যা।''

জল-কালী সাধু মাও তাই বললো। তাই থেকে গেলাম আরও কয়টা দিন। মনে

মনে ভেবেও ছিলাম, "যখন এখানে থেকেই গেলাম, তখন তো গোপালের ব্যাপারটা, একটু সহানুভুতিতে দেখা যেতে পারে।" বিশে-কে বলে রেখেছি যে, "বক্রেশ্বর যাবো গোপালকে ধরতে। ও'র পা-টা ভাল করতে হবে।" কিন্তু বিশে-র সময় হয়নি, নানা কাজের জন্য। এদিকে আবার ভেঙ্গে-পড়া মন্দির সারাবার ভীষণ তোড়জোড়। এ হেন সময়ে, সে বেটী তার **পাগলা** গোপালকে, পাঠিয়ে দিয়ে **রগড় দেখছে** যে, এই **হাফ-ডাক্তার প্যামা-চাঁড়াল কী করে।**

একটা ওষুধ দোকান খোলা দেখে, রিক্সায় বসে বসেই তাকে অর্ডার দিলাম—"ডাইজেপাম—এক পাতা, লিগ্‌গোকেন—এক ভায়েল, বিটনিসল মলম—দু' টিউব, পাঁচশ' গ্রাম ব্যান্ডেজ—একটা প্যাকেট। আর এস্‌জিপাইরিন ট্যাবলেট—দু'পাতা।" এরকম একটা সাধু-খদ্দেরের **বড় অর্ডার** পেয়ে বর্তে গেছে সে দোকানদার। সকাল থেকে বউনি হয়নি তার। আমার হাতের তিনখানা একশ' টাকার নোট, তখন তার নাকের ডগায় নড়ছে । খপাৎ করে ধরতে গিয়েও, যেন লজ্জা পাচ্ছে সে। লাল-গেরুয়া কেরামতি কিনা!

ফক্‌টে মারবার তালে নাই আমি। সেটা বুঝে নিয়ে, দৌড়ে দোকান থেকে সে বেরিয়ে এলো, ক্যারি-ব্যাগে ওষুধগুলো নিয়ে। শ্যামকে চেনে সে লোক। বললো, "অত টাকা তো দাম হয়নি বাবা! আমার কাছে তো খুচরো নাই।" বললাম, "রেখে দাও, জলকালী-মার এ্যাডভান্স একাউন্টে। আরও কিছু ওষুধ তো লাগবেই"। সে গলে জল হয়ে গেল। তার দোকান থেকে, ওষুধ-খাবার একটা গ্লাস চেয়ে নিয়ে, চললাম মদের দোকানে, **মামা-ভাগ্নে পাহাড়ের** কোলে।

দোকানদার ধরাধরি করে নামালো গোপালকে, শ্যাম সাহায্য করলো তাকে। এক নম্বর **মালখোর দুই সাধুকে**, সে ব্যাটা চিনে রেখেছে। তারই বিক্রী করা মাল, তাকেই আবার **খাওয়াই আমরা, প্রসাদ করে**। তাই সে **আমাকে আর দাদাকে** এক নম্বর সাধু ছাড়া, দু'নম্বর কখনো ভাবে না।

গোপালকে এ' অবস্থায় দেখে সে বুঝেছে, আমি নিশ্চয়ই তাকে রাস্তা থেকে **কুড়িয়ে নিয়ে** এসেছি। ভক্তি গদগদ হয়ে সে বললো, "বলেন বাবা, কী করতে হবে?" বললাম, "গোপাল এখন রোগ যন্ত্রণায় আর জ্বরের ঘোরে আছে। এইই সুযোগে ও'কে ওষুধ খাবানোর। তুই দু'টো এসজিপাইরিন ট্যাবলেট **গুঁড়ো কর্ ব্যাটা। ওই গ্লাসে দে গুঁড়োটা, আর ও'তে ঢাল র (raw) হুইস্কি।** গালটা চেপে ধরে তিন গ্লাস মাল গিলিয়ে দে। শ্যাম ওকে চেপে ধর, আমিও ধরছি। তার আগে এক বালতি জল নিয়ে আয়, পা-টা ও'র ধুয়া'তে হবে। একটু ব্যাণ্ডেজও বাঁধতে হবে। পরে আর সব ঠিক করা যাবে, এখন এ'টুকু হলেই চলবে।

দোকানদার রঘু ইতস্ততঃ করছে, কোন বোতলটা সে খুলবে। বললাম, "শালা, **এক লিটারের** বোতল খোল্, ম্যাক্‌ডয়েল **হুইস্কি** দিবি।" তিনটা বোতল বের করে, সে দু'টো দিল শ্যামকে, রিক্সার সীটের তলায় রাখতে। আর একটাকে মোচড় মেরে ছিপি খুলে, খানিকটা ঢাললো গ্লাসে। ট্যাবলেটের গুঁড়ো-গুলো দিয়ে নেড়ে দিল গ্লাসটা। ততক্ষণে শ্যাম পাশের দীঘি থেকে, জল এনেছে বালতি করে।

তিন জনে চেপে ধরে, গোপালকে গিলিয়ে দিলাম, তিন গ্লাস র (raw) মাল। বিলাতী মালের গন্ধ সে পেয়েছে। তাই রোগের ঝিমুনিটা আর তার নাই। চোখ বড় বড় করে দেখছে যে, সে কোথায় এসেছে। আমাকেই বা সে সেখানে দেখছে কেন? অসম্ভব **ভ্যাবাচাকায়** পড়ে গেছে সে! তাকে বললাম, "গোপালবাবা, মা'র আদেশ হয়েছে আমার উপর। কালীকে নামিয়ে আনতে হবে **কৈলেশ থেকে**, ওই বক্রোমুনির **মহাশ্মশানে**। সেখানে এ' ক'দিন কেউ **যেতে পারবে না**, কি দিনে—কি রাতে। গেলেই **কাঁচা খেয়ে** ফেলবে সে।

আজকাল মা-কালী খুব **রাগী হয়েছে**। সে রাগ পুষে পুষে রেখেছে, তারাকে **তাড়া করবে বলে**, শুধু তোমার জন্য। এতটুকুও রাগ খরচ করেনি। রাগের মাত্রা তার কম পড়ে গেলে, তারা-মা যুদ্ধে জিতে যেতে পারে। আমিও বলেছি, **মারপিট** করবার বেলায়, **যত মালের খরচ হবে**, সবই আমি দেবো। তুমি খালি তোমার ভাই-ঝি-তারাকে, **বেধকড় মার দাও, তোমার লম্বা খাঁড়াটা নিয়ে।**

তো সে রাজী। শুধু বলেছে যে এ' ক'টা দিন খালি তোমাকে, জলকালীমার কাছে থাকতে হবে। হত্যে দিয়ে ওই **দেবী-শিলায়** মাথা কুটতে হবে। শিব সপ্ন থেকে কালীর হাতে, দেবরাজ **ইন্দ্রের দোকান থেকে** ওষুধ পাঠিয়ে দেবে বলেছে। তোমাকে আর ওই **পাজীর পা ঝাড়া ডাক্তারের** ওষুধ খেতে হবে না। ঝাঁটা মারি ওদের ওষুধের মুখে। **ডাক্তার না ডাকাত ওরা**?"

নেশার ঘোর লাগছে তার। বিলাতী মাল কাজ করছে তুরন্ত্। ওষুধেরও কাজ চলছে ত্বরিৎ গতিতে। এখন সে পা-টা নাড়াতে পারছে। কুঁচকীতে তার আর টান পড়ছে না। শুধু সে বললো, **"গলাটো শুখাই যেছেক গ, সাদুবাবা। এট্টুকুন জল দাও ক্যানে!"** রঘু বড় গ্লাসের একগ্লাস জল এনে তাকে দিতে, ঢকঢক করে সে খেয়ে ফেলল। আমি আবার বললাম, "এক মন্তরে তোমার পা ভাল করে দিয়েছি কিনা সেটা পরীক্ষা করো। নিজে উঠে গিয়ে রিক্সার সীটের তলায় বাক্সে, **মা-কালীর জন্য বিলাতী মাল** আছে কিনা দেখো।"

সে ল্যাংড়াতে ল্যাংড়াতে, ছুটে গিয়ে সীটটা তুলে দেখে, বেজায় রকম খুশী হ'ল। আমি যে তাকে **গুল্ মারিনি** সেটা বুঝে, সে পড়লো আমার পায়ে। আবার

বললাম, "এক ছু মন্তরে তোমার যন্ত্রনা ভাল করে দিয়েছি! শ্যাম আর রঘুকে জিজ্ঞেস করো। এবার সগ্ন থেকে ওষুধ এলে ঘা-টা ভাল করে দেবো। শ্যাম আর রঘু পা-টা ধুয়ে দাও, ব্যাণ্ডেজ করে দিই, রক্ত পড়ছে।"

শান্ত বালকের মত অসম্ভব মুগ্ধতায়, সে পা বাড়িয়ে দিল। ওরা ধুয়ে দিলো তার পা, আমি বেঁধে দিলাম ব্যাণ্ডেজ। তা'কে তুলে দিলাম রিক্সায়। বললাম, "ঠিক করে বসো এখানে। রঘুর সাথে একটা কথা বলে আসি আমরা।" বলে শ্যামকে একটু চোখ টিপে দিয়ে, দোকানের ভেতর যেতে বললাম। রঘু ততক্ষণে খুলে ফেলেছে, তার টিফিন ক্যারিয়ার। তা'তে ঠাসা ফুলকপি ভাজা, মাছ ভাজা আর ডিমের ওমলেটের ঝোল। কয়টা কপি ভাজা তুলে মুখে দিলাম। ডিমটাও গেঁড়িয়ে দিলাম। তারপর ফু-ফু করে ফুঁক্ মারলাম, তার টিফিন ক্যারিয়ারে, আর মালের খোলা বোতলে। বললাম, "প্যাসাদ হয়ে গেল, লে শালারা মায়ের প্যাসাদ। একটু জল লিয়ায়।"

একগ্লাস জলের খানিকটা খেয়ে, তা'তে ঢেলে দিলাম বেশ খানিকটা র (raw) মাল। সেটা খেয়ে ওদেরও খানিকটা করে প্রসাদ দিলাম। অযাচিতভাবে বিলাতী-কারণের পেসাদ পেয়ে, অভাবিতভাবে দু'জনে কাঁদতে লাগল, দু'জনের গলা জড়িয়ে আনন্দে, দুঃখে নয়। পা ছাড়ে না আমার। হাঁকাড় মারলাম জয় তারা বলে। ওরাও বলে উঠলো, জ্যয় তারা, জ্যয় তারা, জ্যয় তাড়া!" (ততক্ষণে তাদের জিভ জড়িয়ে আসছে।)

রিক্সার উপর বসে থাকা গোপাল, সব কিছু গুলিয়ে ফেলে, আবার সচেতন হয়ে গেছে যে, তার পরম শত্রু তারাকে, কেন ওরা জ্যয় দিচ্ছে? বিগড়াতে লাগলো সে মনে মনে। একবার তো বলেই ফেললো—"ত্যুরা তারার জয় দিছিস্ ক্যানে? উ মোর কথাটো শুনে লাই। বেবাক্ ভুতগুলোকে বুলে দিছে চোক্ মারতে। উরা আম্যাকে ঢিলাইছে রেতের ব্যালায়। পা-টো আম্যার পচাই দিছে। উয়ার জয় দিছিস? ত্যুদের কী ক্যন জ্ঞান নাই?"

পড়েছি মহা ফ্যাসাদে। জিভ ফস্‌কে বলে ফেলেছি "জ্যয় তারা"। গোপালের রাগের কথা, আমার মনেই ছিল না। সে তাকে মারবার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর আমি কিনা—শ্যাম আর রঘুকে নিয়ে, থ্রি মাস্কেটিয়র্স হয়ে তারার জয় দিচ্ছি! গোপাল আমাকে ছাড়বে কেন? বুদ্ধিটাও যথাসময়ে, মাথায় আমার আসে না।

শুধু ওকে থামাবার জন্য খিস্তি দিয়ে বললাম, "শালা ফের্ মুখ খুলেছিস কী, কালীকে চলে যেতে বলবো কৈলাশে। তোর বক্কোমুনির শ্মশানে, সে কেন থাকবে শুনি, মশার কামড় খেয়ে? হিমালয় পর্বতের মাথায় বরফ-জলে সে চান করে। আর তোরা শালা, উখানকার বক্কেশ্বরের গরম জলে তাকে চুবাইতে চাস? গায়ে ফোস্কা পড়লে, কে দেখবে শুনি? একেই-তো নিজের ঠ্যাং-টার, বারোটা বাজিয়েছিস।"

যাই বলি না কেন, যুক্তি একটাও **যুতসই** হচ্ছে না, যা'তে ওকে ভালো মতো **কুপোকাত** করতে পারি। মালের ঘোরে সে থাকলেও, **তালে ঠিক** আছে । বেজায় রাগে ফুঁসছে সে, তার শত্তুরকে আমরা **জ্যয় দিয়েছি** বলে। তিন জনে মিলে **ষড়যন্ত্র** করে, তাকে **অপদস্থ** করছি! রাগ তো এমনি আর হচ্ছে না তার! **বাদুড় ভুতেরা** তবু কখনো কখনো, **আম-আমড়া-পেয়ারা ছুঁড়ে** তাকে টিলিয়ে মেরেছে। সেগুলো কুড়িয়ে, সে প্রতিদিনই **খেয়ে ফেলে**। পয়সা দিয়ে ও'গুলো তাকে **কিনে খেতে হয় না**! আর তাই তা'তে তার রাগটা, **একটু কমই হয়েছে**।

কিন্তু ওই পেঁচো ভূতেরা? **বেইজ্জতির চুড়ান্ত করেছে** গোপালের। ইঁদুর-ছুঁচো আর সাপের **হাড় ছুঁড়ে** তাকে মেরেছে! তার বারণ শুনেনি। উল্টে তাকে **চোখ-মারে** আজও, রাতের বেলায় যখন সে; শংকর খ্যাপার সমাধিতে ধূপ জ্বালিয়ে ফেরে। শংকর খ্যাপাও (লালবাবা) তার পক্ষ নেয়নি। আর তাই বা সে নেবে কেমন করে? তারা তো তার **ঠাক্‌মা হয়**। বামাক্ষ্যাপার মা হলে, **শংকর খ্যাপার ঠাক্**মা সে হবেই, সোজা হিসেব। জলকালীমাকে গোপাল ব্যাপারটা বলেছে কয়েকবার, কিন্তু সে বেটীও গোপালকে **পাত্তা দেয়নি**।

দুঃখ তার সেটাই যে, কেউ তার কথা আজও **শুনলো না। গোপাল কাহার**, এখন কাহার, সেটাই এখন **বিচার্য্য বিষয়** হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিলাতি মালের ঘোরে, রঘু আর শ্যাম দু'জনেই বুঁদ। মাঝে মাঝে তা'রা তেড়ে-তুড়ে **"জ্যয় তাড়া"** বলে চেঁচাচ্ছে। রাগটা সে জন্য **আরও বাড়ছে** গোপালের। থামানো যাচ্ছে না তাদের—খালি চেল্লাচ্ছে **"জ্যয় তাড়া, জ্যয় তাড়া"** বলে।

হঠাৎ আমার মাথায় বুদ্ধি চলে এলো। বললাম, **"জ্যয় দে, জয় দে-রে শালারা। টেনে লিয়ে আয় উ শালীকে, জলকালীর কাছে। ওর বড় লম্বা খাঁড়া দিয়ে, বলি দিবে ওকে ওই গোপাল নিজের হাতে। গোপাল না পারলে, আমি আর জলকালীমা দু'জনে মিলে, আগে জলে চুবাবো তারাকে। তারপর দম হাল্কা হয়ে গেলে, কুপাবো সেই লম্বা খাঁড়াটা লিয়ে। জ্যয় দিলে কারণের লোভে, দৌড়ে আসবে তারা। আর আমরা চারজনে মিলে জাপটে ধরে, জলকালীর কাছে তাকে লিয়ে যাবো।"**

"মালের বোতল রেখেছি, লোভ দ্যাখাবার জন্যে। ওটা তো কালীই খাবে। শুধু 'খালি' বোতলটা ওকে দেবো। খালি কর্‌না ক্যানে বোতলটা বোতলটা, এখনো শালারা খালি করতে পারিসনি দু'জনে? কোঁৎ কোঁৎ করে, গিল শালারা। গোপালের মত বড় সাধু, কতক্ষণ রিক্সায় বসে থাকবে শুনি? বেরিয়ে আয় শালা শ্যাম, গাড়ীটা টান, বেলা এখন একটা বাজে।"

ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছে ওরা। তাই জোরে জোরে, **আরও** বার তিনেক **জ্যয়**

তাড়া বলে, ওরা গোপালের **কব্জায় ফেলতে** চেষ্টা করলো তারাপীঠের তারাকে। গোপাল তো বেজায় খুশী। অতবুদ্ধি তার **কাহারী-মাথায়** আসবে কেন? ছোট **সাদুবাবা'র** (আমার), সে তারিফ করতে লাগলো বেজায় রকম। শ্যামকে চোখ মেরে, রিক্সা চালাতে বললাম। রঘুকে বললাম, "হিসেব করে রাখিস, এখন দ'শ টাকা রাখ। জানি ও' আর চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা পাবে। দিয়ে দেবো এক সময়, কাউকে টুপি মেরে কী গেঁড়িয়ে। শালা, সাধুর আবার **কথা দেওয়া**!

রিক্সা চলতে শুরু করলো। জলকালীতলায় এসে, গোপাল রিক্সা থেকে নেমে, মাকে উপুড় হয়ে প্রণাম করতে করতে বললো—"এসে যেছি গ', মা গ'!" দাদা সামনে পড়তেই, তাকে চোখ টিপে কপট রাগে বললাম, "তোমাকে গোপাল নাকি, তারার কথা বলেছিল? তুমি শুন লাই ক্যানে? গোপাল এখানে ক'দিন, মা কালীর কাছে **হত্যা দিয়ে** পড়ে থাকবে। কালী এসে **তারাকে পিটালে, তবেই গোপালের শান্তি।**

এখন ওর পায়ে ভালো করে ওষুধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে হবে। এই শালী ফুলি, কোথায় গেলি রে? জল গরম কর। তুলো মুঠো খানিক ফ্যাল্ তা'তে। দেখছিস না—**সপ্ন থেকে, শিব ওষুধের ঠোঙা পাঠিয়ে দিয়েছে। ইঞ্জেকশানও পাঠিয়েছে**। মা, দুটো মালের বোতল রেখে দাও। কালী যখন তারাকে **মারতে মারতে**, জল খেতে চাইবে, তখন জলের বদলে—**মাল ঢেলে দিও** তাকে। বেজায় নেশার ঘোরে খুব **ক্ষেপে গিয়ে**, সে তখন বেজায় রকম **মারবে তারাকে**। গোপালের **পায়ের অবস্থা** দেখেছো? যাও মালের বোতল দুটো নিয়ে যাও।"

ফুলি আর বিশে এক খেপ নুড়ি-পাথর মাল কুড়িয়ে এনে, প্রসাদ খেয়ে শুয়ে পড়েছে। আমি গোপালের পায়ে নূতন করে, ব্যান্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে বললাম, "গোপাল, কালীকে যে সেদিন **গুড়ের দিশি মালের মধ্যে, ঘাড় ধরে চুবাতে বলেছিলাম, সেটা কী তুই করেছিস?**" গোপাল মাথা নাড়লো এদিক ওদিক—অর্থ্যাৎ না!

—— "কথা শুনিস্ না কেন? নিজেই শালা **মেরে দিছিস্** সবটা?"

—— "সি কথাটো **মনে লাই** গ'। **ভুলেঁ যেছি গ'**। খ্যেএ্যা ফেলাএ্যছি গ' "।

—— "তবে ভাগ্ শালা। কাজ হবেক্ লাই। কালী কি তোর, **বাপের চাকর** আছে বটে? তোর কথায় সে **চলবেক্ বুঝি**? উয়ার কাম কাজ লাই? বিলাতী মাল উয়াকে খেবাইলে, উ কী **দেশী গুড়ের মালের কথা** ভুলে যাবেক? ত্যু শালা কী ভুলতে পারিস? এ-হে-হে-রে, শালা সব **গুবলেট্ পাকাইছিস!** তোদের সাঁইথের মাল **বড় মিঠা বটে**! নানুরের মাল ত' নুন্যের পারা। ত্যু শালা **সাঁইথের মাল্টো,** একাই সাঁটাই দিছিস! কালী ত্যুর হএ্যা **লড়বেক্ ক্যেনে**?"

বললাম, "ঠিক আছে, তোকে না হয় ক্ষমা করে দিলাম। মা কালী স্বপনে আমাকে বলেছে তোকে ক্ষমা করে দিতে। তুই শালা নাকি, মা-কালীর এক নম্বর **সন্তান**। সেটা আমি **ধ্যান করে** বুঝেছি। মা কালী আমাকে বললো, "গোপালবাবা খুব **সৎ আর ভালো লোক**। ওকে খালি সহজ সহজ কথা জিজ্ঞেস করবি। তাই বলছি যে, **মা-তারার পিসি কী করে মা-কালী হলো**—আগে বল। ভাল করে সেটা আগে আমি বুঝে লিই। দাঁড়া, আমার বোকা মাথায় আগে দু'টো চাঁটি মেরে, একটু ঝুনো ঝুনো করে নিই! ব্যাপারটা তবেই মাথায় সেঁদোবে।"

খুব সাংঘাতিক কথা। হিন্দু শাস্ত্র **নূতন করে লিখতে হবে**। আর সেখানে লিখতে হবে যে, খালি গোপালবাবাই সেটা, **একলাই বুঝতে পেরেছে**। কোন **ব্যাটার** সাধ্যি আছে যে, সেটা **মানবে** না? মা-কালী তাকে চিবিয়ে **কাঁচা কাঁচা খেয়ে** ফেলবে না! ওরে—কে কোথায় আছিস? কঞ্চির খাগের কলমটা আনতো।"

পাগলা গোপাল দারুণ ভাবে' **তেতে উঠলো**। বললো, "ক্যানে? সি কথাটো বুলবার পারি গ'। আম্যাদের বনগাঁয়ের জমিদার, সি **রায়বাবুর ম্যেয়াটো** ছিল বটেক। একটা ঠ্যাং উয়ার **ল্যাংড়া ছিলো**। উর নাম **কালী**। উক্যে কালী পিসি বুলতো, সি **তারা মেয়্যাটো**। উদের **পাড়ার হবেক বটে**। সি-অ, **মর্যে যেছেক** বটে। ভগমানই হোছে গ'। সি ত' তারাপীঠ্যে থাকে, উ **দ্বারকা লদীটার** পাড়ে। সিখানে **মহাশ্মশান্** আছ্যে গ'।

কারণ খ্যেএগ্র কত্য সাদুবাবা, সিখ্যানে **সাদন করে রেতের বেলাই**। ছাগ্যল লিয়া য্যখুন সে সোনঝা বেলাই যেত, ত্যখুন **কালী পিসি** বুল্যা হাঁক পাড়ত গ'। গপালবাবা কী **মিছা কথা** ব্যলতে পারে? বিশ্বাস্ কর ক্যানে। **সগ্গে যেলে ভগ্মান-তারা হয়**, সি ব্যাপারটো বুজে **ফ্যেলাএঞছি গ'**। শংকর-খ্যাপা বুলছে—গুপ্যাল, ত্যুও **ভগমান্ হ' ক্যানে! ম্যুই ভগমান হ'তে লারছি গ'**। অখন (অ) **মর্যা যেছিনা গ'**। সোনঝা বেলাই উ মাঠের পানে যেয়েঁ **উয়ার ডাক শুনতি পাই গ'**। সি বাঁশীর পারা সুর। হিদয় জুঁড়াই যায় বটে!

"পিসি—পিসি" বুইল্যা **মা-কালীখে চেতায়**। হিত্যমপুর **কলজির্** (College) গাছ্যের পিছাড়ে, উ তারাটোখে বুল্যেছি—পা-টা ভাল কর্এঞা দোও ক্যানে। শুনল(অ) লাই গ'। ভূতগুলান মুকে পাগলা ভাবছ্যেক্ ক্যানে? ম্যুই ত' জন্ম (অ) সিদ্দ **পিচেশ তান্ত্রিক্** আছ্যি গ'। ভূতগুলানের অপমান **সোজ্জ হছে না গ'**। ধইর্বো আর ঘাড় **মটমট করেঞ**, ভাঙবো মনে লিছে। আমার—**পুরুষের রাগ কিনা!**"

বুঝলাম পরম ব্যথার কথাগুলো তার। কেউ মরে গেলে, **সে ভগমান্ (ভগবান = God)** হয়। গোপাল মরেনি। তাই—**ভগমান** হতে পারেনি। হেতমপুর কলেজের গাছের পেছনে, বাঁশীর মত **নাকী সুরে** নাকি, মা-তারা গোপালকে বলেছে যে, সেই মা-কালী—তার পিসি। জন্ম-সিদ্ধ **"পিচেশ-তান্ত্রিক্"** ভুল কথা বলতে পারে না। কিন্তু

আমার তিন হাঁকাড় (Loud & Cautionery voice) শুনে, সে সন্ধ্যেবেলায় চোখে শুকতারা দেখছে! এই হ'ল—মা-কালী, কী করে মা-তারার পিসি হ'ল, সেই গল্প। রায় বাড়ীর মেয়ে মরে গিয়েই, মা-তারা হয়েছে , আর গোপালকে দেখা দিয়েছে, শংকর-খ্যাপার সমাধির কাছে। যদিও সেখান থেকে হেতমপুর রাজবাড়ী মাইল পনের-ষোল (25km–approx) দূরে।

অসহায় মুখে বসে আছে, আমার দিকে চেয়ে গোপাল। তার শেষ আশার প্রদীপও বুঝি, ফটাস করে নিভে গেল। বড়ই ভুল করে ফেলেছে সে। সবটুকু মাল খেয়ে ফেলেছে, বেজায় লোভে পড়ে। কালীর জন্য সে যখন ভাবেনি, কালীই বা কেন ভাববে তার কথা? অতি লোভের জন্য, এদিকটা তার মনে পড়েনি। আর আমি তার মগজ ধোলাই করছি দাবড়ে-দুবড়ে, যা'তে সে অন্য পাঁয়তাড়া না কষতে পারে। তার বোকামীকে সম্বল করে, তাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে ফেলেছি যে, সে আর আমার কাছ থেকে অন্ততঃ মাসখানিক পালাতে পারবে না।

অনেক লোভ, অনেক ভয় অনেক আশ্বাস দিয়ে, তাকে কব্জায় এনে ফেলার—একটাই কারণ যে, সে রেষ্ট (rest) পাবে, আর তার পায়ের ঘা-টাও শুকিয়ে আসবে। আরও লোভ দেখিয়ে ছিলাম যে, ঢিলিয়ে কয়টা ভুতকে সে মারতে পারবে? তার চেয়ে বরং, যদি ধরে ধরে লংকা-চচ্চড়ি করে, দিশি মালের সাথে চাট করে খায়; তবে তার পেটও ভরবে, আর ওই শুয়োরের বাচ্চারাও মরবে। আম-পেয়ারা কী আমড়া দিয়ে ওকে ঢিলাতে পারবে না । তা'তে পেটো ভুতেরা ভয় পেয়ে পালাবে। আর ওকে হাড় ছুঁড়ে মারবে না।

কিন্তু গোপালের ভূত ধরবার অতি আগ্রহ যে, মাঠে মারা যাবে! তাই সে এ' ব্যাপারে, ঘোরতর আপত্তি জানিয়ে ছিল। বাদুড় ভূতেদের ঘাড় মটকে, লংকা-চচ্চড়ি করতে আপত্তি তার এতটুকু নাই। কিন্তু পেঁচা ভূতেদের সে অবশ্য ধরবেই। আমার কথা সে কোন মতেই শুনবে না।

খেঁকিয়ে উঠে বললাম, "ফের শালা, গুবলেট্ পাকাইছস? কী খেতে দিবিরে শালা উয়াদের। কিস্যে বাঁধবি উয়াদের বল ? পাট-গাছ—শন-গাছের ত্যুর কী চাষ আছে? তোর কি নাইলন দড়ি আছে? নিজেই শালা খেতে পেছিস না, ফ্যের ভূত ধরা! শালা পাজী, সাধে কী আর তোকে ওরা ঢিলায়। এ'সব করলে ভূতের রাজা শিব ক্ষেপে গিয়ে, তোকেই তাড়া করবে। ঠিক আছে, পরে ভাবা যাবে এ' ব্যাপারে, এখন প্রসাদ খেয়ে—মা কালীর মন্দিরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়্। আমি ধ্যান করে সব ব্যাপারটা, জেনে বুঝে লিই আগে।"

গোপাল কোন কিছু আর বললো না। মা তাকে থালায় করে অনেকটা খিচুড়ী

প্রসাদ দিতে, সে গোগ্রাসে গিলতে লাগল। অনেক দিন তার **খাওয়া হয়নি**। আমি তার খাবার জলের সাথে, দু-টো ঘুমের ট্যাবলেট মিশিয়ে দিয়ে, খাইয়ে দিলাম তার অজান্তে। কারণ অনেক **কাটা-ছেঁড়ার দরকার** আছে তার পায়ে। সে না ঘুমালে, সেগুলো করা যাবে না। যেমন করেই হোক ওকে ঘুম পাড়াতে হবে।

যদিও **অসাড় করবার** ইঞ্জেকশান এনেছি। তবুও সাবধানের মার নাই। জেগে থাকা অবস্থায়, তা' সম্ভব নয় কোন মতেই। আস্তে আস্তে গোপাল **ঝিমুতে** লাগল। আমি আর দাদা ওকে শুইয়ে দিলাম, মন্দিরের বারান্দায়। প্রশান্তির কোলে ডুবে গেল সে ধীরে ধীরে। জ্যয় কালী, তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

কুঁয়ো থেকে জল টেনে টেনে তুলে দিল, দাদা নিজে। তার এই ছোট্র চ্যালা (আমি), চেল্লিয়েছে পাগলা গোপালের সাথে অনেক। সকালে বিশেকেও, **ভড়কী মেরেছে** বেজায়। অজেয় তার এই চ্যালা, আর সাধু-মায়ের এই **ল্যাংবোট**, কীভাবে যে খেল্ দেখাচ্ছে, দাদা তা' আন্দাজ করলেও; ধরতে পারছেনা যে এর **মূলটা কোথায়!** আমরা দু'জনে এক সাথে, খেতে বসলাম মা-র বারান্দায়। মা নিজে পরিবেশন করছে।

ওদেরকে সব ঘটনা বললাম। শ্যাম তখনও **গোঁজ হয়ে টলতে টলতে**, স্নান করে চলেছে কুঁয়ার ঠাণ্ডা জলে। খুব আরাম করে চান করে, সেও খেতে বসল মন্দিরের বারান্দায়। মা তাকেও যত্ন করে খেতে দিল। মাকে আমি বললাম, "আমি এখন ঘুমাবো। শ্যাম যদি চলে যায়, তবে ওকে দশটা টাকা দিও। আমার পকেটের বাকী টাকা, তোমার কাছে রোখো, পরে হিসেব হবে। আর একটা টকটকে রঙ্গীন লাল গেরুয়ায়, ওই ওষুধগুলো বেঁধে, গোপালের **বালিশের তলায় রেখে দেবে**। তাহ'লে ও' বুঝবে যে, স্বয়ং **শিব মা-কালীর হাতে ওই সব ওষুধ কিনে পাঠিয়ে দিয়েছে, "দেব্‌রাজ ইঁদরার দুকান থিঞা!"**

ওর মগজ ধোলাই না করলে, ওর পা ভাল করা যাবে না। যাই হোক্ আমি তোমাদের বকলে, ভয়ে জড়সড় হয়ে দু' জনেই, উল্টাপাল্টা মাথা নেড়ে যাবে। একদম হাসবে না। বিশুকেও ওর **ল্যাংবোট** বানিয়ে দেবো। সাথী পেলে, দয়ামায়া মমতার আস্বাদ পেলে; ও' আর পালাবে না। **ভূতকে ঢিলানোর নেশা**, আস্তে আস্তে ছুটে যাবে। সরল সহজ সুন্দর **আরও একটা** ছেলে তুমি পাবে মা।"

মা আমার পাশেই বসেছিল, আমাদেরকে খাওয়াচ্ছিল। যেই না ওই কথাগুলো বলেছি, অমনি তার চোখের পাতায়, জমে উঠেছে অশ্রু। বুঝতে পারলাম না কী অমন বলেছি যে মা কাঁদছে! হতভম্ব হয়ে গেছি । মা চোখ দু'টো বাঁ হাতে মুছে নিযে বললো, "ও কিছু লয়। তোরা চারজনই তো আমার ছেলে—অরূপ, প্রেমানন্দ, গোপাল আর বিশু। একটাই মেয়ে—ফুলী। সব ঠিক আছে।"

খেয়ে উঠে পড়লাম আমরা। সাধুমাও খেতে বসলো। শ্যাম খেয়ে উঠে, মন্দির থেকে মাদুর আর বালিশ নিয়ে, শুয়ে পড়লো বটগাছের তলায়। বেলা তখন বাজে প্রায় আড়াইটা। ঘুমাতে চাইছি, ঘুম আর কোন মতে আসছে না। এপাশ ওপাশ করছি, আর বিড়ি টানছি। ভেতরে ভেতরে কেন জানি না উদ্বিগ্ন হচ্ছি।

দাদা ব্যাপারটা বুঝে বললো—"তোর আর ঘুমিয়ে কাজ নাই। বরং বিশেকে ডেকে দিচ্ছি, তুই গোপালের **পায়ের ব্যাপারটা**, ভাল করে স্টাডি (study) করে, কী করতে হবে—সেটা ঠিক করে নে। বেচারা বড্ড কষ্ট পাচ্ছে। আপন-ভোলা **ভোলা মহেশ্বর ও'**। তোর হাতে যখন পড়েছে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও' ঠিক হয়ে যাবে। সামনে ওর **আমূল পরিবর্ত্তন** একটা, মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি। থাক্‌গে সে পরে হবে।"

জোরে জোরে গভীর নিঃশ্বাস পড়ছে, পাগলা গোপালের। **অনেক দিনের অনিদ্রা, অনশন আর চোলাই—মহুয়া ভক্ষণ, যেন আর কটা দিন গেলেই ওকে পেড়ে ফেলতো**। বাঁচোয়া এই যে ও' আমাদের কাছে এসে পড়েছে। বিশে আর ফুলী আছে, সেটাই ভরসা আর সাহসের। ওদের ধরতে বললে বেঁধে রাখে। দাদা বলেছে ওকে বিলাতী মালের লোভ দেখালে, **মরে গেলেও এ' পাড়া ছাড়া হবে না ও'**।

কালীর সাথে **তারার ঝগড়াটা**, কী করে **বাধানো যায়**, সেটার একটা **প্লান** ছকে ফেলতে হবে। ওই দুই শালা মাল-খোর, আর ফুলীকেও মাল খাইয়ে ব্যাপারটা বুঝাতে হবে যে, "মা-কালী **তক্কে তক্কে** আছে, তারাকে পিটাই করবার জন্য। খালি তারাকে লোভ দেখিয়ে, **এ পাড়ায়** ডেকে আনতে হবে।" শূন্য একটা বোতলকে, বটগাছের ডালে ঝুলিয়ে দিলাম, খানিকটা **লাল জল** ভরে। ঘুম থেকে উঠে গোপাল দেখবে যে, তারাপীঠ থেকে তারাকে আমি ডেকে আনছি, **বিলাতী মালের** বোতলের লোভ দেখিয়ে। কালী-তারা দু'জনেই, বেজায় মাল খায় কিনা!

যাই হোক—তিন চার বার নাড়িয়েও, গোপাল যখন উঠলো না, তখন আস্তে আস্তে তার পায়ের ব্যাণ্ডেজটা খুলে দেখলাম। **বহুদিনের পচা ঘা**। ভিতরে পোকার মত **কী যেন নড়ছে**। খুব ভয় পেয়ে গেলাম। দৌড়ে গিয়ে ফিনাইলের শিশি, মার ঘর থেকে এনে দাদাকে বললাম, "ফিনাইল দিলে গোপাল, **জ্বালার চোটে** জেগে উঠতে পারে। তুমি চেপে ধর।" দাদা বললো, "ও'গুলো আমি দেখতে পারি না। তুই বরং লোকাল **এনেস্থেশিয়া** (local aneasthesia) করে, তারপর ফিনাইলের তুলো চেপে ধর।"

যুক্তিটা মন্দ নয়। সিরিঞ্জে **জাইলোকেন** সলুউশন ভরে, একেবারে পাঁচ সি.সি. ইঞ্জেকশান দিলাম। ঠিক হাঁটুর একটু উপরে উরুর চারপাশ ঘিরে, যা'তে করে যন্ত্রণার **ইমপালস্ (Impulse) ব্রেনে গিয়ে না পৌঁছায়**। ঠিক যেন—গাড়ী চলার রাস্তা, কোদাল দিয়ে কেটে দেওয়ার মত। একটুও নড়লো না গোপাল। দশ-

পনের মিনিট সময় নিলাম, যাতে খুব ভাল করে অসাড় হয়, আর লোকাল সেন্সরী নার্ভগুলো ঘুমিয়ে পড়ে।

তারপর তুলোয় করে, অনেকটা পরিমান কাঁচা (raw) ফিনাইল নিয়ে, ছড়িয়ে দিলাম পচা ঘায়ের উপর। কিলবিল করে বেরুতে লাগল, লম্বা লম্বা সাদা সাদা পোকা। এক একটা হাফ্ ইঞ্চির মত। মা আর দাদাকে ডেকে দেখালাম সেগুলো। অবাক হয়ে থ মেরে দাঁড়িয়ে রইল ওরা। জ্যান্ত মানুষের গায়ে পোকা, ভাবতেও ঘিনঘিন করছে ওদের গা।

সম্বিত ফিরতেই দাদা বললো, "মুছে নিয়ে আরও বার দুয়েক দে। সবগুলো বেরিয়ে যাক।" করলামও তাই, আরও পোকা বেরুতে লাগল অজস্র ধারায়। এক সময় বন্ধ হলো, পা থেকে পোকা বেরুনো। ক্ষতে মলম লাগিয়ে বেঁধে দিলাম। গোপাল মড়ার মত তখনও ঘুমাচ্ছে। রাত দশটার আগে জাগবে বলে মনে হয় না।

সন্ধ্যেবেলা বিশে আর তার বৌ ফুলী, এসেছে মন্দিরের কাজ করতে। মা সন্ধ্যে প্রদীপ জ্বালিয়ে, ধূপবাতি জ্বেলে দিয়ে বসলো আমাদের কাছে। ফুলী জল চড়িয়ে দিল, সকলের চায়ের জন্য। মা আর দাদাকে চোখ মেরে, ওদের শুনিয়ে শুনিয়ে বললাম, "বিশে আর ফুলী, তোরা সকাল বেলায়, দু' ভ্যান নুড়ি কুড়িয়ে এনে; গোপালের সাথে খেয়ে, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বি। বিকালে উঠে লক্ষ্য রাখবি মা-তারা আসে কিনা। বিকালেই মা কালী, পেটাই করবে মা-তারাকে। বড় বাড় বেড়েছে মা তারা-টা!

অন্ধকারের মধ্যে রাস্তা দেখে-বুঝে, সে মার খেয়েও পালাতে পারবে না! কালীতো কালো, অন্ধকারের সংগে মিশে যাবে। তারা তো টুকটুকে ফর্সা, ওকে অন্ধকারেও দেখতে পাওয়া যাবে। ওকে ভরদম পেটাই করতে সুবিধা হবে। গোপালকে বলবি—বনবাদাড় আর, জমির আলের উপর নজর রাখতে; গাছের ডালে ঝুলোনো বোতলটায়, টান পড়লেই বুঝবি—তারা-মা ঘুরঘুর করছে ওখানে।"

মা আর দাদা মুখে, গেরুয়া কাপড় চেপে হাসছে। বিশুতো আমাকে দেখলে, অনেক বড় সাধু বলে ভাবে। ফুলী মোটামুটি সরল সাদাসিধে। বিশু ঠাকুর দেবতার কথা শুনলে, ভয়ে সিঁটিয়ে যায়। যত ভড়কী মারা যায়, ততই সে গুলিয়ে ফেলে সব কিছু। তাছাড়া আমার কথা সে, বেদবাক্যের মত মানে। মা-কালী তারাকে মারতে আসছে—একথা সে ঘুণাক্ষরেও, অবিশ্বাস করতে পারছে না। গোপালকে বিশে চেনে, কিন্তু ফুলী চেনে না। কিন্তু গোপালকে তার খুব ভাল লেগেছে।

সে একটা তবু বন্ধু পেল। গোপালকে সে চোখে চোখে রাখে, বেজায় শাসনও করে। রাত্রি এগারোটার সময় জেগে উঠে, গোপাল বালিশ ঠিকঠাক করতে গিয়ে, দেখতে পেয়েছে ওষুধগুলো। অবাক চোখে তাকিয়ে সে সেগুলো দেখছে। সত্যি তবে

মা-কালী ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছে !

আমি তাকে একটু উসকে দিতে বললাম, "শালা মড়ার মত ঘুমাইছিস? মা-কালী এসে বসে বসে চলে গেল। তোর জন্য ওষুধ এনে রেখে গেছে। দেবরাজ ইন্দ্র পাঠিয়ে দিয়েছে। বাজারের ওষুধ, তোর লাগবেক লাই। শিবের কারখানার ওষুধই, তোর ভালমতো কাজে লাগবেক।"

অমনি করে কেটে যায়, তার দিনগুলো জলকালীতলায়। পায়ে তার শক্ত-পোক্ত ব্যাণ্ডেজ নিয়ে ঘুরে বেড়ায় সে; আশ্রমের চৌহদ্দিতে। বাইরে তা'কে যেতে দেওয়া হয় না। যখন মনটা তার উড়বুড় করে, তখনই পচাই কী মহুয়া খানিকটা, খাইয়ে দেওয়া হয় ওষুধ দিয়ে। ফুলী তাকে চান করিয়ে দেয়, কুঁয়ার জল তুলে। বিশে তাকে কাপড় পরায় গান গাইতে গাইতে, "এস-গ' গন্‌শাম্ কাপড়টো লও ক্যানে, সাজাঞ লাও ক্যানে শরীট্যো!" অর্থাৎ "হে ঘনশ্যাম কাপড় নিয়ে, শরীরটা সাজিয়ে লাও। একটু সাজগোছ করো তুমি ভাই!"

মনের দুঃখ কিন্তু তার একটাই থেকে গেছে যে, সে এখনো কালী-তারার মারাপিটি দেখতে পেল না। বটগাছের ঝোলানো মালের বোতলে, এখনো টান পড়ে নি কেন? বিশু-ফুলী-গোপাল মাঝে মাঝে সেটা পরখ করে, দু'হাতে চোখের উপর কপাল ঢেকে। পালে পালে হনুমানেরা এসে গাছে চড়ে, আর দোলা খায় ডালগুলো। গোপাল ভাবে এই বুঝি মা-তারা এসে গেছে। বিশুকে ডেকে সে বলে, "দ্যাখ ক্যানে বন্দু—তারা আইল বটে?" বিশু বলে, "দেখা পেছিনা গ!"

দু'জনেই বুঝে উঠতে পারে না, যদি তারা না এলো, তবে বোতলে নাড়া মারে কে? একটা হনুমানের বড় লম্বা ল্যাজ, ঝুলছে বোতলের পাশ থেকে। মাঝে মাঝে ওই ডালে বসে থাকা হনুমানটা, বোতলটা ধরে টানাটানি করছে। গোপাল চেঁচাচ্ছে, "অ সাদুবাবা, ত্যুর মালটো খেঞ্যা ফ্যেলাইছে গ'। যা' ক্যানে শালো। তারাখে তাড়াইবার লাগছিস? অ' সাদুবাবা, ইদিক পানে আস ক্যানে! ঢিলাই দাও ক্যানে, জবর কোরাঞ!

মার কাছে বসে দাদা আর আমি, মন্দির সারাবার পরামর্শ করছিলাম। ওদের চেল্লানি শুনে, বাইরে বেরিয়ে সে দেখলাম, অবাক চোখে গাছের উপর দিকে তাকিয়ে আছে বিশু-ফুলী-গোপাল। ওদের দুশ্চিন্তা হচ্ছে যে, হনুমানগুলো যদি বিলাতী মালের বোতলটা নিয়ে পালায়, তবে তো আর মা-তারা ধরা দেবে না!

হাসিটা চেপে বললাম, "শালারা চেঁচাইবার লাগছিস? রামের স্যাঙ্গাৎ আসছে, যুদ্ধ করবার ল্যেগা। ত্যুরা কী রে? দু'হাত জুড়ে পেন্যাম কর্ শালারা।" সঙ্গে সঙ্গে ছ'খানা হাত, মাথায় উঠে গেল প্রণামের ভঙ্গীতে। হুড়মুড় করে সব হনুমানগুলো, পালালো গাছ থেকে নেমে।

আমার উপর তাদের ভক্তি শ্রদ্ধা, বেড়ে গেছে চার গুণ হয়ে। সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছি, বিরাট এক কুরুক্ষেত্র বানিয়ে ফেলেছি। শুধু যা' যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে বাকী। সমস্ত মগজ জুড়ে ওদের, সেই কাল্পনিক যুদ্ধের ছবি ভাসছে। অত্যন্ত সরল আর বোকা এই মানুষগুলোকে, আমরা ঠকিয়ে চলেছি হাজার হাজার বছর ধরে। ধর্ম, গাঁজা, মহুয়া, চোলাই সব মিলিয়ে, পায়ের তলায় দাবিয়ে রেখেছি আমরাই, নিজেদের কাজ বাগিয়ে নেবার জন্য।

এতটুকুও ওদের দুঃখ ব্যথায়, টনটন করে উঠেনি আমাদের মন। গোপালকে সাইকোলজিক্যাল্ ব্যালান্সে (psychological balance) আনতে গেলে, আর তার পা ভাল করে দিতে হলে, এ অভিনয়টুকু আমাকে করতেই হবে। দাদা ফিলজফির ছাত্র হয়ে, সেটা ভালই বুঝেছে। তাই সে গ্রীণ সিগন্যাল্ দিয়ে দিয়েছে আমাকে। ঘরের ভিতর থেকে, বিলাতী মালের বোতল বের করে, তিন জনকে ডাক দিল, **"পেসাদ লিয়ে যা শালারা। মায়ের পেসাদ না লিয়ে কী, মাকে ধরতে পারবি?"**

কোথা থেকে এক-দেড়শ মাটির ভাঁড়, যোগাড় করেছে দাদা—তা' সেইই জানে। ওরা এক এক করে এসে, তিন ভাঁড় করে **মেরে দিল র (raw)** হুইস্কি। এবারে বুঝলাম, দাদা নিজের দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে **সারমন্ (sermon)** ঝাড়বে ওদের। আজ দাদার ছুটি, **মাধুকরীতে** বেরোয়নি।

দাদা মন্দিরে থাকলে গান করে, হারমোনিয়াম বাজিয়ে। গমগমে গলা। কাজী নজরুল সাহেবের খাস চ্যালা। এ'হেন সাধুবাবা **মাতিয়ে রাখে** সারা আশ্রম। আর **জটিঙ্গা পাখীর** মত, যত ভক্ত-শিষ্য আছে, সবাই **ঝাঁপ** দেয়—দাদার ধর্মীয় গ্যাঁড়াকলের **আগুনে**, পকেট খালি করে। ফিরে যায় তারা, **ধুঁয়ার মত উবে যাওয়া আর্শীবাদ** মাথায় নিয়ে, প্রসাদ পেয়ে।

অমাবস্যার দিনে শুধুই, **কারণ-ভোগ** আর কুক্কুটের **মাংস-ভোগ** করে দাদা। সেদিন **আখ-গুড়ের চোলাই**, কলসীকে কলসী আসে। এতটুকু ভেজাল থাকে না তা'তে। কারণ **নিদেন** হেঁকে বসে আছে দাদা আগে থেকে। ''মাকে **ভেজাল** দিলে, বংশে বাতি দিতে আর **কেউ থাকবে না**।'' ভয়ে ভয়ে **চোলাই ভাঁটির মালিক, পাকী-মাল সাপ্লাই করে।**

সবাই আসে একটা করে, তালপাতার চ্যাটাই বগলে করে। গামছায় তাদের বাঁধা থাকে—আলু-মুলো-কলা, কারুর হাতে **মুরগী**, কারুর কোঁচড়ে **মুদীর মশলা**। কেউ আনে তিল কী, সরষের তেলভরা বোতল। মা অন্নপূর্ণার (জলকালীমা-র) ভান্ডার, **ভরে উঠে** ওই দিনগুলোতে। দাদার কাছে **সাঁইথিয়ার** এক রেডিমেড পোশাকের ব্যাপারী, ক'দিন ধরে ঘুরছে একটা **মোক্ষম তাবিজ-কবজের জন্য**। যাতে

করে তার ব্যবসাটা, বেজায় রকম জমে উঠে।

দাদা গুল্ মারবার বুদ্ধিটা এখনো, **স্থির করে উঠতে না পেরে**, আমাকেই দেখিয়ে দিয়েছে যে—আমাকে বেজায় রকম চেপে ধরলে, তার ব্যাপারটার **সুরাহা চিরকালের মত** হয়ে যাবে। সে শালা ঘোষের পো, আমার **পোঁ ধরেছে** হাত কচলাতে কচলাতে। বার কতক তাকে **ল্যাজের ঝটকা মারলেও, তেড়ে দিতে পারিনি** এখনও। সব সময়তো আর খেদিয়ে দেওয়া যায় না!

আমার বদমাসী বুদ্ধির গোড়াটা, উস্কে দিয়ে তাকে বললাম, "শালা, কালীর ব্যাটার কাছে এসেছিস, একদম খালি হাতে? উয়ার মা-বাপ ল্যাংটা থাকে বুলে কী, উয়ারও ল্যাংটা থাকবেক? শালা, কালী শিব কী মন্দিরে থাকে? মান্ষের মাঝে লাই? দেখতে পেছিস না, কাহার-ডোম-বাগদী-দুলের বাচ্চারা, ল্যাংটা ঘুরছে! উয়াদের একখানা করে জামা প্যান্ট দিবি, তবেই মাকে ত্যুর ব্যাপারটা ব্যলবো। যা ভাগ্ শালা, ভোগের আগে দু'ভ্যান মাল এনে, মার পায়ে ফেলবি। ও' গুলান ঠাকুরের বেদীতে, চড়াবি ত্যু লিজেই। বাচ্চাদের দিবি ত্যু, লিজের হাতে বটে। তবেই ত্যুর ব্যবসা চড়চড় করে আকাশে উঠবে। শালা, ফকটে মাকে ধরবার লাগছিস?"

আমার সুমুখ থেকে সে, চোঁ-চোঁ করে দৌড়ে পালালো, আমার **বদরাগী মূর্ত্তি** দেখে। কাঁচা পাকা দাড়িতে, আমাকে **অদ্ভুত রকম বিটকেল সাধু** ঠাউরে, সে পালিয়েছে। বুঝতে পারিনি, সে সত্যি সত্যি ফিরে আসবে, চার-পাঁচ ঘন্টা পরে, **দু' ভ্যান ভর্ত্তি মেয়ে-বাচ্চাদের জামা কাপড় নিয়ে।**

বললাম, "চড়াই দে কেন্যে শালা, উ বেদীটার উপ্যর। হাতজোড় করে বসে থাক্, মার সামনে চোখ্যু মুদে। **ব্যবসা বাড়াই দে মা** বলে পাথনা কর্ ক্যানে!" সমস্ত কাপড়-জামা-প্যান্ট, ভৈরব তলায় চড়িয়ে দিয়ে চোখ বুজে, সে বসে বসে বলতে লাগলো—"ব্যবসা বাড়াই দে ক্যানে!" তাকে আরও একটু উসকে দিতে বললাম "হাঁ কর শালা চোক্ বুজ্যে। মার প্যাসাদ খেঞ্যা জপ কর্ কেন্যে।"

হাঁ করলো সে। আর আমি একটু কটু করে, ঢেলে দিতে লাগলাম, হাফ-লিটার খানিক চোলাই হুইস্কি-রাম-গুলানো মাল তার মুখে। একটু একটু করে সে ঝিমোতে লাগলো, ভৈরবতলায় বসে বসে। জপে চলেছে, **"ব্যবসা বাড়াই দে ক্যানে"** বলে।

দাদা আর মাকে চুপি চুপি বললাম, "আগের বছরের **হোলি খেলার, রং-গুলো** বের করো। পাড়ার যত বাচ্চা আছে, তাদের ডাকো **জামা কাপড় নিতে**। ম্যাচ্লায় রং গুলে, ফুলীকে **মাখিয়ে** দিতে বলো বাচ্চাদের। আর ও' নিজেও **মাখুক**। বিশেকে বলো **ছাই মেখে**, ত্রিশূলের গোড়ায় বসে থাকতে। আর মাঝে মাঝে **"ব্যোম্-ব্যোম্"** বলে **হাঁকাড়** মারতে। আরও খানিকটা করে মাল, **প্রসাদ** বলে ওদের খাইয়ে দাও।"

বলেই আমি দূরের বাঁশ-ঝাড়ের মধ্যে, সেঁদিয়ে গিয়ে বিড়ি ফুঁকতে লাগলাম। মিঠুকে ডেকে চুপিচুপি বললাম, "বাচ্চা-গুলোকে বল্ জোরে জোরে যেন চ্যাঁচায়— "ব্যবসা বাড়াই দে ক্যানে" বলে। দাদা ততক্ষণে ফুলী আর বিশেকে এক গ্লাস করে মাল গিলিয়ে ছেড়েছে। মিঠু দৌড়ে গিয়ে বিশের মাদলটা এনে, বাজাতে শুরু করেছে ভৈরবতলায়। আর ফুলী সেজেছে মা-কালী। সাধু-মা তার গোটা গালে মুখে মাখিয়ে দিয়েছে সিঁদুর। যেন জ্যান্তকালী নড়াচড়া করছে ঘোষের পো-র সামনে।

দূর থেকে আকাশবাণীর মত সুর করে বলতে লাগলাম, "চোখ খোল্ বাপ নিমাই, দ্যাখ জ্যান্ত-কালী আর শিবকে নামিয়ে এনেছে ছোট সাদুবাবা। আর উ শালা গোপাল দিনদুপুরে ঘুমাইছে ক্যানে। এই শালী ফুলী, ডাক্ উয়াকে।" ডাকতে গিয়ে ফুলী টলে পড়লো, পাগলা গোপালের গায়ের উপর। এক ঝটকায় গোপাল জেগে উঠে, বিচিত্র সে মজলিস্ দেখতে পেয়ে, চোখ রগড়াতে লাগল রুদ্ধশ্বাসে।

বাচ্চাগুলো ততক্ষণে চেঁচিয়ে চলেছে "ব্যবসা বাড়াই দে ক্যানে" বলে। আর পাক খাচ্ছে নিমাইয়ের চারপাশে বেদীটাকে ঘিরে। পাড়ার বউ-ঝিরা অভুতপূর্ব দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে, খালি হাতজোড় করে নমস্কার করছে, আর জ্যয় কালী বলে হাঁকাড় মারছে। পঞ্চাশ ষাট জনের গলা, কোরাসে বলছে "জ্যয় কালী!"

এমনি করে ঘুমিয়ে থাকা ওদের, অন্তর্লীন পুরুষকারকে জাগিয়ে দিলাম। সকলের মাঝে থাকা সেই পরম পিতাকে, ধ্যানমগ্ন ঘুমন্ত অবস্থা থেকে টেনে আনলাম ভৈরব তলায়—মিলন মেলায়। নিমাই নেশার ঘোরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, যেন আলাদিনের প্রদীপের ছোঁয়ায়, স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে মা কালী দেবদেবীদের নিয়ে, তার কথা শুনতে আর তার ব্যথা বুঝতে। ছোট সাধুবাবার ক্ষমতা আছে বটে!

ওষুধ খাবার সময় হয়েছে, এখন গোপালের। ছুটে গিয়ে তিন চারটা ট্যাবলেট গুঁড়ো করে, এক গ্লাস মালের সাথে মিশিয়ে ওকে বললাম "পেসাদ খেঞে লে শালা, কালী এসে গেছে। তারাকে ঘাড় ধরে, চুলের মুঠি হাতে পেঁচিয়ে, মারতে মারতে আনছে।" খর চৈত্রের পড়ন্ত দুপুর। কালবৈশাখীর পায়ের নর্ত্তন ঝংকার শুনতে পাচ্ছি, বক্রেশ্বর আর সিউড়ির দিকচক্রবালে। আরও জমাটি ঘোর পাকিয়ে তুলতে জোরে জোরে গলা ফাটিয়ে হাঁকাড় মারলাম, "আয়—আয়—আয় নেমে, আয় মহাকাল মহাকালী, খাঁড়া নিয়ে ত্রিশূল নিয়ে, ধর উ তারাকে, পিটাই কর।

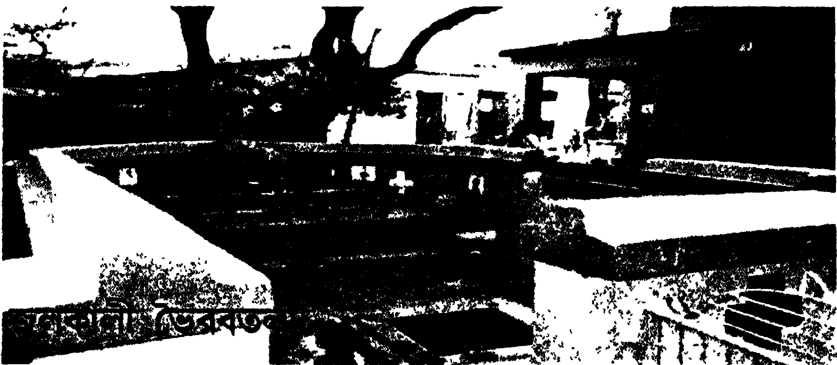
গোপালের পা-টো ভাল করে দে, বাদুড় ভুত—পেঁচো ভুতদেরকে উর চ্যালা করে দে। আরও জোরে বাজা ক্যেনে মাদলটো মিঠু, কালী লাচবেক্। বাজা শালা! নিমাই ঘোষের ব্যবসা বাড়ুক। লাখপতি হোক নিমাই ঘোষ। পাড়ার বউ-ঝিরা জামা কাপড় শাড়ী পাবে, নিমাইয়ের হাত থেকে। আয়—মহাকালী, আয়—আয় শালী, দেরী হঞে যেছে! ত্যু এত আল্‌সে ক্যেনে বটে? তারা পালাঞে যাবেক যে!"

আকাশ দাপিয়ে আসছে, কালবৈশাখীর ঝড়। হেঁকে বললাম—"দেখ্ শালা নিমাই আর গোপাল, ক্যামোন করে লামাই আনছি উয়াদের। থ' মেরে গেছে নিমাই। তার বাকস্ফুর্তি বন্ধ গোপাল চেঁচিয়ে চলেছে, "কারণ খ্যেঞা পিটাইছে গ', ছোট সাদুবাবা, দেখে লাও ক্যানে উ ব্যাপারটো। আমার পা ভাল হঞে যেছে গ—কারণ খ্যেঞা পিটাইছে গ!"

ঝড়ের নর্ত্তন, মাদলের শব্দ, বাচ্চাদের আর মেয়েদের কোরাস, সব মিলিয়ে ভৈরবতলায় হুল্লোড় বেধে গেছে। পাল খানিক হনুমান ঝড়ের আভাস পেয়ে, দৌড়ে উঠোনটা পেরুতে গিয়ে; ঢুকে পড়েছে মানুষের দঙ্গলে। বেরুবার পথ খুঁজে না পেয়ে, চার পাঁচটা জড়িয়ে ধরেছে ফুলীকে আর বিশেকে। গোপাল ব্যাপারটা বুঝে উঠতে না পেরে, হনুমানদেরও ডেকে ডেকে বলছে " দ্যাখ কেন্যে, কারণ-খ্যেঞা পিটাইছে গ"।

আর ফুলী মালের নেশায়, টাল খাচ্ছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তার উপর নূতন মাত্রা, যোগ করেছে হনুমানেরা। সে চ্যাঁচাতে লাগলো, "অ অ সাদুবাবাগো—হ—হ—ন্যু মান্গো!" ফিট হয়ে গেছে সে। বিশের কোলে টাল খেয়ে পড়েছে ফুলী। আর হনুমানের দলও ভয়ে ল্যাজ উঁচিয়ে, পালিয়েছে উর্দ্ধশ্বাসে। গোপালের দিকে, নজর এতক্ষণ পড়েনি। তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, দাদা আর মা হাত জোড় করে; বসে আছে তার সামনের দিকে।

ধ্যানমগ্ন মহাকাল-পরমাত্মার সাথে, মিশে যেন গেছে সে। মুখে তার পরম প্রাপ্তির বিনির্মল হাসি, দুলে উঠছে আলো ছড়িয়ে। আমিও হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম, করজোড়ে তার সামনে। এত বছর ধরে আমি যা করতে পারিনি, গোপাল পৌঁছে গেছে, সে নিত্য আনন্দময় অলকায় অনায়াসে! পাগল ভেবে যাকে অবহেলা করেছি—অবহেলে সে পৌঁছে গেল, মহাকালীর অমৃতভরা বুকে! বুক চাপড়ে কেঁদে উঠলাম, পাগলের মতো, "হে অমৃতময়ী, দেখা দাও —দেখা দা-ও-ও-ও!" পাগল সামলাতে গিয়ে—নিজেই পাগল হয়ে গেলাম।

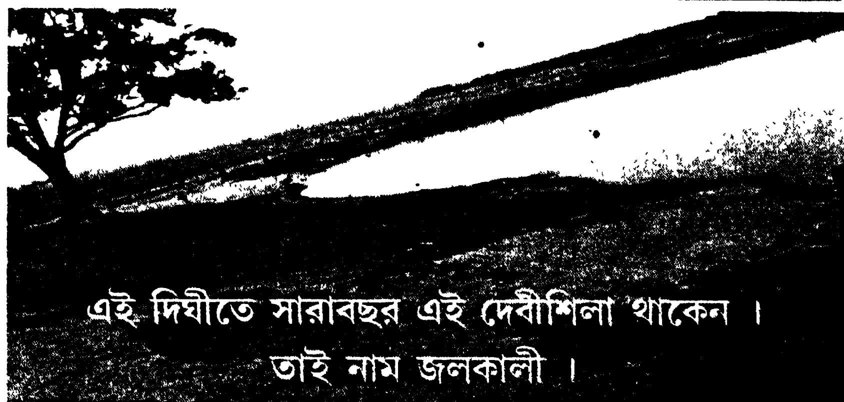




জলকালী দেবীশিলা



জলকালী দেবীশিলা (নীল সংক্রান্তি পুজোর সময়)



এই দিঘীতে সারাবছর এই দেবীশিলা থাকেন।
তাই নাম জলকালী।



স্বর্ণ-কর্ণিকা(সোঁদাল গাছ) । লোককথায় — বাঁদর লাঠি



জলকালীতলার মাঠ

বীরভূমের পথে-প্রান্তরে

তারাপীঠ পর্ব : তারামন্দির : অচেনা বুড়িমা

ভীড় থেকে আমাকে হাত ধরে টেনে আনতে আনতে, **অবাঙ্গালী এক সাধু** আমাকে তারাপীঠে বলেছিল—"বেটা, মাকো কঁহী ভী তু্য, প্রণাম কর সক্‌তা। মন্দির লক্‌হ করকে ভি, তু্য প্রণাম রাখ্ সক্‌তা। সামনে যানা—নজদিক্ যানা, একদম **জরুরী নহী হ্যায়**। দেখলে—দুনিয়াকা **জিৎনা চাহৎ** হ্যায়, বো মিটানেকে লিয়ে করোড়োঁ লোগ, ক্যায়সা শর্ কুট্‌তা! তো ক্যায়া তু্য ইধর খাড়া রহেগা? তব্ তো তেরেকো চার যুগ্ খাড়া রহনা হোগা! **'তু্য সাক্‌সাৎ পর্‌মেশ্বরী, তু্য মেরা প্রণাম স্বীকার কর্ লে মাইয়া, আশীর্বাদ দে'**—এ' বাৎ বোল'নেকে লিয়ে, আধঘণ্টা **সময় চাহিয়ে**? নহী! বো শালা-শালী লোগ্. ভক্তি কী **পরাকাষ্ঠা** দেখাতা হ্যায়'। বুরায়েঁ যো কুছ ইস্ সন্‌সারমে হ্যায়, বো সব কুছ **মাংতা** হ্যায়। **সময় তো লাগেগা হি!**"

এখন আমি আর দাঁড়িয়ে থাকি না, ঠাকুরের কাছে **মাথা কুটবার** জন্য। বরং ভীড় দেখলে, রেডি থাকি **কেটে পড়বার জন্য**। দূরে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বলি—"তোর অনেক ভক্তের ভীড়ে, আমার কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না। ওদের **প্রণাম আর দেখা** যেদিন শেষ হবে, সেদিন তোর **সামনে যাবো**। এখন প্রণাম নে মা **দূর থেকে**।" ভীড় দেখলেই আমি কেটে পড়ি ।

আগের ঘটনা খানিকটা বলি। সালটা তখন ছিল পঁচানব্বই। **মহালয়ার রাত। রমা পাঠিয়েছিল এই প্যামাকে বামার মা শ্যামার কাছে**। ঠিকানা একটা সে দিয়েছিল পরিচিত **পাণ্ডার**। ভক্তকে নাকি মুর্গী বানায় না ওরা। **মুর্গীর আণ্ডার** খোঁজ নাকি করে না, ওর দুই ভাই, **জীবন** ব্যানার্জী আর **সঘন** ব্যানার্জী। তো সেই **রমার (রমা প্রসন্ন সিন্‌হা)** চিঠি নিয়ে, সিংহবিক্রমে ক্রমে ক্রমে হাজির হয়েছিলাম, বামার **(বামাক্ষ্যাপা)** মা শ্যামার **(তারার)** কাছে, সন্ধ্যে পাঁচটার সময়।

রাত হয়েছে বলে, ওই ব্যানার্জীদের খুঁজার **এনার্জী** একদম ছিল না, সারাদিনের গাড়ীর ধকলে। জাঙ্গিয়ায় লুকানো **শ' পাঁচেক টাকা** থাকলেও, রাতের বেলায় নিরাপদ আশ্রয় না খুঁজে, মুখ বুজে পড়েছিলাম **নাটমন্দিরে**; মহালয়ার **রাতের নাটক** দেখবার জন্য। **কেলোরা** সেখানে (তারা মন্দিরে) **হুলোদের সাথে**, কেমন করে **দর কষাকষি** করে, সেটা **চাখবার** জন্য।

অফিসে সই করেই, কেটে পড়েছিলাম সকাল দশটার সময়। রমার চিঠি ছিল এই প্যামার পকেটে। **ফক্‌টে** নাকি বামার মা শ্যামার কাছে থাকা যায়—**খাওয়া-শোওয়াও** যায়। যায় না যা, তা হ'ল—**ফুটানী দেখানো**। ফুটো কাপ্তান্ আমি—**ফুটে** (foot-path) থাকি—**ফুট্ কাটি** কথায় কথায় । আমি ওসব ভিড়-ভাট্টায় থাকি না।

রমাই যখন এই প্যামাকে পাঠিয়েছে, তখন দেখাই যাক না কী ঘটে! প্রায় কোটি খানিক লোকের ভীড় **তারাপীঠে। দেবীশিলা** দেখার ইচ্ছা মাথায় উঠেছে তখন, বিরক্তির চাপে। বসে আছি **নাটমন্দিরের** কোনায়, বাঁ-দিকে **বামাক্ষ্যাপার** মন্দির। কা'কে আর বলি মনের কথাগুলো! **দুটো বিড়ি** ধরিয়ে একটা গুজে দিলাম, বুড়োর সেই দরজার চৌকাঠে। আর একটা টানতে লাগলাম, বুড়োর **দিকে মুখ** করে।

সামনে লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড়ে, তখন হারিয়ে গেছে **তারার মন্দির**। সকলের এত কথা সে বেটী, কী করে **মনে রাখছে** জানি না! বামা-বুড়োকে **টিপনি** কেটে বললাম, "তুমি এখন একটা **ফালতু**। তোমার দিকে আর কেউ **আসছে না**। ভীড় কম থাকলে আমিও কী, তোমার এখানে **বসতাম**? নাও দু'জনে **বিড়ি খাই এসো**। কলকাতার বিড়ি। একটু কড়াই হবে। **কেশো না** যেন আবার। উন্মত্ত **ভক্ত-পাখীরা** উড়ে পালাবে, ভূতের ভয়ে তোমার পা দুটো দাও, **পেন্নাম ঠুকি**।" পেন্নাম মারলাম, তার **চৌকাঠে**।

পুজার খিচুড়ী, ফল-মূল, প্যাঁড়া-প্রসাদ আরও কতকিছু; এই প্যামার **জুটে গেল** বেশ খানিকটা। হোটেলে খেতে হ'ল না, বিশ টাকা খরচ করে। ঝোলার ভেতরের—**ম্যাক্‌ডয়েল হুইস্কির নিব্‌টার** ছিপি খুলে, খানিকটা ঢাললাম বামার চৌকাঠে। আর এই প্যামার দন্তহীন **মুখের দো-কাঠে** ঢাললাম; প্রায় সবটা—একদম **র** (raw)। **কিকিং** (kicking) ভালই হচ্ছে।

রমাপ্রসন্ন সিনহাকে এখন মনে হচ্ছে, পান-খেকো **পান-দোষহীন, জ্যান্ত শ্যামার (তারার) বাচ্চা**। মনে হচ্ছে **বামায় আর রমায়** একটা অদৃশ্য **গাঁটছড়া** আছে। **গাঁটকাটাদের** দলে ওরা নাই। প্রতি অমাবস্যায় পূজা দিয়ে **জীবন ব্যানার্জী**, শুকনো বেলপাতা-ফুল আর সিঁদুর পাঠায় **রমাকে**। ডাকযোগে **ডাক পাড়তে পাড়তে**, সে ফুল-বেলপাতা, কলকাতা হাইকোর্টে এসে **হাই তুলে**। অনেক দূরের পথ কিনা!

এমন এমন যে রমা, প্যামাকে **প্যাঁক দিয়ে** সে পাঠিয়েছিল **তারাপীঠে, এই মহালয়ার পূণ্যলগ্নে**। এখন আমি করি কী! মালের ঘোরে আমি **দেখতে লাগলাম, শুধু তিনটে** মাথাকে। একজনের **ঠোঁট লাল পানে (রমা)**, আর একজনের **মুখলাল রক্তে (শ্যামা—তারা)**, আর একজনের **মুখ ভর্ত্তি সুখ (বামা)**। দুখ নাই তার এতটুকুও। তা' মাকে পেলে, ছা তো খুশী হইই!

মাথার উপর **চার-পাঁচটা মামলা**, হামলা করছে তারা আমার উপর প্রায়

পনের বছর ধরে। ভাবলাম **রমা-বামা-শ্যামা,** **তিন জনেই যখন** দেখা দিয়েছে, এই প্যামা অবশ্যই এবার মামলায় **উৎরোবে!** তো সে যাই হোক, হাজার চেষ্টা করেও তেষ্টা মিটাতে পারলাম না, **সেই দেবীশিলা দেখবার**। যেদিকে তাকাই, দেখি খালি কোটি কোটি লোকের ভিড় আর চেল্লানি। তাই এই প্যামা পড়ে আছে বামার কাছে, শ্যামা মন্দির থেকে বহুদূরে—নাটমন্দিরের কোনায়—দো-টানায়!

রাত্রি তখন প্রায় দু'টো হবে। ঘুমে জড়িয়ে আসছে দু'টো চোখে। সেখানেই অগত্যা শুয়ে পড়লাম। সবে ঘুমটা **আসছে-আসছে করছে** । হঠাৎ পিঠে নাড়া মেরে **এক বুড়িমা** জাগিয়ে দিলো। সেও আমার মত **শুয়েছিল** সেখানে। অনেক ভিখারী কী সন্ন্যাসীর ভীড়ে, কে আর কা'কে **চিনে রাখে!** আমি চিনতাম না তাকে।

"যা' ক্যেনে, **গঁড় কর্‌্যাঁ** আয়—দর্শন করবিক লাই?" বললো **সেই বুড়িমা।** ফ্যালফ্যাল করে তার দিকে তাকিয়ে, কী করবো বুঝে উঠতে **না পেরে,** মন্দিরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম—লক্ষ মানুষের ভীড়টাকে কে যেন, একদম নিমেষে **ফুঁকে দিয়েছে।** আর বুড়িমা কোন কথা বলতে না দিয়ে, হিড় হিড় করে **টেনে নিয়ে গিয়ে,** তুললো সেই গর্ভ-**প্রকোষ্ঠে**। যেখানে বামাক্ষ্যাপার **মা-তারা** সমসীনা **চ্যাপ্টা পাথরের শিলামূর্ত্তিতে।**

বিহ্বলতা আমার তখনো কাটেনি। ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে **টিপে টিপে,** সেই বুড়িমা দেখিয়ে চলেছে, কেমন করে মহাকালকে **দুধ খাওয়াচ্ছে সে জগজ্জননী—মা হয়ে, (মাগ্ হয়ে নয়)**। আবার হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে, এনে বসিয়ে দিল আমাকে; তার চট-বিছানো বিছানার পাশে। ভুলে গেছি প্রণাম করতে, মা-তারাকে। কিন্তু **জ্যান্ত এই** তারার পায়ে, মাথা কুটতে লাগলাম—ব্যামাক্ষ্যাপাকে **সাক্ষী** রেখে। প্রণাম করলাম ওই বামা বুড়োকেও। সন্ধ্যে পাঁচটা থেকে চেষ্টা করে যা পারিনি, গভীর রাতের **সন্ধিক্ষণে দেখে এলাম তাকে, এক মায়ের হাত ধরে আর এক মাকে।**

বিহ্বল হয়ে ভুলে গেছি তারাকে প্রণাম করতে। কিন্তু এই যে মা, যার পাশে আমি বসে আছি, বার বার করে তার পায়ে মাথাটা ঝুঁকে যাচ্ছে। সব আড়ষ্টতা ঝেড়ে ফেলে, জড়িয়ে ধরলাম তার পা দু'টো—ঠাঁই দেমা, জন্ম জন্মান্তরে যেন তোর এই পা দু'টোকে, বিশ্বমাতার পা বলে চিনে নিতে পারি! জয় বুড়ো, প্যামার প্রণাম নাও। ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললাম, বামার সামনে দাঁড়িয়ে, সেই রাতের গভীর নিরালায়।

যে জন্য আমি **তারাপীঠ দর্শনে** গেছলাম, সেখান থেকে ফিরে বুঝতে পারলাম, আমার **প্রণাম আর দর্শন সফল হয়নি—বৃথা গেছে**। ফুলের সাথে পূজার ডালিতে, সে বেটী ভরে দিয়েছে **একরাশ হতাশা**। আবার নামতে হবে **মামলার লড়াইতে**। দুর্ভাগ্যের কড়াইতে, তেল ফুটছে **কল্‌কল্** করে। ভাজবে এপিঠ ওপিঠ, সময়ের **খুন্তি-ঝাঁঝরী** দিয়ে। বিয়ে দেখিয়ে দেবে আমার, বাপের কী চৌদ্দটা **পুরুষের**।

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি দ্বারকার স্রোতখানি বাঁকা



তারাপীঠ মহাশ্মশান



তারাপীঠ মহাশ্মশান



বীরভূমের পথে-প্রান্তরে

তারাপীঠের মায়া মা : ব্যানার্জী-ভাইরা

ভুতে টানছে যেন আমাকে সন্ধ্যার অন্ধকারে। প্রতিদিনের চলার পথ কেমন করে মানুষ **ভুলে যায়?** অমরকন্টকের পুলিশেরা, আমাকে নর্মদা মন্দিরের গেটে ছেড়ে দেবার পর, প্রতিদিনের মত আমি **বাঁয়ে বেঁকে চলেছি, মার্কণ্ডেয় আশ্রমের** দিকে। নর্মদা মন্দির থেকে, মার্কণ্ডেয় মন্দিরে যেতে খুব বেশী হলে, পনেরো-কুড়ি মিনিট সময় লাগতে পারে। কিন্তু যতই এগুচ্ছি, রাস্তা আর **শেষ হচ্ছে না**। বাড়ছেই সেটা, একটু একটু করে। মাঝে মাঝে নিজের দু'গালে দু'টো **পেল্লায় থাপ্পড় মেরে, সম্বিত ফেরাতে** চাইলাম নিজের।

ভুতে আমি বিশ্বাস করলেও, **ভয় পাই না** কোনদিন। আমার মতে, ভূতেরা হ'ল—**শুয়োরের বাচ্চা গোলা-পাবলিক**, যাদের জন্মের আর **বাপের ঠিক** নাই। যখন যা'কে পারে, ঠ্যাকায় পড়ে **বাপ বলে**। আর আমি আমার আট দশটা **বাপের বাচ্চা হয়ে**, শুয়োরের বাচ্চা ভূতকে কেন ভয় পাবো? আমার ছ' জন বাপের নাম বলেছি, প্রথম আর দ্বিতীয় খন্ডে, বাকী-চারজনের নাম বলবো, শেষ **দশম খন্ডে**। এখন একটু **সাস্‌পেন্সে** থাকুন ভাই।

তো এতগুলো **সাচ্চা বাপের ব্যাটা** হয়ে, আমি ভয় পাবো—ভূতকে? আমি বরং মানুষকে **(দুই হাত-পা-ওলা জন্তুকে)**, যমের চেয়েও **বেশী ভয় পাই**; সত্যিকারের ভয় যাকে বলে। অমরকন্টকের ভালুক-বাঁদর-সাপ আমাকে **এক পয়সা ভয় পাওয়ালে**, আমি বুঝি—বাকী নিরানব্বুই পয়সা ডরাবার সব ব্যবস্থা, **পুলিশের-কোর্টের-পঞ্চায়েতের** কাছে আছে। আর তাদের ল্যাংবোটগুলো, আমেরিকান প্রেসিডেন্ট, কী লাদেনের মত, **ক্ষমতার অধিকারী**। স্বয়ং ভগবানেও ভয় পায় **ওদের**—আমি তো **কোন ছার**।

বিন্ধ্যাপর্বতে মালের (wine) ব্যবস্থা থাকলেও, পরিক্রমাবাসীদের মাল খেতে নাই। তা'ছাড়া মাল খেতে গেলে, আগেই কড়কড়ে **মাল ছাড়তে হয়** মালিকের পদতলে। তাছাড়া মালিকও বুঝে নেয় যে, **মাল খাবার মত মাল আমি কিনা**—তাল ঠিক রাখতে পারি কিনা! বাল্ সুলভ বে-আক্কেলীতে গেলে, অনেক **আক্কেল সালামী**

দিতে হয়। তো এমত অবস্থায় মাল না খেয়েও, **মালখোরের মত** যতই হাঁটছি, রাস্তা ততই **বেড়ে যাচ্ছে**। কোনদিকে যে যাচ্ছি, **বুঝতে পারছি না**।

ছোটবেলায় ওই রকমই একটা, বেড়ে **মজাদার গল্প** শুনেছিলাম আমার জন্মদাতা বাবার মুখে। প্রতি বছরই **বর্ষাকালে বাবা যেত ইলিশ মাছ ধরতে**। এক সপ্তাহ পরে বাড়ী ফিরতো **হাজীপুর থেকে**। ওই হাজীপুর এখনকার **ডায়মন্ড হারবার**। এখনকার মত তখন **ভুটভুটি** কী লঞ্চ ছিল না।

তো সে যাই হোক, একবার **বাড়ী ফেরার** দিনে, সব মাঝিমাল্লা **তেঁতুলবেড়িয়া-ঘাটে** নৌকা ভিড়িয়ে, কানাকড়িও হিসাবপত্র করে, সন্ধ্যার মুখে **দুটো করে, ইলিশ মাছ** নিয়ে ফিরছিল। সবাই প্রচলিত রাস্তায় চলে, বাবা চলতো **ঠিক উল্টো রাস্তায়**। সোজা মাঠ ভেঙ্গে, বাড়ী পৌঁছবার **ইচ্ছা ছিল তার**। অচেনা জায়গা নয়, নিজের গ্রামেরই মাঠ ঘাট, বাবার থেকে **কেউ বেশী চিনতো না**। সাড়ে **চারফুটী শরীরটায়** তার, সাড়ে চার মাইল **লম্বা সাহস ছিল**।

তো ওই অসম সাহসী লোকটাকে **ভূতে ঘুরিয়ে ছিল**, বলতে গেলে প্রায় সারারাত। একটা **ইলিশ মাছ** দিয়ে, তবে **ছাড়ান পেয়েছিল** আমার বাবা। তা'ও আবার পেচ্ছাব করে, নিজের গায়ে ছড়িয়ে। ভূতে ধরলে পেচ্ছাব করে, নিজের গায়ে নাকি **ছড়াতে** হয়। তবেই ভূত **অদ্ভুতভাবে, কুৎকুতে চোখ নিয়ে** পালায়। ভূতেদের **স্যানিটেশন্ জ্ঞান** খুব সাংঘাতিক বলে শুনি!

ভোরবেলায় বাড়ী ফিরে **গালে, হাত দিয়ে** বসে আছে বাবা। কেন না তার দু'টো **ঢাউস ইলিশের**, একটাকে ভাগ দিতে হয়েছে ভূতকে। শুয়োরের বাচ্চার **মত** একপাল গুলগুলে বাচ্চাকে, আটাঘাঁটার সাথে কী করে একটা ইলিশ ভাগ করে দেওয়া যাবে? নিদেনপক্ষে দুটো চাই। সারা সপ্তাহের মোট রোজগার সাত-সিকি (১.৭৫ পঃ) আর একটা ইলিশ মা'র হাতে তুলে দিয়ে, বাবা বসে আছে **গালে হাত দিয়ে**। বেজায় **চিন্তায় গ্রাস করেছে** বাবাকে তখন।

কল্‌কেয় আগুন চড়িয়ে **হুঁকোটা বাড়িয়ে দিয়ে**, ব্যাপারটা জানতে চাইলো আমার মা। ভূতের ইলিশ নেওয়াটা, **মা অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করে**। মেছো পেত্নীরা নাকি ও'রকম করে, খাল পাড়ের **বাবলাতলায় কী বাজ-বরণ** গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। বাবা পড়েছিল, সেই রকম এক **মেছো পেত্নীর** পাল্লায়। দু'টো ইলিশের একটাকে সে **গেঁড়িয়ে** দিয়েছিল, সেদিন মাল না খাওয়া, আমার মালখোর বাবা শ্রী সারদাচরণের কাছ থেকে।

সেদিনের নির্দোষ পিতাকে, আমার ব্যারিষ্টার মা অবিশ্বাস করেনি। হাতে কড়কড়ে (ঝন ঝনাৎ) এক টাকা বারো আনা, আর একটা আস্ত ইলিশ পেয়ে, কুত্তার

মত অসম্ভব ঘ্রাণশক্তিও'লা দু'টো নাক দিয়ে বাবাকে শুঁকে,

মা বেরিয়ে গেছলো, মুগুরটা হাতে নিয়ে, মেছো পেত্নীকে শিক্ষা দিতে ইন্ডিয়ান পেনাল্ কোড্। মার ওই নির্দোষ হাজব্যান্ডের সাথে গেছোমী, মা একদম সহ্য-পছন্দ করে উঠতে পারেনি।;

গুছিয়ে মুগুর-ঠ্যাঙানী দিয়ে, সেই দশাশাই চেহারার ইলিশটাকে ফিরিয়ে এনেছিল, আমার ব্যারিষ্টার মা। সেটা নাকি ছেঁড়া গামছায় বাঁধা হয়ে, ঝুলছিল বাজবরণ গাছের ডালে, উসমান শেখের কবরের পাশে খালপাড়ে। ওই খালটা বাবা পার হয়েছিল অন্ততঃ এক দেড়শ বার, আড়াআড়ি! বাড়াবাড়ি কথা, আমি আমার বাবাকে কোনদিনও বলতে শুনিনি। মিথ্যার পাশ দিয়ে হাঁটতো না লোকটা কখনো।

মিথ্যা বলেনি তারাপীঠের মায়া-মাও। এখন বলবো সে কাহিনী পুরোপুরি। গল্পে কত যে মিথ্যা থাকে, বুঝা বড় মুসকিল। মহালয়ার রাতে যে ভিখারি সাধুমা আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে তারা-কে দেখিয়েছিল, ভোরবেলায় ঠ্যালা মেরে সেইই আবার জাগিয়ে দিয়েছিল, দ্বারকায় চান করতে—রাত আর দিনের সন্ধিক্ষণে। তাকে ঠিকমত ধরতে পারলে, ব্যাপারগুলো মিটে যেত—কিন্তু ধরতে পারিনি!

কী হবে আর কী হবে না, সেটা ভাববার ফুরসুৎ আমার ছিল না। মা বলেছে, তাই চানটা জরুরী। বামাকে বললাম, "এই প্যামা চান করতে যাচ্ছে। ব্যাগটা রইলো তোমার জিম্মায়। কেউ ঝেড়ে দিলে, তুমি তো ঝাড় খাবেই, রমাও ছাড়া পাবে না। আমি ছোট জাতের বাচ্চা— ছোটলোকেমী করতে আমার বাধে না। তুমি যেমন ছরছর্ করে, শ্যামার (তারার) মুখে মুতে ছিলে, আমি কিন্তু দু'জনের মুখে আগে মুতবো— আর তা হ'ল তুমি আর তোমার ওই মা—আর বাকীটা আমার নিজের মুখে।

শিবাম্বু পান করার মত, ডাইরেক্ট সাকশান্ এন্ড ডেলিভারী, ঠিক সেই ব্লাড্-ডোনেশানের মত। কালকে রাতে বিলাতী মাল খাইয়েছি, আজকেও তোমাকে দু' পেগ্ দেবো। বুঝলে কিনা? তারার ভক্ত রমার রেফারেন্স আমার আছে। সেই চোথাটা আছে—তুমি দেখতে পারো। রমা তোমাকে অবশ্য লিখেনি, লিখেছে ওই ব্যানার্জী-ভাইদের। তা' হোক, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে, গুল্ মারতে আসিনি। আমার ব্যাগটা একটু সামলাও, মাইরি। এই তিনটা ডুব দেবো আর আসবো! আসবার পথে বিলাতী মাল আনবোই, কথা দিচ্চি!"

ধাক্কা মেরে সেই ভিখারী সাধুমা বললো, "অত কী বিড় বিড় কোর্য়া বকছিস, কোঁকা? যা'ক্যানে ফস্যা হয়্যা যেছে! সুয্যু উঠ্যা য়াবেক্। লগন্ পালাইব্যাক্—যা ক্যানে!" সাধুমার সেই অতি তাড়ায়, ব্যাগটা ফেলে দিয়ে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চললাম দ্বারকায়, নিজেকে রাত্ আর দিনের সন্ধিক্ষণে চুবিয়ে নিতে। ধুয়ে ফেলতে

আমার পরাজয়ের গ্লানি। ভিখারীর বাচ্চা থেকে, রাজার বাচ্চা হবার লোভে। **সন্ধিক্ষণের স্নানের পেছনে এই ছিল আমার অভিসন্ধি।**

সন্ধি হয়নি এতটুকুও, **দুর্ভাগ্য আর সৌভাগ্যের**। অভাগা এই প্যামার কপালটা যেন, **ভাগা দিয়ে দিয়ে** রাখা আছে। কালে নিচ্ছে একভাগ, **মহাকালে নিচ্ছে** আর এক ভাগ। শেষ **ভাগটা নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়েছে, ভূতে আর অদ্ভুতে (পাগুয়ায়)**। চুলোয় যাক্ শালা, যে নেবে—আমি হয়ে যাবো তার।

সামনের একটা মুদি দোকানে, হাত পাতলাম **একটু তেলের** জন্য। যদিও সেটা মুদি দোকান নয়, খাবারের দোকান। আমার হাতপাতা দেখে, জিজ্ঞাসু বৃদ্ধ মালিক বললো, "কী চাই **বাবা** আপনার? বলুন, কী সেবা করতে পারি?"

—— " একটু তেল দেবেন—চান করবো?"

—— "ব্যস, ওই-টুকুই? আর কিছু?"

—— "না, আর কিছু চাই না।"

নিঃশব্দে তেল ঢেলে দিতে দিতে সে বললো, "বাবা, আপনার বাড়ী কোথায়? আপনাকে তো এই প্রথম দেখছি। এখানে আপনি কোথায় উঠেছেন?"

—— "কোথাও উঠিনি, **নাটমন্দিরেই** আছি। আমিতো থাকি না এখানে, পূজা দিই আর চলে যাই **দুবরাজপুর**। সেখানেই থাকি **জলকালী মন্দিরে**, এক মাস, দু'মাস—যতদিন ভাল লাগে, থাকতে পারি।"

—— "আমার বাড়ী তো দুবরাজপুর বাজারে। বাসষ্ট্যান্ডের মোড়ে তো, আমাদের একটা তেলে-ভাজার দোকানও আছে। আপনার নাম কী বাবা?"

—— **"ডাক্তার প্রেমানন্দ প্রামানিক**, দীক্ষা-নাম— **সোমানন্দ অবধূত।"**

দড়াম করে সে পড়লো আমার পায়ে। রাত্রি শেষ হয়, দিবসের আনাগোনার আভাস পূবাকাশে। **উষা** আসছে সব **উষরতা ঘুচিয়ে দিতে**, তার অরুণ ছোঁয়ায়— সাফল্যে ভরে দিতে সমস্ত চরাচর। বুকে তুলে নিলাম সে বৃদ্ধকে। হাড়-বেহদ্দ আর **হাফ-বৃদ্ধ পাজীর-পা-ঝাড়া আমি**, কাঁচাপাকা দাড়িতে **চুলকাতে চুলকাতে মনে মনে বললাম, "আমি জানি না তুমি কে? আমি জানি না, তুমি কেন আমাকে প্রণাম করছো? তবু এ'ও বুঝতে আমার অসুবিধা হচ্ছে না কী, আমি হয়তো কোন দিন তোমার দুঃখ-কষ্টের অংশ, ভাগ করে নিয়েছিলাম।"**

"মনে নাই—স্মরণে আনতে পারছি না সে কথা; তবুও হে বন্ধু, তোমার প্রণাম

আমি কুড়িয়ে নিয়ে, জমা দিয়ে দিচ্ছি দুবরাজপুরের **জলকালীর খাতায়**, আর এই **তারার খাতায়**। ওটা আমার প্রাপ্য নয় যে! সন্তান যা' কিছু পায়, মায়ের কাছে তাকে সবটাই যে, **জমা দিতে হয়। কষ্ট পেলে সে মাকে বলে, ঘৃণা-দুখঃ-অবহেলা পেলে সে মাকে বলে। ভিক্ষা পেলে—সেই ভিক্ষার অন্নও তো মায়ের হাতেই তুলে দেয়। তোমার প্রণাম আর শ্রদ্ধা, আমি পৌঁছে দিলাম মা-র কাছে!"**

এগিয়ে চললাম দ্বারকার ঘাটে। কেউ নাই সে ঘাটে। আমি শুধু একা। রাত তখন তিনটা হবে। নামবার মুখে প্রায় হোঁচট খেলাম। প্রায় **ছ' ফুট লম্বা এক বর্ষীয়সী মহিলাকে দেখে! সম্পূর্ণ উলঙ্গ সে মেয়ে, মাথার পাকাচুল ছড়িয়ে দিয়ে, বসে আছে পাথরের চাঁইগুলোর উপর**। পাশে সরে গিয়ে বললো, "সাবধানে নাম খোকা, দূরে যাস্ না, দ্বারকাকে তুই চিনিস না—আমি চিনি আজ **একশ' বত্রিশ বছর ধরে**।

বামা তখন ছিল বছর তিরিশের যুবক। বামা গেছে, আমি আছি। তোর নাম কীরে? প্যামা? হ্যাঁরে, নাটমন্দিরে কেউ তোকে **কিছু বলেছে**? শ্যামার মন্দির থাকতে, অন্য কোথাও থাকবার ইচ্ছা **কেন হয় তোর**? সে কী তোকে **দেখবে না**? কোথাও যেতে চাইলে নিশ্চয়ই যাবি, কিন্তু **শ্যামাকে-বামাকে ছেড়ে নয়**। যা চান কর। সকালে আমার **ঝোপড়ায় যাস্, আমি মায়া-মা**।

চলে গেল সে বেটী। আস্তে আস্তে নেমে পড়লাম দ্বারকায়। কার্ত্তিকের জলভরা দ্বারকায়, তখন **উথাল স্রোত** বয়ে চলেছে। অনেক যুগের **সাক্ষী সে নদ**। ধৃষ্টতা দেখাতে পারলাম না, কারণ বারণ করেছে **মায়া-মা**। চান করে উঠে, বসে পড়লাম পাশের একটা গাছের গোড়ায়। জানতাম না **সেটা কী গাছ**। হঠাৎ মনে হ'ল এত সকালে মন্দির ফাঁকা, খুব সহজে সুন্দর করে **পূজা দিতে পারবো**—ভিড়ের ঠ্যালায় হারিয়ে যেতে হবে না! এস্তপদে হাঁটতে লাগলাম মন্দিরের দিকে।

মূল মন্দিরের বাঁ-কোনায়, একটা **ধূপ-ফুল-প্যাঁড়ার দোকানের**, সামনে এসে দাঁড়াতেই—কোন **কিছু না** বলে, সে পান্ডা ধরিয়ে দিল, শালপাতার ঝুড়িতে কয়টা প্যাঁড়া আর জবাফুল দিয়ে **নৈবেদ্য**! পয়সা কড়ির কোন প্রশ্ন না তুলে, সে অতি দ্রুত ঢুকে গেল আমাকে নিয়ে **সে বেটী তারার গর্ভগৃহে**।

পূজা শেষ করে বেরিয়ে এসে, সেই ঝুড়িতেই ভরে দিলো; আরও প্রায় **দু' তিনশ' গ্রাম প্যাঁড়া**, আর শালপাতায় করে **খানিকটা সিঁদুর**। তারপর সেটাকে, একটা প্লাসটিকের ক্যারিব্যাগে ঢুকিয়ে, আমার হাতে ধরিয়ে দিল। একটা কুড়ি টাকার নোট, বের করে দিতে যেতেই, পকেট থেকে পড়ে গেল—রমা-দা'র **সেই চিঠিটা**। চিঠিটা কুড়িয়ে আমার হাতে দিতে গিয়েই, সে লোকটা দেখে যে, **চিঠিটা তাকেই লেখা**!

হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে, সে পড়তে লাগলো সেই চিঠিটা। পড়ার পর, সে ফিরিয়ে দিতে চাইলো টাকাগুলো। আমি বললাম, "তীর্থ করলে, তীর্থের বাহনদেরকে বঞ্চিত করতে নাই। ওটা আপনি রেখে দিন। আপনার আমার মুখ দিয়েই, মা মন্ত্র বলে, প্রসাদ খায়। আপনার আমার হাত দিয়েই, সে বেটী পূজা নেয় কী দেওয়ায়। টাকাটা মাকেই দিলাম।"

—— "আমিই জীবন ব্যানার্জী। পাশেই আমার বাড়ী। আপনার থাকার আর প্রসাদ পাবার ব্যবস্থা সবই করবো। এখন বলুন কোথায় যাবেন? এখানে সবাই যাত্রী আর ভক্তদেরকে ছেঁকে ধরে, দু' পয়সা কামাবার জন্য। সাবধানে থাকবেন। যান, এদিক ওদিক ঘুরে আসুন।"

সকাল হচ্ছে, হেমন্তের পাতলা কুয়াশা ভেদ করে। বামার সেই মন্দিরের কাছে গিয়ে দেখি, সেখানে তেমনিই পড়ে আছে—আমার হাফ-ছেঁড়া সাইড-ব্যাগটা। বুড়ি সাধুমা তার সেই চটের বিছানা গুটিয়ে, কোথায় চলে গেছে কে জানে! হতাশ হলাম, ওকে খানিকটা প্রসাদ দিতে না পেরে। ভাবলাম ফিরে যাই আবার দ্বারকার পাড়ে। বসে থাকি সেই গাছটার গোড়ায়। সূর্য্য উঠলে যাবো মায়া-মার সাথে দেখা করতে।

তাই করলাম, ফিরে গেলাম দ্বারকার সেই, নুড়ি পাথর ফেলা অস্থায়ী ঘাটে। আশে পাশে কেউ নাই, বসলাম আবার সেই গাছটায় হেলান দিয়ে। বিড়ি টানতে টানতে ঘুম আসতে লাগলো। তন্দ্রার ঘোরে দেখছি, একটা পাহাড়ের বুকে একটা ছোট্ট ডোবার মত জায়গায় জল যেন ফুটছে। কাকচক্ষু পরিষ্কার জল। অত্যন্ত সুস্বাদু আর ঠান্ডা।

সেই ডোবাটার তিন পাশে প্রায় পঁচিশ তিরিশটা মন্দির। ভেতরের অধিষ্ঠিত দেব-দেবীকে, বুঝতে পারলাম না যে ওঁরা কা'রা; বার বার করে যেন ফ্ল্যাস-ব্যাকে কেউ যেন দেখিয়ে চলেছে, সে পর্বত আর নদীকে। চারদিকে তার ঘন অরণ্য। মনে হল, স্বপ্ন কত কথাই তো বলে—ও' নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নাই। তবুও আলস্য ভরে চোখ বুজে রইলাম, সেই গাছটার গোড়ায়। বার বার করে সেই একই ছবি ভেসে উঠছে।

সূর্য্য বেশ কিছুটা উঠে গেলে, ভাবলাম একবার মায়া-মার সাথে দেখা করা দরকার। জীবনবাবুকে জিজ্ঞেস করে, জানতে পারলাম তাঁর ঝোপড়ার ঠিকানা। গেলাম সেখানে, দেখা করতে তার সাথে। একটা অতি প্রাচীন মাটির ভাঁড়ে ফুটছে তার আলো-চাল, ডাল, বুনো কচু আর কুড়ানো পুঁই পাতা। তিনটে পাথরের টুকরোয় তৈরী হয়েছে উনুন। জ্বালানী হয়েছে ছেঁড়া কাগজ আর ফেলে দেওয়া শালপাতার ঠোঙ্গা।

আমি যেতেই ইঙ্গিতে বসতে বললো মায়া-মা। মন দিয়ে সে তখন রান্নায়

ব্যস্ত। বেশ কিছুক্ষণ পরে বললো, "সব কিছু অবিশ্বাস করিস কেন? সবটা স্বপ্ন হয় কী করে? সে ভাবলে তো, সব দুনিয়াটাই একটা গোল পাকানো স্বপ্ন। মহালয়ার পূণ্যলগ্নে যা' দেখলি, সেটা বিস্ময় হতে পারে, মিথ্যা নয়। শ্মশানের পাশে দ্বারকার পাড়ে, যে গাছটার গোড়ায় বসেছিলি, সেখানে ভূতের ভয়ে কেউ বসে না।

ওটা মহা পবিত্র গাছ। নাম তমাল্। সবাই নামটা জানেও না। আমিও ওখানে বসলে, সে স্বপ্ন দেখায়। বহু তীর্থের বহু স্বপ্ন—বহু জন্মের ওপারের ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারে। তমাল, দামাল হয়ে এগিয়ে যাবার কথা বলে। যা' এগিয়ে যা'—যা' দেখলি সে অতি পবিত্রা এক নদীর ছবি—নাম তার নর্মদা। তোর যাবার ডাক খুব শিগ্গির আসবে, যা' ঘুরে আয়। অতি পবিত্রভূমি, বিন্ধ্যাপর্বতের মাথায়!"

তারপর গরম হাঁড়িটা নিয়ে দু'হাতে উঁচু করে ধরে, কা'কে যেন বলতে লাগলো মায়া-মা, "আয়, খেয়ে যা।" চোখ তার নিবদ্ধ তারা-মন্দিরের চূড়ার দিকে। বিরাট ঘন্টায় তখন বেজে চলেছে ঢং ঢং। মাটিতে নামিয়ে রাখলো হাঁড়িটা মায়া-মা। তারপর বললো, যাবার আগে নগেন বাবার সমাধিটায় প্রণাম করবি।

একদিকে ট্রেনের তাড়া, অন্যদিকে মনের তাড়া। সবকিছু মিলিয়ে, যাওয়া আর হয়ে উঠেনি, নগেন বাবার উঠোনে। রমা-দা পাঠিয়েছিল নিতান্ত সামান্য কারণে, সেখানে থাকার সুবিধার জন্য। কিন্তু সে বা আমি বুঝিনি— কোন্ ভাবী ঘটনার বীজ তা'তে লুকিয়ে ছিল। পাঁচ বছর পরে, নর্মদাতীর্থে যাবার জন্য যার; অঙ্কুরোদগম হয়েছিল। নর্মদা-তীর্থে যাবার এটাও একটা ইতিহাস।

নিজেকে পেঁচো-ভূত বলে মনে হলেও, অদ্ভুত অনেক ঘটনা আছে—যা' জীবনের মোড় ফিরিয়ে দেয় মোচড় মেরে। রমা-বামা-শ্যামা-প্যামা, চারমূর্ত্তি হলেও, একই তার যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন তার ওরা, তারার হাতের। রক্তমাখা মুখে, মরা মানুষের মুড়ো চিবোতে চিবোতে, যখন সে প্রলয়ের সুর তুলে—ওই তারের যন্ত্রে, তখন ভয়ে দূরে না পালিয়ে, তার সুরের সাথে সুর মিলিয়ে বলতে হয়—"ওঁ ঐং তারে হুং ফট্ স্বাহা"।

রক্তমাখা মুখ বদলে যাবে, পান-খেকো মুখে। হাসি ছলকে উঠবে সেখানে। বিনির্মল কল্যানীরূপে হাত বাড়িয়ে, ডেকে নেবে কোলে। শিবও ঠ্যাকায় পড়ে চেঁচাচ্ছিল বলে, বেয়াড়া সে চেল্লানি বন্ধ করতে, মুখে গুঁজে দিয়েছিল তার মাই, মা হয়ে। ডুগডুগিটা বাজিয়ে ঘুম পাড়াতে গিয়ে, সে দুগ্গা দ্যাখে যে, সেটা বলেই চলেছে— "কণ্ঠের বিষকে অমৃত বদলে দাও শিবানী, ভুল করে লোভে পড়ে, রমা-বামা-প্যামা খেয়ে ফেলবে; যন্ত্রণায় কাতরাবে, সে হবে আর এক জ্বালা! তোমার সংসার পুড়ে ছাই হবে। দেরী কোরো না, আলসেমী কোরো না!"

না সে বদলে দেয়নি বিষকে অমৃতে। পরে করবো বলে, ফেলে রেখে দিয়েছিল।

লোভী সন্তানেরা, মাকে লুকিয়ে লুকিয়ে, একটু একটু করে চাখতে গিয়ে চেল্লাচ্ছে— "বাঁচাও, জ্বলে গেল, জ্বলে গেল। জলে গেল জীবনটা।"

জীবন ব্যানার্জী, এনার্জী যোগাতে, খালি ক'টা প্যাঁড়া আর জবাফুল দিয়েছিল, এই প্যামাকে। শ্যামা তেমনই চুপচাপ থেকে গেছে, গালে হাত দিয়ে। হতেই হয় তাকে ও'রকম, বে-হাত হ'বার ভয়ে। সাধুরা শ্যামা-বামাকে যতটা ভালবাসে, তার চেয়ে অনেক বেশী ভালবাসে, কদর করে কেলোরা। কারণ লংকা পেতে, কী মার কাটারী লংকাকান্ড বাধাতে কোলোরা ওস্তাদ।

সাধুদের গাঁড়ে কাপড় নাই, নাই তার মা শ্যামারও। তবুও লরী কে লরী শাড়ী জমা পড়ে, বিশ-লাখী প্যান্ডেলে। স্ক্যান্ডাল আর ক্যাচাল বেধেই যায়, হিস্যা (ভাগ) করবার বেলায়। পার্টির রং ঠিক করা হয়, যারা পাবে ওগুলো তাদের! তাই সত্যিকারের এক নম্বর ভূতেরা ভাবে, কা'রা সত্যিকারের ভূত? ব্যাপারটা তো অদ্ভুত!

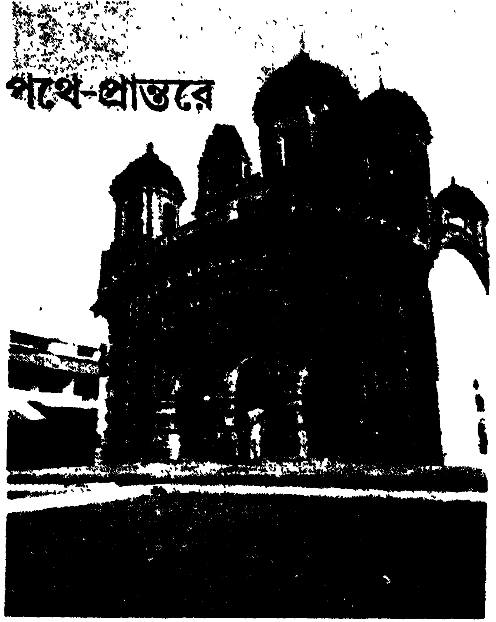




মুণ্ডমালিনীতলা মহাশ্মশান (তারাপীঠ)

মুণ্ডমালিনীতলা মহাশ্মশান (তারাপীঠ)

বীরভূমের পথে-প্রান্তরে



কেঁদুলির আঙিনায়

*"পদ্মা-পয়োধর-তটীপরিরম্ভ-লগ্ন-
কাশ্মীর-মুদ্রিতমুরো মধুসূদনস্য।
ব্যক্তানুরাগমিব খেলদনঙ্গ-খেদ-
স্বেদাম্বুপূরমনুপূরয়তু প্রিয়ং বঃ।।"*

(১ম সর্গ / ২য় সন্দর্ভ) ....শ্রীগীতগোবিন্দম্

অন্বয় : পদ্মা (লক্ষ্ম্যা—Lakshmi), / পয়োধর-তটী (স্তনপরিসরঃ—Valley of breasts) / পরিরম্ভ = পরিরম্ভনেন = আলিঙ্গনেন, মর্দনেন (Embracing & molestation)। লগ্নং = যৎ কুঙ্কুমেন মুদ্রিতং (with the saffron-touch), / ব্যক্তম্ = (স্পষ্টীকৃতম্) + অনুরাগম্ + ইব = অনুরাগ রঞ্জিতম্ (Identified with eternal love and stained)। খেলদনঙ্গ-খেদ-স্বেদাম্বুপূরম্ = রমণকর্মহেতু ঘর্ম-প্রবাহম্ (Sweating for exertion of focking)। মধুসূদনস্য = কৃষ্ণস্য (of Srikrishna)। উরঃ = (বক্ষঃ—Chest)। বঃ = যুষ্মাকম্ (of ours / us)। প্রিয়ম্ অনুপূরয়তু = প্রিয়-বাসনা সমুহম্ পূর্ণম্ করোতু = বিদধাতু (All fine desires may be fulfilled)।

বাংলা মানে ঃ— "আলিঙ্গন আর মর্দনে রমণকালে রাধার (লক্ষ্মীর) যে স্তনদ্বয় কুঙ্কুমরাগান্বিত হয়ে, শ্রীকৃষ্ণের বুকে এঁকে দিয়েছে অনুরাগ-লেখা, রমণজনিত অবসাদগ্রস্থ ঘর্মাক্ত সেই শ্রীকৃষ্ণ-বুকে; তোমাদের বাসনা ছায়া ফেলুক, পূর্ণ হোক তোমাদের সকল প্রিয় চাওয়া।" ....(শ্রীজয়দেব গোস্বামী—আশীর্বচন)

(For exotic embrace, and molestation of breasts of Sri Radha (Lakshmi), while coitious play was on with Srikrishna, it touched and drew saffron symbols of wanton love, on the chest of SriHari. And you people–be at rest there. On his tired and sweated breast, may your desires all be fulfilled.)

একলাই বসে ছিলাম, কদম্বখণ্ডীর ঘাটের বস্তিটার শেষে, অজয়ের শুকনো বুকের বালির দিকে চেয়ে। আমার একলা থাকতে ভালো লাগে। তখন আমি কথা বলি, আমার 'আমি'র সাথে। সে 'আমিটা' কে ? বলে নিই — সে 'আমি' টা — (১) একটা **প্রাক্তন ভিখারী**, (২) ছেচল্লিশ বছর আগের, ঘর পালানো **একটা ছোঁড়া**, (৩) যৌনকর্মী পাড়ার এক **প্রাক্তন চাকর**, (৪) এক **অসফল স্বামী আর** দুই সন্তানের **পিতা**, (৫) হাইকোর্টের **ফুঁকো কেরানী** হলেও (নিজেকে জজ বা রেজিষ্ট্রার জেনারেল বলে পরিচয় দেয় না যে। অথবা সবচেয়ে দামী জুতো-জামা-চশমা-পেন সমৃদ্ধ হয়ে, **টেবিল মুছে না যে**। কিম্বা ফুটানী সর্বস্ব কাপ্তানী-মারা আপিসারের, চা-জল বয়ে **এনে দেয় না যে**)। আর (৬) অফিসে কেরানী, বাইরে সাধু—লাল গেরুয়াপরা এক জোচ্চোর পাষণ্ড — **সোমানন্দ অবধূত**!

তো সে যাই হোক, বসে আছি অজয়ের দিকে মুখ করে, একটা বটগাছের গোড়ায়। নির্জন জায়গাকেই আমার জনাকীর্ণ মনে হয়—বুঝিও তাই! নিস্তব্ধতার প্রতিটি পরত্ (layer) খুলতে খুলতে, সন্ধান পাই প্রাচীনের। হাজার হাজার বছর আগে যাঁরা ছিলেন, ভিড় করে আসেন তাঁরা। সাধারণের চোখে জায়গাটা, নির্জন কী ফেল্না হলেও, আমার কাছে তা' জনাকীর্ণ।

আর আমি ওঁদের সাথে কথা বলি— প্রণাম জানাই ওই প্রাক্তন আর প্রাক্তনী, ছায়া-ছায়া অস্তিত্বদের। খর-বোশেখের দুপুর। অজয়ের শুকনো নিঃশ্বাসের মতো, এক ঝলক হাওয়া এসে, বটের পাতাগুলোকে নাড়িয়ে বললো, ওই আগের অমৃতপদটুকু। একটু আশ্চর্য্যই লাগলো। জনমানবহীন ওই অজয়ের ধু-ধু বালিয়াড়ীতে, পুরুষ মানুষের গম্ভীর কণ্ঠস্বরে, ভক্তি-আপ্লুত আবৃত্তি, একটু যেন বেমানান।

ঝোলায় আছে ক্যামেরা। রাধাবিনোদের ছবি তুলতে গিয়ে, বাধা পেয়েছি পুরোহিতের। মনে সেই দুঃখটা থেকেই গেছে। শুধু মন্দিরের বাইরের ছবিটা, তুলে নিয়ে এসেছি। যে রাধামাধব স্বয়ং, কবি জয়দেবের খাতায় **লিখে** গেছলেন ঃ—

"স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো
হরতু তদুপাহিত-বিকারম্।।৭।।

প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানং
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসং
দেহি মুখ-কমল-মধুপানম্"।।

.......ধূয়া-ধ্রুবম্।।

অনুবাদঃ ("তোমার ওই সুন্দর স্নিগ্ধ পা দু'টো আমার মাথায় রাখ, অলংকারের মত আমার মাথায় তা' শোভা পা'ক। প্রেমের জ্বালায় জ্বলছি আমি, তোমার ওই দুটো পা আমার মাথায় রাখলে, এই প্রেমের জ্বালা কিছুটা অন্ততঃ প্রশমিত হবে! সুন্দরী প্রিয়াগো, বেকার রাগ করছো তুমি আমার উপর। তোমাকে দেখলেই আমার প্রেম মাথাচাড়া দেয়, মন কেমন করে, আমাকে তুমি চুমু দেবে না!")

............(১০ম সর্গ। মুগ্ধমাধবঃ)..... শ্রীগীতগোবিন্দম্

সেই রাধামাধবের ছবি, আমাকে তুলতে দেওয়া হয়নি। মনে কষ্টটা হয়েছে সে জন্যই। মন্দিরের উঠোনে দাঁড়িয়ে, ছবি নিয়েছিলাম মন্দিরটার। মনে মনে বলেছিলাম, "তুমি নাকি আসল নও, নকল—একথা শুনি। তবুতো তুমি তুমিই। দেখো, ওরা তোমার ছবি নিতে দিল না। যদি আমার চাওয়াটা 'একান্ত হয়'—তবে সে ব্যবস্থা তুমি করে দেবে। সে গোস্বামী ঠাকুর জয়দেব আর পদ্মাবতী কী, তোমার ব্যাপারে মিথ্যা বলেছে?

তুমি মিথ্যা, কী ওরা মিথ্যা বলেছে, সে দায় আর দ্বন্দ্ব তোমাদের থাক। আমি তোমাদেরকে দেখতে এসেছি, প্রণাম করতে এসেছি। তাইই বা অপূর্ণ থাকবে কেন? তোমার নাম একবার করলে, এতটাই পুণ্য হয় যে, মহাপাপীরও নাকি সাধ্য নাই—অত পাপ করে! তা'হলে আমি কী মহাপাপীরও বাড়া! তোমার ছবি নিতে চেয়েছিলাম, ওরা নিতে দিল না। সে দায় তোমার আর জয়দেব গোঁসাইয়ের। আমি এখান থেকে এখন চললাম। আমি থাকি আমার মতো, তুমিও থাকো তোমার মতো! শাস্ত্রীয় কিম্বা অশাস্ত্রীয় ফুট্‌কচালীর মধ্যে আমি নাই।

মন্দির চত্বর থেকে বেরিয়ে, হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা দূর এসে, বসে ছিলাম ওই কদম্বখণ্ডীর ঘাটে। বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে শুনতে পেলাম, জয়দেবের ওই পদটুকু। মনে হলো, বটের ডালের থেকে যেন কথাগুলো ভেসে আসছে, চৈত্র শেষের আর বোশেখের তপ্ত নিরালায়। অতৃপ্ত পিপাসার্ত্ত অজয়ের নিঃশ্বাস, যেন উদাসী বাউল হয়ে, শুনিয়ে গেল ওই পদটুকু।

এ'দিক ও'দিক তাকিয়ে দেখলাম, কেউ কোথাও নাই। শুধু রৌদ্রছায়ার খেলা চলছে বটের নীচে— যেখানটায় আমি বসে আছি। বুঝতে চেষ্টা করলাম—আগের সংস্কৃত পদ-টুকুর মানে। ফলের খোসার মত ছাড়িয়ে ফেললাম, ওই পদটুকুর সন্ধি-সমাস-প্রত্যয়, আলাদা আলাদা করে। যত কঠিন হোক না কেন ওই মূর্খদের সংস্কৃত ভাষাটা, আমি বুঝতে পারি। সে প্রত্যয় আছে আমার নিজের উপর, ব্যত্যয় হয় না তার কখনও। এবং সরকারী আর সামাজিক হিসাবে; আমি একটা 'অপসংকৃত এবং অজমূর্খ!

চমকে উঠলাম ওই প্রথম পদের, গভীরের মর্ম অনুভব করে। খর গ্রীষ্মেও ঘন ঘন রোমাঞ্চ হচ্ছে এই শরীরে, অজয়ের ঘাটে বসে বসে। এ' তো সরাসরি এক

নির্ভেজাল আশীর্বাদ! কই, কেউ তো নাই আমার আশেপাশে? তবে? কে ওই আশীর্বাণী শুনিয়ে গেলো? থরথর করে আপনা হ'তেই শরীর কাঁপছে।

ছুটলাম, অজয়ের বালিয়াড়ীর উপর দিয়ে, কমণ্ডলুটা হাতে নিয়ে; দূরের ক্ষীণস্রোত লক্ষ্য করে। স্থানে স্থানে গর্ত্তে গর্ত্তে, জল জমা হয়ে আছে, বালি তুলবার জন্যে। লক্ষ লক্ষ লরী বালি তোলা হয়, অজয়ের বুক থেকে। আবার কেঁদুলির উপর দিয়ে যে বাস-লরী যায়, দুর্গাপুরের দিকে অজয়ের শুকনো বুক চিরে, এই গ্রীষ্মে— তার জন্যে সাময়িক বাঁধ তৈরী করে, ওখানকায় মেহনতী সাঁওতাল মানুষেরা। বর্ষায় আবার সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

অজয় হ'ল **নদ**— নদী নয়। এঁড়ে এঁড়ে এর স্বভাব চরিত্তির। ফুঁসতে ফুঁসতে সে একদিন **ঝাঁপ** দিয়েছিল গঙ্গায়, ওই কাটোয়ার কাছে। পাশেই তার বিখ্যাত এক মহাশ্মশান— **উদ্ধারণপুরের ঘাট**। ফুরিয়ে গেলো তার সব **হম্বিতম্বি**। গঙ্গা গ্রাস করে নিলো তার সবটুকু জীবনরস। পরম- উদ্ধার হলো তার। আজ যদিও সে শুকনো বুক, তখন সে কিন্তু এমন ছিলো না।

বাঁধের আড়ালে জমে উঠা জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম, নিজেকে ধুয়ে নিতে, পবিত্র হয়ে উঠতে। কমণ্ডলু ভরে নিলাম **অজয়ের জলে**। বড্ড তৃপ্ত লাগছে এখন নিজেকে। মনে মনে ইচ্ছা ছিলো, ওই জলেই ধুইয়ে দেবো রাধামাধবের মন্দিরের চাতাল। লোহার গ্রীলের আড়ালে অবস্থিত, রাধামাধবের দেখা পেলেও, মন-প্রাণ ভরে প্রণাম করতে পারিনি। সব সময় সেবাইতের দেখা পাওয়া ভার।

কত কিছু চিন্তা করতে করতে, হাঁটতে লাগলাম বালির উপর দিয়ে। মুখ নীচু করে হাঁটতে হাঁটতে চলেছি। খেয়াল ছিল না, **কোনদিকে** যাচ্ছি। যেখানে এসে ধাক্কা খেলাম, সেটাও একটা ঘাট। শুকনো অজয়ের, অমন অনেক অনেক ঘাট আছে। উপরে উঠে এলাম, সেই সিঁড়ি বেয়ে।

ঘাটের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে একটা ছোট্ট মন্দির। তার গায়ে লেখা **কুশেশ্বর ঘাট**। এখানে নাকি **শ্রীজয়দেব গোস্বামী** আর তাঁর স্ত্রী **পদ্মাবতী** সাধনা করতেন। গোপন গর্ভগৃহে, মাটির অনেক নীচে। লোকজন নাই, কাউকে ডেকে যে জিজ্ঞেস করবো, তারও উপায় নাই! পাশের এক আধুনিক বাড়ীর দরজা খুলে, এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক বাইরে এসে, আগন্তুক এই আমাকে দেখে, আমার পরিচয় জানতে চাইলেন।

কথায় কথায় তার কাছে জানলাম যে, ওই কুশেশ্বর ঘাটেই, জয়দেব গোস্বামীর আসল সাধনপীঠ ছিলো। **অনেক দূরে** তখন প্রবাহিত হতো অজয়। ওই সাধন-পীঠ-টাই নাকি হলো, **'আদি আর অকৃত্রিম'**। এক বিচিত্র লাল পাথর, পদ্ম-ফুলের পাঁপড়ির মত তার চেহারা। একটা খণ্ডাংশ এখনো তার, পড়ে আছে সেখানে।

ও'টাতে নাকি গোস্বামীপাদ পা ধুতেন। বাকী অংশগুলো, কালক্রমে একে একে **ঝাড়া-হয়ে**, হারিয়ে গেছে! কেউ তো আর পাগল নয় যে, সেগুলোর যথাযথ **সংরক্ষণ** করবে! কাঠাদরে ও' জায়গাগুলোকে বেচে দিলে, কী বাজার-হাট বসালে বরং, বৎসরান্তে কোটি কোটি টাকা আসবে। **টাকাই কৃষ্ণ, কৃষ্ণই টাকা, আর সব ফাঁকা ফাঁকা, ফিকা ফিকা।**

বাঁ দিকে বহুদূরে বাজারের মধ্যে রয়ে গেছে, বর্ধমানের রাজার সেই রাধামাধবের মন্দির। অগত্যা কমণ্ডলুর, অজয়ের আঁজলাভরা জলে ধুইয়ে দিলাম, গোস্বামীপাদের সেই সাধনভূমি (?), আর তাঁর পদপ্রক্ষালনের সেই চিত্রিত পাথর খণ্ড। মনের মধ্যে গুমরাচ্ছে সেই শোনা শ্লোক—"**পদ্মা-পয়োধর ....** "। অশরীরী কেউ যেন এসে শুনিয়ে গেলো সেই **আশীর্বাণী**। বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব-দোলায় দুলতে লাগলাম।

"যদি হরিস্মরণে সরসং মনো,
যদি বিলাস-কলাসু কুতূহলম্।
মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলীম্,
শৃণু তদা, জয়দেব সরস্বতীম্।।৩।।

.... শ্রীগীতগোবিন্দম্(১ম সর্গ/সামোদ-দামোদরঃ)

অন্বয় ঃ— যদি শ্রীকৃষ্ণস্মরণে মনঃ সরসম্ কর্ত্তুমিচ্ছে, এবং বা যদি—শ্রীকৃষ্ণস্য রতি প্রসঙ্গেষু কৌতুকং স্যাৎ, তর্হি মাধুর্য্য গুণযুক্তাঃ সরসাঃ তথা কান্তাঃ মনোজ্ঞা পদানাম্ + আবল্যঃ = পঙতয়ঃ, যস্যাং = তাদৃশীং, জয়দেব বাণীং শৃণু।

বাংলা মানে ঃ— যদি শ্রীকৃষ্ণ চিন্তায়, মনটাকে সরস করতে চাও, কী বিভোর হ'তে চাও; যদি শ্রীরাধাকৃষ্ণের সুন্দর প্রেমের লীলার কথা জানতে চাও, তবে—কবি জয়দেবের এই সুললিত মধুর পদগুলি শুনো।

(If you desire to have the Savour in the mind, and that too you want to know the divine activities, love and coitious play of God (SriKrishna); with the Supreme mother (Radha), then here are the hymns / verses of Joydeva, read it and feel it.)

বুঝে উঠতে পারছি না, আমি এখন কী করবো? যদি মানি যে রাধাকৃষ্ণ ছিলেন—কবি জয়দেব গোস্বামী ছিলেন, তবে আমার মতো এই ফ্যাক্‌লু (worthless) সাধুরই বা কী আসে যায়? আর যদি বুঝি যে ওঁরা ছিলেন না—গেঁজুড়ের আষাঢ়ে গপ্পো মাত্র—তবে তা'তেই বা ওঁদের কী ক্ষতি; বা আমার কী লাভ? খুবই মুস্কিল

হচ্ছে ঠিক পথটা বেছে নিতে। হ্যাঁ বা না, কোন পথে না গিয়ে, শুধু মূক দর্শক হওয়াই ভালো। ভালো—তার কথা মনন আর চর্বণ করা।

শুনেছি সে নাকি মনের মধ্যে লুকিয়ে থেকে থেকে, আংলায় কী উসকে দেয় সবাইকে, লুকোচুরি খেলায় ***(Hide & Seek)***। সে বলে, *"খোঁজ, তোমরা আমাকে। আমাকে ধরতে পারলে, আমি তোমাদের ষোল কোটি কচি কচি সেবাদাসী, কী ঠিকাদাস দেবো। টাটা-বিড়লা-ডালমিয়া বানিয়ে দেবো। নিদেন পক্ষে, লাদেন মিঞা কী বুশ মিঞা বানিয়ে দেবো। খালি মনের বুশে* ***(Bush),*** *একবার ঝাড়া মেরে দেখো যে, আমি এই ছ্যাঁচড়া লোকটা কোথায় আছি।*

আমাকে ধরো, আমিতো ধরা দেবার জন্যই সকলের মনের ঝোপে লুকিয়ে আছি। ঝোপড়াটা আমার ও'খানেই। বেশী কিছু না পেলেও, মিনিমাম কয়েক হাজার গোরু, মোষ দিয়ে দেবো। ওদের দুধ ঘি আর ঘুঁটে বিক্রী করে, তুমি অন্ততঃ বছরে কয়েক কোটি টাকা পাবে। ইনকাম ট্যাক্স ফাইলে সেটা Show করতে পারবে। নাও, লেগে পড়ো, বাপেরা-মায়েরা—খুঁজো আমাকে ল্যাংটা হয়ে।

কি নিয়ে খুঁজবে তোমরা আমাকে? হাতে তো কিছু একটা অবশ্যই থাকতে হবে! শুধু হাতে কী খুঁজা যায়? তা'—বাঁশী নিতে পারো, কাঁসি নিতে পারো— অশ্রু নিতে পারো— সে, তোমাদের যা ইচ্ছা। শর্ত্ত হলো এই যে—আমাকে খুঁজে পেলে, যা' চাইবে—তোমরা তাই পাবে! খালি আমাকে খুঁজতে হবে—এই যা!"

সাড়ে সাত-আট হাজার বছর আগে, ওই কয়েকটা কথা দিয়ে, সে নাকি উসকে দিয়েছিলো সবাইকে। নাকের ডগায় **মূলো ঝুলিয়ে** দিয়েছিলো সবার সেদিন, ওই কেষ্টা ব্যাটা। ব্যস, সবাই তাকে খুঁজে পেতে দৌড়াতে লাগলো।

কেউ হলো ঘরছাড়া, কেউ হলো ভাতার-ছাড়া, কারুর হাতে চিমটা, কারুর হাতে একতারা। কারুর হাতে লাঠি, এই প্যামার মতো— কারুর হাতে কলম। কেউ নিল কাঁসর ঘণ্টা, কেউ দিয়ে ফেললো নিজের মনটা। যে মনটাই দিয়ে ফেললো, সেই-ই পুরোটা পেলো তাকে। বাকীরা ফিরে গেলো ঝোপড়ায় ঝোপড়ায়, আশ্রমে-মঠে-মন্দিরে। কেউ আবার বললো—আরে দূর, কেষ্টা আমার কী করবে? —মা কালী, শীতলা, শনি, সন্তোষী-মা আছে না! ওইই সব।

অনেক কথা চিন্তা করতে করতে, আনমনা হাঁটছি তো হাঁটছি। সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি। দু' তিন কাপ চা খেয়েছি মাত্র, বীরভূমের আলুর চপের সাথে। রাস্তায় হোটেল যে কোন দিকে ফেলে এসেছি, বুঝতে পারছি না। তবে মনে হচ্ছে, আমি অজয়ের পাড় ধরে এগিয়ে চলেছি, ইলামবাজারের দিকে।

আসুন না, ফিরে যাই ইতিহাসের সেই দিনগুলোতে :-

তখন ছিলো নবাবী আমল। জাফর খাঁর জামাই, সেই সুজা উদ্দীন (Sujah-ud-din)! তখন সে আসীন বাংলার মসনদে। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নাকে দড়ি লাগিয়ে, চাবুক বাগিয়ে, জমিদার-সামন্তদের রাগিয়ে, গড়গড়িয়ে চালাচ্ছে তার রাজত্বের রথের; সেই বিশাল চাকাগুলো। ওই যে বললাম, **ইলাম-বাজার**! এলেম-ওলা সব ব্যবসাদারেরা, ব্যাপারীরা, সুপারী চিবুতে চিবুতে, পানের পিক ফেলতে ফেলতে; ব্যবসা করতো— বাজারও করতো। লাক্ষার বড় বাজার ছিলো ওই **ইলামবাজারে**।

অজয়ের তীর জুড়ে, গ্রাম জুড়ে চাষ হ'তো এই লাক্ষা-কীটের। টোপাকুল গাছের, পলাশ গাছের পাতা, ওই কীটেদের খুব প্রিয় কিনা! কি রকম দেখতে ওরা? আসুন না, চিনিয়ে দিই—চিনির মত মিষ্টি লাগবে ব্যাপারটা। ইঞ্চি চারেক লম্বা আর ইঞ্চি খানিক মোটা, শুঁয়োহীন সবুজ সবুজ **"শুঁয়ো-পোকা"**। খালি কচি কচি কুল-পাতা আর পলাশ-পাতা খেয়ে পেট ভরায়, আর ঘুম পেলে পাতার উল্টো পিঠে গিয়ে পাতাটাকে আঁকড়ে ধরে ঘুমায়। আহা-রে— বাছা-রে!

বড়ই নাদুস-নুদুস **রাজকীয়** ওদের চেহারা। রেশমকীট বা পলু-কীটের ওরা ভায়রা-ভাই। ওদের লালায় (Saliva) হয় গালা বা লাক্ষা, আর শরীরটা পুড়িয়ে লাল লাল ছাই থেকে হতো আলতা। তখন ছিল না কোন কেমিক্যালের কেরামতী, আলতা-লিপস্টিকের জন্য। ও'গুলো চলে যেতো, ব্যবসায়ী আর ফড়েদের নৌকায় চড়ে, মুর্শিদাবাদ আর দিল্লী-লাখনউ। নবাব-আমীর-ওমরাহ্দের বিলাসবাগে ব্যবহার হ'তো ওগুলো। তাদের বিবি-বেগমরা পরবে কিনা!

বেগম-নবাবজাদীর চুড়ি তৈরী হ'তো, ওই গালা দিয়ে, গালে ঠোঁটে রং করা হ'তো ওরই আলতা দিয়ে। আর ওই পোকাগুলোর লালায় তৈরী, সুতো থেকে তৈরী হ'তো, নবাবজাদা আর বেগম-সাহেবাদের, লজ্জা নিবারণের **মসলিন** জাতের বস্ত্র সম্ভার। গালা দিয়ে তৈরী হ'তো—থালা-বাটি-গেলাস—**সুরাপাত্র** আরও কত কী! আমীর-জমিদার-ওমরাহ্দের মেজাজ, ফুরফুরে হয়ে তুঙ্গে উঠতো না, যদি না সুরার পাত্র তৈরী হ'তো, ওই **লাক্ষা** দিয়ে।

পেছনে বহুদূরে পড়ে রয়েছে কেঁদুলী, যার আগের নাম ছিল **কেন্দুবিল্ব**। জানতে হবে ও' জায়গাটার প্রাচীন আর আধুনিক ইতিহাস—তার অন্তর্লীন বৈষ্ণবীয় ভাবের স্রোতঃধারা। কিন্তু এ' আমি কোথায় চলেছি? পিছিয়ে যেতে মন করছে না, আবার এগিয়ে যাবার টানও, অনুভব করছি না। পড়ে গেলাম বেজায় দো-টানায়।

একটা টোপাকুল গাছের গোড়ায়, বসে পড়লাম জিরোতে। মগডালে পাতায়

পাতায় তার, ঘুরে বেড়াচ্ছে দু-চারটা পলু-পোকা (রেশমকীট)। বেজায় তেষ্টাও লাগছে। অজয়ের বালি এত তেতে উঠেছে যে, মাঝ বরাবর যে ক্ষীণ-স্রোত বয়ে চলেছে, সেখানে পৌঁছাতে রীতিমত কষ্ট করতে হবে।

বীরভূম জেলায় বেশ বড় বড় দীঘি আছে, আর পদ্ম-শাঁপলা ফুলে ভরে থাকে, সারা বছর সেগুলো। কিন্তু এদিকে কী একটাও দীঘি নাই? কুলগাছটার গোড়ায় বসে বসে, দেখতে লাগলাম তার পাতা, দু একটা পাকা পাকা কুল, গাছের মগডালে।

বাঁদিকে পড়ে রয়েছে সেই নবাবী আমলের **ইলামবাজার**। অজয়ের মত, আজ তারও বুক ফাঁকা, আর ঘাট ফাঁকা, ঘুরে গেছে কালের চাকা। উপরে তাকিয়ে দেখলাম—ইঞ্চি খানিক লম্বা মৌ-চুট্‌কী পাখীরা, ঠোঁট গলিয়ে গলিয়ে মৌ চাটছে ফুলের বুক থেকে। কালো কুচকুচে তাদের চেহারা, ইঞ্চি দেড়েক শরীর হলেও বাঁকানো কিন্তু ঠোঁটগুলো। তাই গলিয়ে গলিয়ে চাটছে চৈত্র শেষের মধু। যদুর ব্যাটা কেষ্টার হোলি খেলার দিন আসলো বলে! পলাশে-শিমূলে-মহুয়ায় লেগেছে রং। পাড়ায় পাড়ায় বেরিয়েছে ছোঁড়া ছুঁড়িদের সঙ!

শালগাছ ছেঁটে কেটে পরিষ্কার। থেকে গেছে কিছু মহুয়া, পলাশ আর বহেড়া। এই চোত-বোশেখের দিনগুলোতে, ঝরে মহুয়া ফুল। মাতাল মাতাল তার গন্ধ আর স্বাদ, বেশী খেলে পেটের ভেতর গেঁজতে থাকে তাড়ির মত। যে খায় তার গা গরম হয়ে উঠে। পলাশ ফুলেরা পড়ে আছে গাদা গাদা, গাছের গোড়ায় গোড়ায়।

পাশের বকুল গাছ থেকেও, ঝরে পড়ছে ফুল। উগ্র মিষ্টি গন্ধ তার, মহুয়ার গন্ধের সাথে, পাল্লা দিয়ে উড়ছে বাতাসে। সামনে আসছে দোল পূর্ণিমা। কুঙ্কুম, আবীর তো আছেই, তবু পলাশ ফুলের রেণু না হলে নাকি, সে রাধাকান্তের মন ভরে না।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে গেছি, ভুলে গেছি বুকফাটা তেষ্টার কথা। কা'রা যেন কথা বলতে বলতে আসছে এদিকে। তাকালাম ঘাড় ঘুরিয়ে, তাদের দিকে। অজস্র ঝরা ফুল, কোঁচড় ভরে কুড়াচ্ছে তারা। মহুয়া-বকুল আর কিংশুক।

—— "কুড়াই লে ক্যানে সব গুলান্ সই, রাধামাধবের দোলে (ঝুলনে) লাগবেক্ বটে! লাগর আমার ভালবাসে বটে, পলাশ ফুলের রেণু, গুঁড়া করবিক্ ঘরকে যেএগ্রা!"

—— "কুড়াই লিছি গ' লাগর। আম্যু কী বুঝি লাই, সে লাগরের পিরিত? পায়ে হাতে ঠোঁট্টে, আলতার পারা লাগাই দুবক্ গ' উয়ার।"

অসম বয়সী দুই বাউল-বাউলানীকে দেখে, মনে মনে বিষম খেলাম একটা। এতদিন দেখে এসেছি, বুড়ো বাউল ঘুরে বেড়ায়, কচি কী ডাঁসা বাউলানী নিয়ে। ছাগল গরু কিনবার মতো, পয়সা দিয়ে ও'দেরকে কিনে আনে হয়তো। সে বহু রকমের, হাত

ফেরতের ব্যাপার থাকে। কিন্তু একেবারে গোঁফ প্রায় না গজানো, বছর কুড়ি বাইশের বাউলের সাথে, বছর পঁয়ত্রিশ-চল্লিশের গায়ে গতরে থাকা সাধনসঙ্গিনী; ভালই সে গেঁথেছে বড়শীতে।

কিন্তু কে কা'কে গেঁথেছে? এ' সব অতি অতি গুঢ় ব্যাপার। নিজে থেকে না বললে, জিজ্ঞেস করাটা হবে দারুণ এক অন্যায়। আমাকে দেখে হক্‌চকিয়ে গিয়ে ওরা বললো, "জয় রাধামাধব, জয় রাধামাধব। বাবা, ইদিক পানে কুথাকে যাবেন বটে? ই-ত, ইলমবাজ্যারের পথ বটে!" আপ্যুনি লোতুন বটে?"

—— "আমি এখানে নুতন যে মা। পথ ভুলে এদিকে এসে পড়েছি। কেঁদুলিতে নেমেছিলাম, ওখানকার সব কিছু দেখবো বলে। হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম এদিকে। রোদ কিছুটা পড়লে, আবার হাঁটবো কেঁদুলির দিকে। এখন একটু জল পেলে ভাল হয়। নদীর বালি এত গরম যে হাঁটা যায় না। এদিকে কোন দীঘি আছে? আর একবার চানও হবে, জলও খাওয়া হবে। ওই দিয়ে তো পেটটা এখন ভরাতে হবে।"

—— "হা কৃষ্ণ, সামনেই তো বিরাট দীঘি, ঠাকুর। যান্ ক্যানে চান্ করেন। 'বাবার' এখনো রাধাগোবিন্দের প্রসাদ জুটেনি? আহা রে! রাধামাধব, রাধামাধব!"

ওদের দিকে একটু হাসি ছড়িয়ে দিয়ে, ঝোলা আর কমণ্ডলুটা নিয়ে উঠে পড়লাম। ওরা বসে রইলো সেখানে। চোখ জুড়িয়ে গেল সে দীঘির জল, আর তার বিস্তার দেখে। ফুটে আছে অনেক পদ্ম আর শাঁপলা, লাল-সাদা। দু' একটা ডুব দিয়ে উঠে, শাঁপলা তুলতে লাগলাম উদর ভরাবার জন্য।

ছোটবেলায় গ্রামের বাড়ীতে, যখন খাবার-দাবার কিছুই থাকতো না, তখন মাকে তুলে এনে দিতাম, রায়দের দীঘি থেকে বোঝাখানিক লাল-সাদা শাঁপলা। কখনো কখনো আগে পেটটা ভরিয়ে নিতাম, জলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। কাঁচা কাঁচা শাঁপলা কষাটে-মিষ্টি লাগে। হাত চার-পাঁচ লম্বা, গোটা আট-দশ চিবোলেই পেটটা ভরে যায়। আজও তাই করলাম।

চিবুতে লাগলাম সেই শাঁপলাগুলো, ছাল ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে। পেটটা এখন ভালই ভারী হয়েছে। কমণ্ডলু ভরে জল, আরও কয়টা পদ্মফুল তুলে নিয়ে, ফিরে এলাম ওদের কাছে। শরীর আর মন, এখন বেশ শান্ত। পেটটাও হয়েছে ভারী। আমি কোন শালার ধারি? ছোকরা সেই বাউলটা বললো ঃ "বাবা, আসুন ক্যানে রাধাগোবিন্দের প্রসাদ পাই গ'। সকাল থেঁকে মাধুকরীতে যা হয়েঁছে, তাই এই পাঁচ জনে খাই।"

বুঝতে পারলাম না, তার কথাগুলো। পাঁচজন আবার কা'রা? শুধু বোকার মতো ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। বাউলানী বললো— "আপ্যুনি আর আমরা দু'জন—তিন জন হ'ল্য বটে? রাধামাধব—দু'জন। পঞ্চদেবতা—বাবা। ঠিক

বলি লাই?''

খুব লজ্জায় পড়ে গেছি। বয়সে ও'রা আমার চেয়ে অনেক ছোট। অথচ ওরা বুদ্ধি ধরে আমাকে চরাবার! প্রসাদের ব্যাপারে 'না' করাটা, সমীচীন হবে না বুঝে বললাম—''কই, দাও মা। তোমার হাত দিয়ে যদি, এখন রাধামাধবের প্রসাদ পাই, সেও তো হবে মহাপুণ্যের!'' এই ফাটা-কপালে কি তা' সহ্য হবে!''

ঝোলার ভেতর থেকে সে বের করে ফেললো, মুড়ি চিঁড়া আর গুড়। রাখলো আমার সামনে। আমি আমার ব্যাগ থেকে বের করলাম, একটি পলিথিন কাগজ। সেটাকে একটু পরিষ্কার করে নিলাম, বয়ে আনা দীঘির জলে। মাটিতে বিছিয়ে ফেললাম, আমার চার ভাঁজ করা লাল গেরুয়া একটা। তার উপর পেতে দিলাম সেই পলিথিন কাগজটা। সমস্ত চিঁড়ে গুড় আর মুড়ি তা'তে ঢেলে, পাশে পাশে সাজিয়ে ফেললাম পদ্মের ফুলগুলোকে।

তারপর কুড়িয়ে আনলাম, শুকনো শুকনো পাতা আর বকুল ফুল। লাইটার দিয়ে জ্বালিয়ে ফেললাম পাতাগুলোকে। তার উপর ছুঁড়ে দিলাম শুকনো বকুল ফুল। সেগুলো পুড়তে পুড়তে অতি মিষ্টি গন্ধ ছড়াতে লাগলো। ওদের দু'জনের হাতে খানিকটা করে মুড়ি চিঁড়া আর গুড় ধরিয়ে দিয়ে বললাম, ''এসো, আমার সাথে হোম করো।

যে বিশ্বপিতা তোমাদের অন্ন দিয়েছেন, তাঁকে আগে দাও, পরে প্রসাদ আমরা নেবো। বলো, 'হে বিশ্বপিতা—তুমি এ' অন্ন গ্রহণ করো। তুমি না নিলে, আমরা নিই কী করে! তুমি নাও প্রভু।''

আমার সাথে সাথে ওই ভাবে, ওরা হোম করলো অবাক্ চোখে। সংস্কৃতের ওঁ বং চং নাই, জটিল কুটিল ফর্দমালা নাই, তাই অবাক হয়ে গেছে ওরা। অমন করে হোমও হয় তাহ'লে? একথা যেন বিশ্বাসে মেনে নিতে পারছে না ও'রা। মেয়েটি বললো, ''বাবা, আজ আমরা এই নুতন জিনিস শিখলাম। ঠাকুরকে এ'ভাবে তো কেউই দেয় না। এটা কোন্ পথ বাবা, কোন্ ধারা?''

—— ''কোন ধারা নয় এ'টা। কোন নুতন পদ্ধতিও নয় এ'টা। অতি সাধারণ ব্যাপার। ছেলেমেয়ে যেমন বাবা মায়ের হাতে খাবার তুলে দিয়ে 'খাও' বলে, মা যেমন খাবার তুলে দেয় ছেলেমেয়ের হাতে, 'খা তোরা' বলে— এ' পথটা ঠিক সেই রকমই একটা পথ।

ঠাকুরকে ভয় পাও কেন? কেন ভাই, বন্ধু, পুত্র, কিম্বা বাবা-মা বলে ভাবতে পারো না মা! কিন্তু, অমন করে বলতে পারাটাও, বড় কঠিন। তবু অভ্যাস করো, একদিন সহজ হয়ে যাবে তোমার ওই নিবেদন। নিবেদিত হয় বলেই না, ওর নাম নৈবেদ্য! তোমার আমার মত মূর্খের এই-ই এক সরল পথ!''

চোখ থেকে টপটপ করে, পড়ছে জল সেই মেয়েটার। ছেলেটার দৃষ্টি উদাস— এ' পথে চলার প্রথম পাঠ হয়েছে তার, বলে অনুমান করতে পারি। হঠাৎ অমন হওয়াটা, তবে কী শরীর নির্ভর? কে কার মুড়োতে কামড় মেরেছে? অনেক প্রশ্নই মনের মধ্যে, ঘোরাফেরা করতে লাগলো। যাই হোক, ওদের হাতে বেশীর ভাগ চিঁড়ে-গুড়-মুড়ি তুলে দিয়ে, সামান্যই নিলাম আমি। পেট তো ভরে আছে শাঁপলায়। শাড়ীর আঁচলে চোখ মুছে, সে মেয়েটা খেতে লাগলো প্রসাদ।

বললাম : *"ফুলগুলো 'নিবেদিত'। ফেলো না ও'গুলো। ঝোলায় থাকতে থাকতে একদিন শুকিয়ে যাবে। কারুর উপকার করতে চাইলে, নির্লোভ হয়ে তাকে দিও। কাজ যা' হবার তা' হবেই। কি কাজ হবে, সে ওই তোমার রাধামাধব জানে। তবু বিশ্বাস রাখতে দোষ কি? অনেক নিষ্প্রাণ বস্তু, অনেক বড় কিছু ঘটিয়ে ফেলে। তোমার খঞ্জনী আর ডুগী কী নিষ্প্রাণ হয়েও, মিষ্টি সুর তুলে না?"*

খেয়ে উঠে পরম সমাদরে আর শ্রদ্ধায়, ওরা রেখে দিল ফুল ক'টা ঝোলার ভিতর। বিকেল গড়িয়ে আসছে। রোদের তাপ ততটা আর নাই। দক্ষিণের বাতাস বইছে ধীরে ধীরে। ফিরে চললাম আমরা শ্রীজয়দেব গোস্বামীর শ্রীপাট কেঁদুলির দিকে। ছেলেটার হাতের একতারায় তখন উঠছে বোল্। মেয়েটার হাতে রয়েছে খঞ্জনী। আর ডুগিটা তার কোমরে বাঁধা।

মাতাল করা সুরে সুরে, গান ধরেছে ও'রা। অজয়ের এ'পারের ঝিল-বিল-দীঘি থেকে, সন্ধ্যের মুখে উড়ে চলেছে একপাল বুনো হাঁস আর বক, শ্যামরূপার জংগলের দিকে। এদের কণ্ঠের গান আর ওদের কলকণ্ঠের গান, মিলে মিশে তৈরী করেছে এক ধূসর অনুভব, ধীরে ধীরে তা' ছড়িয়ে পড়ছে যেন অজয়ের শুকনো বালির বুকে।

"রতি-সুখ-সারে গতমভিসারে মদন-মনোহর-বেশম্।
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বন মনুসর তং হৃদয়েশম্।।
ধীর-সমীরে যমুনাতীরে
বসতি বনে বনমালী ।।১।।

ধ্রুবম্ (ধুয়া-Burden/Repetition) ......*৫ম সর্গ—শ্রীগীতগোবিন্দম্*

বাংলা অর্থ ঃ— হে সখী নিবিড় নিতম্বিনী, রমণের সুখ সাগরে যদি ভাসতে চাও, তাহলে আর দেরী কোরো না। কেননা মদন (শ্রীকৃষ্ণ), মনোহর সাজে যমুনার পাড়ে ধীর-সমীর বনে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে, তুমি তাকে অনুসরন কর।

......(আমার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ)

"If thou hast the thirst,
To be floated in boundless love,

Follow Him, the Shyama, oh dear,
In Dhira-samir Garden,
Exotic He takes rest there.
Let no late there be—
Avaricious He, for thy
Heavy buttocks and plumpy-bulky breasts."

............Somananda Abadhut

ডুবে আছি ওই গান আর সুরের মধ্যে। রোগে পাওয়ার মতো, আমাকে সব সময় আক্রমণ করে ইংরাজীর ভূত। ওটা যে পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠতম ভাষা! যেটা মোটামুটি জানলে, ছড়িয়ে দেওয়া যায় নিজেকে, সারা পৃথিবীতে! খালি মনে হয়— ও'রা যদি ইংরেজ হ'তো, তবে কেমন করে গাইতো ওই গানগুলো? ইস্কন মন্দিরের সাধুরাই বা কেমন করে গায় ওই পদাবলী? আমিতো শুনেছি এক একবার ও'দের মুখে, খোল-করতাল বাজিয়ে, পথে পথে গান করতে, আষাঢ়ের রথের সময়— জ্যাই রাডে, কৃষ্‌ড়ঁ— জ্যাই জ্যাই রাডে,— জ্যাই জ্যাই কৃষ্‌ড়ঁ!

সংস্কৃতভাষীরা অনুস্বার-হসন্ত-সন্ধি-সমাস মিলিয়ে, বিচিত্র ধ্বনি প্রকাশ করে। আমি এখন কী করি? রবি ঠাকুর কী শেক্সপীয়রের পেছন-পেছন, ল্যাল্‌ব্যাল্‌ করতে করতে দৌড়াই। মনে মনে ওদের বলি — একটু দেখে দাও মাইরি, গুরু—কপিতাটা ক্যামন হয়েছে! মানসিক এক লাথি ঝেড়ে ভাগিয়ে দিলো ওরা।

কবি জয়দেবের ওই পদটুকুর মেদ্‌নিপুরিয়া রূপ আমার এই কবিতাটা। এখন বলি যে, একটু টাখনা মেরে চাখুন তো আপনারা! আহারে, আমার মতো ছোট জাতের এক বাচ্চা, কি জিনিষ বানিয়েছে; সেটা দেখুন ভাই :

"ফুর্ত্তি লুটার সময় হোচ্ছে,
চলে যা না রে—
নাঙ্‌-টা যে তোর বুস্যে আছে,
বনের ভিত্যর রে!
মটা পঁদে যা না মাগী,
নাঙ্‌-টা যে তোর, হয় বিবাগী!
তর্‌ সয়নি সেউট্যা ক'ঠি,
বিশ্বাস্‌ করে লে!
দেরী ক্যানো করুঠ্‌ রে
চোলে যা না রে — ও' মাগী,
নাঙ্‌-এর পাশে মটা গাঁড়ে,

থাক্ না শুয়ে রে!" ....সোমানন্দ অবধূত

এ' ভাষা আর মেজাজ, আমার দেহাতী-উড়িয়া-সাঁওতাল-লোধা অধ্যুষিত মেদিনীপুরের। স্থানীয় অনেক টান আর ভাব আছে ও'তে। যাঁরা এ'সব খুঁজে বেড়ান, সে সব মধুকরদের জন্য এই প্রয়াস। আমি নিজেও খুঁজে বেড়াই ও'সব। না, আমি গবেষক নই, আর সে এষণা আমার নাইও—শুধু ভালো লাগে, ওই স্থানিক বা আঞ্চলিক কথাগুলো।

অনেক অনেক গবেষক আর ভদ্দরনোকের, ভাল লাগবে না জানি। তবুও বলি—মহাপণ্ডিত সেই জয়দেবকেও, ওই ডিগ্রিধারী আধুনিক **'পণ্ডিতের বাচ্চারা'** কঠোর সমালোচনা করেছে, কবিতাটা নাকি যৌনতা-দোষে-দুষ্ট বলে। সাধনার 'স'-টাও কী বুঝে তা'রা? ও'দের বিচারে যারা **'মহামূর্খ আর পরকীয়া ইতর'**, তাদের সাধনার গুহ্য কথাগুলো এখানে তুলে দিচ্ছি :-

"জীবন আর চৈতন্য স্বরূপের এই লীলা-মাধুরী, পরকীয়া ভাবের মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে, সৃষ্টির সেই আদি মুহূর্ত থেকে। এই হ'ল পরম সত্য। স্বকীয়া ভাবের মধ্যে লক্ষ্মীই রাধারূপে অবতীর্ণা হলেন। একদিন বিশ্বমাতা লক্ষ্মী, নারায়ণকে বলেছিলেন, 'দেখো—আমিতো তোমার কাছে সব সময়ই আছি, তোমার আর এই আমার মধ্যে তো কোন বাধা নাই মিলনের, তবে তুমি বা আমি কেন তেমন তৃপ্তি পাচ্ছি না?'

মৃদু হাসলেন বিশ্বপিতা। তারপর বললেন—'তুমি আমার পত্নীত্বের সম্যক অধিকারে মহারাণীর মত আমার উপর তোমার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছো। পরস্পরকে পাওয়ার জন্য বাধাবিঘ্ন পার হবার দুঃখ নাই। অসাধ্য সাধনের আকুল আবেগ নাই। কেউ কাউকে হারিয়ে ফেলার ভয়ও নাই। আবার হারাবার পরে, তার জন্য অনন্ত ব্যথাও নাই। দুঃখকে উপলব্ধি করতে পার না বলে, সুখের মিষ্টতাও তোমার কাছে পরিচিত নয়।

প্রিয়া, চোখ দিয়ে যদি জল না পড়ে, তবে যে প্রাপ্তির হাসির মধ্যে প্রাণের আবেগ ছলকে উঠে না! এসো, তুমি আর আমি এই নিস্তরঙ্গ শংকাহীন জীবনটাকে নতুন করে অনুভব করি। তুমি হবে পরস্ত্রী—রাধা, আর আমি পরপুরুষ—কৃষ্ণ। তুমি আমি একই থাকবো, তবুও বিচ্ছেদ আর মিলনে, কেমন ব্যথা আর তৃপ্তি পাও, তা মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারবে।"

ওদের গান শুনতে শুনতে, ইস্কনের কথা আর আমার অঞ্চলের কথা ভাবতে ভাবতে, আমি হারিয়ে গেলাম চিন্তার অতলে। অজয়ের পাড় ধরে হেঁটে চলেছি কেঁদুলীর দিকে। খেয়াল ছিল না, কেমন করে হাঁটছি। সে গানের প্রমত্ত উল্লাস মনের

মধ্যে দুই ডানা মেলে উড়ছে। সব গান, সব কথা যেন একই সুরে বিধৃত হয়ে বেজে উঠেছে—অসহ্য সে সুখ রূপান্তরিত হয়েছে রোমাঞ্চে। বার বার শরীর আর মনের কূল ছুঁয়ে পরশ রাখছে—ভুলিয়ে দিতে বিশ্ব-সংসার—তার যন্ত্রণাময় দিক।

যমুনা এখানে নাই, আছে অজয় নদ। মনের খেয়ালীতে সেও যেন, পরিনত হয়েছে কলস্বনা যমুনায়। কৃষ্ণা-রাত্রি, কৃষ্ণের রূপ নিয়ে চুম্বন করে চলেছে, শুকনো অজয়ের সোনালী বালিয়াড়ি। ঘরে ফেরা মেয়েদের মাথার জঙ্গুলে কাঠের বোঝাকে, মনে হয়েছে দুধ আর ননীর কলসী—যমুনার ও'পারে যেন মথুরায় যাচ্ছে ও'রা। কে ও'দের ডেকে নিয়ে চলেছে? কোন্ সে বাঁশ্‌রীও'লা? হ্যাম্‌লিনের ব্যাগ-পাইপারের মত, সমস্ত নগরীর সবাইকে ডাক দিয়েছে?

হঠাৎ ঘটে গেল এক দুর্ঘটনা(?)। হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়লো সেই বৈরাগিনী বাউলানী, তার পৃথুলা শরীরটা নিয়ে। থর থর করে কাঁপছে তার, সমস্ত দেহটা, তেষ্টায় যেন তার কণ্ঠা শুকিয়ে উঠছে। চোখ দু'টো তার কপালে উঠেছে—শিবচক্ষু হয়ে সে গোঁ গোঁ করছে। ছিটকে পড়েছে তার হাতের খঞ্জনী, ডুগিটা ডিগবাজি খেয়ে, গড়িয়ে গিয়েছে অজয়ের শুকনো বুকে। লোকালয় থেকে দূরে, নির্জন প্রান্তরের বুকে, অদৃষ্টপূর্ব এ' ঘটনা, আমাকে অসম্ভব রকমে বিহ্বল করে তুলেছে। ছুটে দৌড়ে নেমে গেলাম অজয়ের বুকে, তার সেই ডুগডুগিটা কুড়িয়ে আনতে। গাড়ির চাকার মত গড়াতে গড়াতে, সেটা চলে গেছে নদীর বহু গভীরে।

ডুগিটা কুড়িয়ে নিয়ে পাড়ের উপরে উঠে, দাঁড়িয়ে রইলাম বোবা আর স্থবিরের মত। উলঙ্গ আর চিৎ হয়ে পড়ে আছে সে বৈরাগিনী। তার যোনীদেশ অধিকার করে ফেলেছে সেই ছোক্‌রা তার পুংদণ্ড দিয়ে, আর সমানে মর্দন করে চলেছে তার ভারী ভারী স্তনরেখা, মাঝে মাঝে জাপটে ধরে বুকের মধ্যে সেই সাধনসঙ্গিনীকে, মুখের মধ্যে গলিয়ে দিচ্ছে তার লম্বা জিভ।

*উম্মাদ রসভক্রীড়ায় সে মেতে উঠেছে। আমি তাদের সামনে দাঁড়িয়ে, অথচ নাই তাদের কোন হুঁশ—নাই কোন লজ্জা—নাই কোন শংকা। জয়ডংকা বাজিয়ে, রতিক্রীডার সীমাহীন উদ্দাম উল্লম্ফন শুরু হয়েছে। দাঁড়াতে পারলাম না আর। অদেখা ওই উৎসবের অংশীদার হ'তে পারিনি কখনও। বাধছে আমার এত দিনের পরিশীলিত রুচিবোধে।**

*দেহ দিয়ে দেহাতীত সে ঈশ্বরকে ধরার কৌশল। চেতন আর অবচেতন মনের মাঝ বরাবর একটা স্তর আছে। বাইরে থেকে ওদেরকে মনে হয় হিষ্টিরিয়া গ্রস্ত। সে সময় যদি উদ্যাম রমণ করা হয়, অথবা পুরুষের লিঙ্গকে চোষণ আর চর্বন করা হয়, অবশ্যই সেই সিদ্ধিলোকের দরজা খুলে যায়। সে সময় জোরে জোরে মন্ত্র জপের শব্দ-তরঙ্গাভিঘাতে, খুলে যায় ষটচক্রের বন্ধ জটিল দরজাগুলো। কুলকুণ্ডলিনী গোখরো সাপের মত জেগে উঠে, ফোঁস ফোঁস করে দৌড়ায় মাথার খুলির দিকে; শিরদাঁড়া বেয়ে। অনাচার নয়, এটা ফর্মুলা—সাধনার অংকের উত্তরকে খুঁজে পেতে।

গাঁজার ব্যবস্থা এখন আমার নাই। এ' সময় গাঁজা টানতে পারলে, কিছুটা মানসিক উপশম হতো। আস্তে আস্তে ডুগিটা সেখানে নামিয়ে রেখে, দ্রুতপদে হাঁটা দিলাম কেঁদুলির দিকে। যেন বাঘে কী পাগলা কুত্তায়, তাড়া করেছে আমাকে। সব বুঝেও—বুঝে উঠতে পারছি না কিছুই। নিজেকে বড্ড বোকা বোকা আর বোবা বোবা লাগছে। *এ' কর্ম হয় জানি গোপনে—একান্তে। এমন প্রকাশ্য মৈথুন দৃশ্য সারা জীবনেও দেখিনি!*

পরকীয়া তত্ত্ব কী, অমনি নিলাজ আর বাধাহীন হয়! তাকে কাজে রূপ দিতে লাগে গাঁজা আর আফিম! না হ'লে দেহবীণার ছড়ে টান দিলেও নাকি সুর উঠে না। শরীর আর মনকে তৃষ্ণাতুর করে তোলাও যায় না। হাতের কাছে যে নারীটা 'বউ হয়ে থাকে, তাকে তো 'পাওয়া' হয়ে গেছে! তাই কোন বাউল ভাগিয়ে নিয়ে আসে, অন্য কোন ঘরের বউ কী মেয়েকে। কিম্বা অর্থশালী কোন পরিবারের কন্যা কী বউ, পথে পা বাড়ায় তারা অজানার টানে, কুড়িয়ে নেয় শক্ত-সমর্থ রাখাল-বাগাল কী পাড়া-বেপাড়ার উঠতি ছোঁড়াকে, সায়া কী বুকের কাপড় সরিয়ে।

"হে কৃষ্ণ, হে বিশ্বমাতা, এ' লাজ তুমি আমাকে, কী দেখালে? এ' আমার প্রথম দর্শন বলে কী, অতটা বিকৃত লাগছে! ওরা কী বিকৃত হয়ে, বিক্রীত হয়ে যায়নি ওই কুরুচির হাটে? কোঁচড় ভরে তোমার আশীর্বাদ কুড়িয়ে নিতে গিয়ে, এ' কী কুড়াচ্ছে ওরা— প্রভু!" ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললাম, **কুশধ্বজ ঘাটের** সেই গোস্বামীপাদের; হাজার শতাব্দী প্রাচীন সাধনভূমিতে।

একটু একটু করে নামছে সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার। ঘটনার আকস্মিকতায়, মনেও ছিল না যে, নদীর ভেতরে কেউ থাকতে পারে। তবুও, নদীর গভীর থেকে ছায়াময়ী এক বৃদ্ধা, সন্ধ্যাদীপ হাতে উঠে এসে, আমার মুখ-চোখের দিকে চেয়ে, সন্ধারতি করে দীপ জ্বালিয়ে, নদীগর্ভে ফিরে যেতে যেতে মৃদুস্বরে বললো, " *রাধাও এমন করে কেঁদেছিলো। লাজলজ্জা বাধা সে মানেনি, রুচি অরুচির বালাই তার ছিলো না। ছিলো না বয়সের বেড়া। সব উড়িয়ে ভাসিয়ে দিয়ে সে শুধু বুঝেছিলো, শরীরের রক্ত-মাংসে যে আকুঞ্চন আর পিপাসা জাগে, তা শরীরের নয়—আমার-তোমার নয়, সেখানে আছে ঈশ্বরের ইচ্ছার দৈবী অনুরণন। তাঁর পিপাসাকে মিটাতেই হয়, এমনি করে—তরতাজা শরীর আর মন দিয়ে। কোন 'মানা' মানতে নাই।*

'ইচ্ছা' হয়ে যে অতিথি, শরীরের বেহালাটার ছড়ে কাঁপন তুললো—সেইই তো ইচ্ছাময়ীর আড়মোড়া ভাঙ্গা। তখন মড়ার মত পড়ে থাকতে নাই, সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে তাঁর ডাকে সাড়া দিতে হয়। কেউই বিকৃতকামা নয়—কামনার আড়ালে কমলাই দাঁড়িয়ে আছে, তাকে ধর্ 'খোকা,' তাকে ধর 'খোকা'।

লিংগ আর যোনীর নীচে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে সে 'মাগী'। লিংগ আর

যোনীর ঠোক্করে, তার ঘুমটা ছুটিয়ে দিয়ে, টেনে বের কর্ ওই গোপন গর্ত্ত থেকে। সহজ পথ এ'টা, সহজিয়া সাধনা এ'টা। প্রথম প্রথম মনে হয় বিকৃত ব্যাপার। প্রতিদিনের রুটিন মাফিক ওই কাজ, সত্যি সে কথা বলে কী? জাগাতে তাকে হবেই, তাই রমণের পথ ধরেই ওই প্রচেষ্টা।" শ্রীকৃষ্ণ তাই, রাধাকে সেই ফর্মুলা শেখাতে গিয়ে, রাধারমণ নাম নিয়েছে।"

হর্ণ দিয়ে ডাকছে বাস—"**দুবরাজপুর—সিউড়ী, লাষ্ট্ বাস—লাষ্ট্ বাস, এখুনি ছাড়বে!**" ছুটতে লাগলাম বাস স্ট্যান্ডের দিকে। না হলে সারারাত পড়ে থাকতে হবে ওই অজয়ের পাড়ে। ফিরে এলাম আমার ডেরা দুবরাজপুর কালীতলায়। গুম মেরে আছি দেখে, মা বললো—"মনে লিছে সারাটা দিন ত্যু কিছু খাবার পেছিস্ না। হাত পা ধুঁয়ে কিছু খেয়েঁ লে ক্যানে।"। বললাম, "এখন **'কারণ করবো'**—ভৈরবতলায় অন্ধকারে বসবো। আমাকে বিরক্ত কোরো না। মনের মধ্যে বড্ড কষ্ট হচ্ছে—তোমাকে পরে সব বলবো।"

বলতে গিয়ে ছলকে উঠছে চোখের জল। পাশে বসে চোখের দিকে গভীর দৃষ্টি মেলে সে বেটী বললো—"অজ্যয়ের পারা তোর চোক্ শুখাই যেছে রে বাপ্, দামু্যদরের পারা আলন্দে ভরাঁ চাই। তবেই কালীর বিট্টীখে ত্যু পাবিক্"—বলেই উঠে গিয়ে, এনে রাখলো কারণের বোতল! ঢক্ঢক্ করে ঢেলে দিলাম গলায় কাঁচা কাঁচা (raw) তার অর্দ্ধেকটা। ঝিমোতে লাগলাম বসে বসে ভৈরব-তলায়।

ধীরে ধীরে ভেসে উঠছে মায়ের গুরু লালবাবার (শংকর খ্যাপার) মুখ। সে যেন বসে আছে আমার সামনে। একদিকে কাঁচা মালের ঘোর, অন্য দিকে আজ যা দেখলাম তার বিস্ময়ের ঘোর, দুয়ে মিলে ঘোরতর যুদ্ধ মনের মধ্যে শুরু হয়েছে। যে কথা মাকে জিজ্ঞেস করতে সাহস হচ্ছে না, সে কথা ওই শালা বুড়োকে বলে, বাগিয়ে নিতে হবে নির্ভেজাল জবাবটা।

ঘোরের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি, আমার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বুড়ো যেন বলছে, "শিবকে শ্রীকৃষ্ণ একবার ঘাড়ধাক্কা দিয়ে, বের করে দিয়েছিলো বৃন্দাবন থেকে। কেন তা' কী জানিস্? শিব বুঝেছিলো—সে শরীর সাধনার (কায়া-সাধন), সবটা বুঝে ফেলেছে। লিংগটা খাড়া করে রেখে বলেছিলো, 'এটাই সব, জানো দুগ্গা, তুমি ওটার সেবা কর'। রাসযাত্রার সময় কেষ্টকে প্রম্পট (prompt) করার লোভ, তাই সামলাতে সে পারেনি।

চুপি চুপি সে ঢুকে পড়েছিলো রাসযাত্রার আসরে। শ্রীকৃষ্ণ খচে গিয়ে বলেছিলো, "আগে এখান থেকে বেরোও বলছি। তোমার দৌড় তো, ওই ন'টা রূপ পর্য্যন্ত। দশ নম্বরটাকে বুঝতে গেলে, আবার জন্ম নিয়ে আসতে হবে, ওই তোমার বউ-এরই পেট থেকে। ভাগো এক্ষুনি এখান থেকে। আমি যা, সেটা হবার চেষ্টা করো, জন্ম জন্ম সাধনা করে।

কমলা তোমার নয়, আমার। আর এখানে যা কিছু হচ্ছে, সে দেখার অধিকার তোমার নেই। যাও তোমার সেই ল্যাংটো কালীর কাছে। পড়ে থাকো তার পায়ের তলায়। তখনই কমলার পা আর কালীর পায়ে তফাৎ বুঝবে। বলি কী— বুকে তো পা নিয়েছ, মাথায় পা নিয়েছ কখনো? সেটা আগে শেখো—যাও এখান থেকে।"

পালিয়ে এসে পাঁচ-সাত ছিলিম গাঁজা আর ভাঁড় ভর্ত্তি ভাঙ্ খেয়ে, শিব ব্যাটা শুয়েছিল মনের দুঃখে ওই শ্মশানটায়। ঘুম ভাঙতেই, উঠে দেখে কালীর কোলে বসে আছে রাধাকৃষ্ণ, দুজনেই খাচ্ছে তার দুটো মাই। চোখ কচলে আবার সে দেখে, রাধাকৃষ্ণের পায়ের কাছে বসে আছে, আলুলায়িত-কেশা শ্যামা, শ্যামের সে প্রসন্ন মুখচ্ছবির দিকে সতৃষ্ণ চেয়ে।

খ্যাঁটরা মেরে কালী শিবকে বললো, "হাঁ করে দেখছ কী? এসো ওদের প্রণাম করো। অত গাঁজা তুমি খাও কেন? সোজা-বাঁকা কী কিছু বুঝো না? মা-বাবার ঘরে ছেলে-মেয়ে ঢুকে বুঝি? লজ্জাও করে না তোমার! বাবাকে প্রেম শিখাতে গেছলে না! আমি এখনো রাধাই হ'তে পারলাম না, হুঁ—তুমি কেষ্ট হবে! দিনরাত গাঁজা খেলে, ঘটে কি বুদ্ধি থাকে? যাও ভিক্ষা করে নিয়ে এসো, না হলে গিলবে কী শুনি! শুধু একটা মাত্র বাড়ীতেই যাবে। যা' পাবে, তা'তেই হবে।"

ষাঁড়ের পিঠে চড়ে শিব চললো ভিক্ষায়। একটা ঝোপড়ার উঠোনে দাঁড়িয়ে বলে উঠলো—"মাগো, ভিক্ষা দাও!" এক কিশোরী বৈষ্ণবী, নাকে বাহুতে আঁকা তার রসকলি। পোঁটলায় কিছু একটা এনে, তার ঝোলায় ভরে দিলো। মহানন্দে বাড়ী ফিরে সে ব্যাটা শিব, সেটা ঢেলে দিলো কালীর পায়ের কাছে। **চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠছে তার। অন্নের বদলে অন্য জিনিস, সাদা সাদা কুন্দকুসুম! কালীর দিকে তাকিয়েও সে বুঝতে পারছে না—কালী কোথায় উবে গেছে। এ' কে? এ' তো সেই কিশোরী! চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, সে শুভ্র কুন্দফুল। ত্রিশূল আর ডুগডুগি ছুঁড়ে ফেলে জাপটে ধরলো গাঁজাখোরটা তার পা।**

"স্মরগরল-খণ্ডনম্ মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্।"

:..........শ্রীগীতগোবিন্দম্

লজ্জায় নত মুখ শঙ্কর, শংকিত বুকে সেদিন তাকে বলে উঠেছিল, "মাগো, তোমার ও' ভুবন ভুলানো রূপ, আমি আজও আবিষ্কার করতে পারিনি। সন্তানের উপর করুণা করে, তুমি আমাকে ক্ষমা করো মা।" নওল কিশোরীর রূপ বদল করে, বুকে জাপটে ধরে সেই আতুর মহাকালকে বলেছিল মহাকালী :-

"ওঁতে উত্তরণে তোমার আর আমার অনেক দেরী আছে মহাকাল! তুমি

পরিশ্রান্ত, মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। এসো শুয়ে পড়ো চিৎ হয়ে, চিৎশক্তির প্রকাশভূমিকে আমি নামিয়ে আনবো তোমার লিঙ্গের শিখরভূমিতে বিপরীত-রাস্তায়—উত্তরণ ঘটবে তোমার আর আমার। রূপ নেবো আমি কমলায় আর তুমি কৃষ্ণে। তার জন্য চাই 'তাকে' জাগানো, তোমার আর আমার জননাঙ্গের তলায় ঘাপটি মেরে 'সে' শুয়ে আছে। সে বিশ্বমাতা কমলা—কৃষ্ণ-প্রেয়সী রাধা!"

তন্ময়তার ঘোর আমার কেটে গেছে মায়ের ডাকে। পালিয়েছে সেই বুড়ো শংকর ক্ষ্যাপা। "ভোগ লাগানো হয়েঁ যেছে, চল্ পসাদ পেয়েঁ শুয়েঁ পড়বিক্। সারাদিন কুথায় রোদে রোদে ঘুরেঁ বেড়াস্? চল, উঠ।" উঠে পড়লাম সাধুমায়ের ডাকে। বললাম, "খুব ভোরে ডেকে দিও মা। ওদেরকে যে আমার ধরতেই হবে! আমি বুঝতে চাই যে মা, আর সে জন্যই তো—আমার এই পথে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়ানো। মার পাশে বসে মাথা গোঁজ করে খেয়ে উঠে পড়লাম।

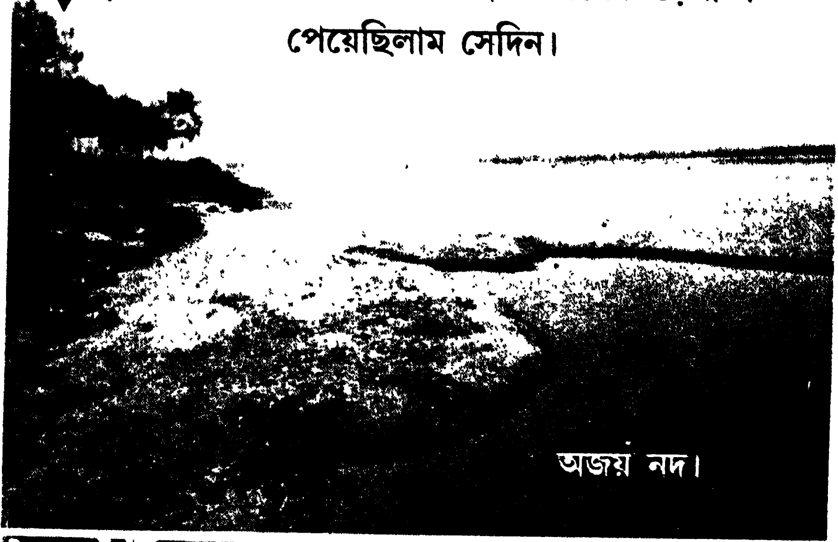
সকলের কথায় একই চিন্তার অনুরণন্ কেন? শাস্ত্রও কেন তাই বলে? কেন সমস্ত স্তোত্র-গীতে, একই ভাব একই ভাষা? মনে হচ্ছে আমি পাগল হয়ে যাব। নাকি, অনেক আগেই আমি পাগল আর **বিকৃত মস্তিষ্ক** হয়ে গেছি? কই দেখিতো, গণিতের দুরূহ অংকগুলো কষতে পারি কিনা? দুরূহ বীজগণিতের সমাধান করতে পারি কিনা? না, মাথাটা ঠিকই তো আছে! তবে! গুছিয়ে ফেললাম মিঠুর ক্লাস টেন্ এর গণিত। শুয়ে পড়লাম মন্দিরের খোলা বারান্দায়। ঠাণ্ডা মেঝেতে শুয়ে, ঘুম আসতে দেরী হলো না। ঘুমালো মনের উপর চাপ, অনেকখানি কমে যায়।

নিজেই জেগে উঠলাম ভোরের আজানে। পাশেই মুসলমান পাড়া, মসজিদে ভোরেব আজান বলছে—"সমস্ত আলস্য ত্যাগ করো। বিছানায় সুখনিদ্রা আর নয়। সামনে রূঢ় দিন বিস্তার করছে তার কঠোরতা। শক্ত দু'টো হাতকে কাজে লাগাতে, রাতের আলস্যকে ধুয়ে মুছে ফেলো। আল্লার দরবারে, আলস্য শয়তান ছাড়া আর ... বেশক্ হারাম হ্যায়।



... (স্মৃতিশিলা)— কেঁদুলী।

কুশেশ্বর ঘাট। এখানেই প্রদীপ হাতে ভগবতীর পদ্মাবতীর
কৃপা লাভ করেছিলাম । আত্মনিবেদনের গূঢ়বার্তা
পেয়েছিলাম সেদিন।



অজয় নদ।



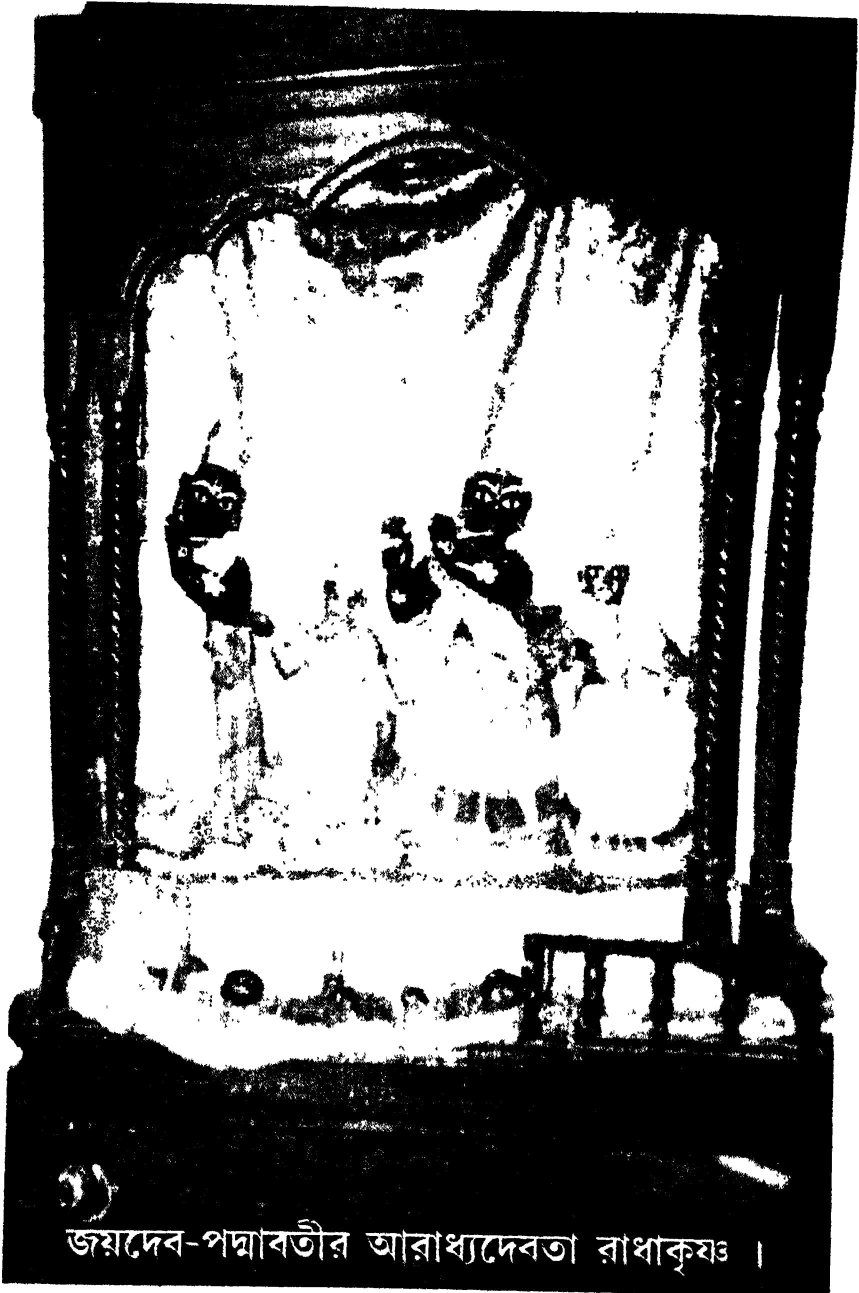
জয়দেব পদ্মাবতীর সিদ্ধাসন।



রাধাকৃষ্ণের প্রিয় তমালতরু



এখানেই দেখা হয়েছিল এ[illegible] গিরিকা-গিরিজার সাথে।



জয়দেব-পদ্মাবতীর আরাধ্যদেবতা রাধাকৃষ্ণ ।



জয়দেব-পদ্মাবতীর সিদ্ধাসন।

(গর্ভগৃহ—কুশেশ্বর ঘাট)

এখানেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ হাতে লিখে দিয়েছিলেন কবি জয়দেবের খাতায়—

"স্মরগরল-খণ্ডনম্ মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্।"

...........শ্রীগীতগোবিন্দম



ব্যাগ আর কমণ্ডলুটা নিয়ে উঠে পড়লাম। পাশে গুটিয়ে রাখলাম বিছানা। সাধুমাকে ডাক দিয়ে বললাম যে, "আমি কেঁদুলীর আর শ্যামরূপার গড়ের দিকে যাচ্ছি। সময় মতো ফিরবো। চিন্তা করো না। রাস্তায় চা খেয়ে নেব।"

দুর্গাপুর যাবার জন্য সারাদিনে মাত্র, দু' তিনটা গাড়ী পাওয়া যায়। অজয়ের বুকের উপর দিয়ে সেগুলো যায়, শ্যামরূপার জংগলকে বাঁয়ে রেখে। উঠে পড়লাম সে বাসে। সাধুদের বাসের মেঝেতে বসতে হয়, ওটা একটা অলিখিত নিয়ম। হারামে যেতে গেলে সীট দখল করা যাবে না।

পয়সা যারা দেবে, তারা সীট থাকতেই বা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাবে কেন? কন্ডাক্টার আমাকে মেঝেতে বসতে বলতে. বললাম—"কেন ভাই, সীট তো খালি। ওটা কী কারুর রিজার্ভ করা নাকি?" প্রশ্নের বহর দেখে একটু ঘাবড়ে গেল সে। শুধু বললো—না বাবা, সাধুরা সব পয়সা না দিয়ে, এমনি যায় তো! তাই ....।

—— "আমি হারামে যাবো না। যাই না-ও কোথাও। তুমি আমাকে শ্যামরূপার জংগলের পথে নামিয়ে দিও। নাও টাকা, টিকিট দাও।"

কথা না বাড়িয়ে সে আমাকে আড়াই টাকা ফেরৎ দিল। বুঝলাম ভাড়া সাড়ে সাত টাকা। টিকিট দিল না সে। ওটা নাকি ওখানকার প্রচলিত নিয়ম। সকাল বেলায় মেজাজ গরম করতে, ইচ্ছে করলো না। ও'পথে যাত্রী কম। অন্য পথে সবাই আসানসোল-দুর্গাপুর যায়। আমাদের সদ্‌গতি ওই একটা বাসই করে দেয়। মেজাজ খিঁচড়ে লাভ নাই। পৌঁছে গেলাম সেই কেঁদুলীতে ফের।

দুবরাজপুর থেকে মাত্র আধঘণ্টা সময় লাগে। আর একবার বাস ফেল করলে, লাগে বারো কী চৌদ্দ ঘণ্টা। মা-কালী কী রাধাকালী, তখন আর দেখে না। সারাদিন পড়ে থাকো, ওই অজয়ের পাড়ের হাট-চালায়। বাসটা কেন ছাড়ছে না বুঝতে পারছি না। জিজ্ঞেস করে জানলাম যে—যে বোল্ডার পাথরগুলোর উপর দিয়ে, বাস আর লরী পার হয়, সেগুলোর দু'পাঁচটা বসে গেছে, বালির লরীর চাপে। রাস্তাটা ভাল করে সারাই হবে, তবেই বাসটা যাবে।

সকালের প্রাতঃকৃত্য করা হয়নি। **কদম্বখণ্ডীর ঘাটের** কাছে, এক ফণিমনসা ঝোপের আড়ালে, বসে পড়লাম বাহ্যে-পেচ্ছাব করার জন্য। জল-শৌচ করে উঠে দেখলাম, কালকের সেই বোষ্টমী মুখে হাসি ছড়িয়ে, এগিয়ে আসছে আমার দিকে। গতকালের ঘটনাটা, যেন কোন ঘটনাই নয়—জল-ভাত!

যে কেউ, সাধনার যে পথই বেছে নিক না কেন, তাকে সজ্ঞানে ঘেন্না করতে নাই। সমালোচনাও করতে নাই—এটা মহাজন বাক্য। কোন কিছুর আগাপাশতলা আপন অন্তরে না জানলে, কখনই বলা যাবে না যে, সেটা ঠিক বা বেঠিক। সে ব্যাপারে একটা 'খোঁজ' চলতে পারে মাত্র, আর তা' নিয়ে যায় গভীর থেকে গভীরতর চিন্তার পথে। গাভীর মত শুধু হাম্বা হাম্বা করলে, হম্বড়া ভাব দেখানো হয়, সাপের ল্যাজ ধরে গর্ত্ত থেকে বের করবার মত সেটা একটা বৃথা চেষ্টা হয়।

—'ইদিক পানে কুথাকে যাবেন বাবা? সংগ লিতে পারি? আমরা আপ্যনাকে বিরক্ত করবোক্ না, শুধ্যুই সাধুসঙ্গ ক্যইরবক্ গ'।"

ছ্যাঁৎ করে উঠলো বুকের ভেতরটা। ওদের সাধুসঙ্গ যে বড্ড অসাধু অসাধু লাগে। চোখ আর মন আমার অভ্যস্ত নয়। তাই ইতঃস্তত করতে লাগলাম। পথে বেরুলে পথের সাথীকে সংগ দিতে হয়, সঙ্গ নিতেও হয়। সাধন পথের হাজার প্রণালীর ব্যাপার স্যাপার, কিছু কিছু জানতেও হয়।

দোটানায় পড়েছি দেখে, চলে যাচ্ছিল সে বাউলানী মেয়ে। সংগের সাথীটিকে দেখতে পাচ্ছি না আজ। তবে কী সে ত্যাগ করেছে একে? সে কী অন্য কাউকে পেয়ে গেছে? এ মেয়ে কী আর একজন নতুন সাধনসঙ্গী পেতে চায়! এদের সমাজে তো, অহরহ এইই হয়! তবুও মনের বিরক্তির ভাব অনেক কষ্টে দমন করে বললাম :-

----- "মা, যাওয়া তো কোথাও ঠিক করিনি। এদিকে অনেক কিছু দেখার বাকী আছে, জানিও না কিছু। কেউ সাথে থাকলে তো ভালই হয়। জেনে বুঝে নিতে পারা যায় সহজে। তবে শ্যামরূপার জংগলে যাবার খুব ইচ্ছে হচ্ছে। দেখবো **ইছাই ঘোষ** আর **লক্ষণ সেনের দেউল, গড়— জঙ্গল,** প্রণাম করবো **শ্যামরূপাকে**।"

——" চলুন বাবা, আমরাও যাবো। অনেক দিন ওদিকে যাওয়া হয়নি। ও' দিকেরই মেয়ে আমি। পথঘাট সব চিনি। হাঁটতে হবে আমাদেরকে অনেকটাই পথ।"

বীরভূমের কথার টান থাকে, বেশীর ভাগ সময় তার কথায়। ঝরঝরে বাংলায় তার কথা শুনে অবাক হলাম এখন। লুফে নিলাম তার কথাগুলো। বললাম, "বাসে গিয়ে উঠে বসো তোমরা, আমি আসছি ওই চা-ও'লাকে তিনটে চা বলে।" বললাম তো বটে, কিন্তু সাথীটিকে তো দেখছি না। আছে হয়তো ওদিকে কোথাও।

ঝোলা হাতড়ে দেখলাম শ' দেড়েক টাকা আছে। ক্যামেরায় ভরে নিয়েছি একটা

নতুন রীল। সারাদিন চলে যাবে। তবুও মনে হল আরও একটা রীল কিনে নিয়ে রেখে দিই কাছে, যদি দরকার হয় তবে কাজে লাগবে। কিনে ফেললাম আরও একটা নতুন রীল। দাম নিল চল্লিশ টাকা। তিন জনের মত খাবারও নিলাম। বাসের মধ্যে উঠে দেখি, বসে আছে সে বোষ্টমী আর তার ছোক্‌রা সাধন সাথী।

বড্ড নিষ্পাপ মনে হ'ল এখন দু'জনকে। মনে নাই তাদের গতকালের, কোন অনুশোচনার কলংকরেখা। চা-ও'লা লোকটা একটা শাল পাতায় তিনটা চপ, আর তিন গ্লাস চা নিয়ে হাজির। দাম মিটিয়ে দিলাম তার। নিঃশব্দে চা খেয়ে, এক জায়গায় রাখলাম তিনটা গ্লাস। গাড়ী হর্ণ দিতে শুরু করেছে। কণ্ডাক্‌টারকে ডেকে বললাম, "ওঁরাও আমার সঙ্গী। কত ভাড়া দিতে হবে আর?"

—— "কি আর নেবো, তিন টাকা দিন। আপনি কোথায় থাকেন বাবা? আপনার কোন আশ্রম-টাশ্রম এখানে আছে নাকি?"

—— " না, আমি গৃহী মানুষ। আমার কোন আশ্রম নাই। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সবই আছে। যেখানে আশ্রম, সেখানেই যত গোলমাল। আমি চিরকালই কলকাতায় থাকি। দীক্ষার একটা আলাদা বস্ত্র থাকে, সেটাই আমি পরি। এই সব তীর্থভূমিতে তাইই বোধ হয় মানানসই হয়।"

—— "সাধুরা এত চোর আর মিথ্যাবাদী হয় কেন বাবা?"

—— "কে বললো সাধুরা চোর? 'সাধু' কথাটার মধ্যে কী চুরি আর মিথ্যার গন্ধ পাচ্ছো? তোমরা যদি বল যে পোষাকটাই সাধু, তবে বলবো পোষাক চুরি করে না, বা মিথ্যা কথা বলে না। ওটাকে পরার অধিকার যে লোকটা পায়নি, সেইই পরে ফেলেছে পোষাকটা। তার ব্যক্তি জীবনে খোঁজ করলে দেখবে, সে আগে থেকে চোর লম্পট আর মিথ্যাবাদী ছিলই। তোমরা যদি তার কাছে যাও, তাবিজ-কবচ আনতে কী রোগ সারাতে, তবে সেই বা তোমাদের ঠকাবে না কেন? বোকা তো তোমরাই।"

"তা'র চুরি করা আর মিথ্যা বলবার রাস্তা তোমরাই সহজ করে দিচ্ছো। দোষটা কার! বাসভরা সব যাত্রী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে, শুনছে আমার কথাগুলো। মাথা নাড়ছে সমর্থনের ভঙ্গীতে, তাদের কেউ কেউ। একজন আবার ফুট কাটলো—"তা' হলে বুঝবো কী করে, কে সাধু—কে চোর?"

—— "পৃথিবীতে অনেক কাজ তোমার আছে। ওদের চিনতে তোমাকে কে মাথার দিব্যি দিয়েছে? চোর বা সাধু না হয়, না ঘাঁটলে। বাস আর লরী দুটোই কিন্তু গাড়ী। বাসকে যেমন তুমি লরী বলবে না, বা লরীকে বলবে না বাস, তেমনি দেখতে দেখতে বুঝতে পারা যায় ঠিক বা বেঠিককে। শুধু চাই নিরন্তর খোঁজ—সেখানে এতটুকুও আল্‌সেমি থাকলে অবশ্যই ঠকবে"।

—— "তাহলে কী সংসারের সব কাজ ফেলে রেখে সাধু খুঁজবো?"

—— "ঠিক তাই। তোমার দরকার যদি থাকে, খুঁজতে তোমাকে হবেই। তবে এটা জেনো যে, সাধুদের সবাই চোর নয়।"

—— "সংসার তো লাটে উঠবে তাহলে!"

—— "ওদের কাছে তুমিই বা যেতে চাইছো কেন? তোমার কী কোন তাবিজ কবচ দরকার? হারামে কোন কিছু পেতে চাও বুঝি তুমি? আর তাছাড়া কাজ হবে কী হবে না, সেটা না জেনে পয়সাই বা তার হাতে কোন্ আক্কেলে তুলে দেবে? যে কাজ তাকে দিয়ে করাতে চাইছো, সে আদৌ সে কাজটা জানে কিনা, সেটা কী আগে ঠিকভাবে জেনেছো? নাকি শুধু তার গেরুয়াটা চিনেছ? সব কাজের জন্য একজন মাষ্টার লাগে।

তোমাকে দেখে মনে হয়, তুমি অনেকটাই লেখাপড়া করেছ। বুদ্ধিমান মানুষ তুমি। তুমি কী এই বাসটা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারো? প্রতিদিন বাস চালানো দেখ, বাসে চড়ো, অথচ নিজে তা' করতে পারো না।" কেন বলতে পারো? কারণ হলো এটাই যে, সব শাস্ত্রকে হাতে নাতে শিখতে হয়; একজন গুরু বা মাষ্টারের কাছে। শুধু দেখলেই কোন কিছু, ঠিক করে শেখা যায় না। একটা ধারণা হয় মাত্র। ঠিক, সাধু চেনার মতো। চুল দাড়ি আর গেরুয়া দেখে হামলে পড়লে, সে ব্যাটা তোমার পকেট কাটতে ব্যস্ত থাকবে। আর তুমিও ফতুর হ'তে থাকবে।"

তোৎলাতে লাগলো এবার সেই ছেলেটা। গাড়ীটা চলতে শুরু করেছে। সবাই আমাকে আর ওই দুই বাউলকে দেখছে। শ্যামরূপার জংঙ্গল ষ্টপে এসে গেল বাসটা। নেমে পড়বার আগে ছেলেটাকে বললাম, "আমার কথাগুলো সময় পেলে, তুমি ভেবে দেখো। যে কাজে যাচ্ছো, সেটা হয়তো আজ হয়ে যাবে তোমার।"

ইচ্ছা করেই বললাম তা'কে ওই কথাগুলো। মনে হয় বহু জায়গায় সে ঘা খেয়েছে। খানিকটা সাহস দিয়ে, তার ভেতরের সত্ত্বাকে জাগাবার চেষ্টা করলাম মাত্র। এত সহজে যদি সব কিছু জেগে উঠতো, তবে এত কষ্ট আর পৃথিবীতে থাকতো না। সবাই কালী-কৃষ্ণকে জাগিয়ে ফেলতো। এত পথ আর মতের জন্মও হ'তো না। ***যে যার নিজের সুযোগ আর সুবিধা ঠিক রেখে দিতে, ধর্মের ব্যাখ্যা করেছে সেই মতই। ধর্মের নামে ছাগল আর মুরগী পুষবার মত, সময় আর সুযোগ মত—যুতসই করে খাওয়া যাবে সেগুলোকে।***

চলতে চলতে ডুগিতে বোল্ উঠতে শুরু করেছে—গুঁ-গুঁ-গুঁউ, একতারাতে বাজছে টটং-টং, খঞ্জনীতে বাজছে ছন্ ছন্ ছনাৎ ছনাৎ। শ্যামরূপার জঙ্গলের বনপথে হাঁটতে গিয়ে, বার বার মনে হয়েছে, আমি কী হাজার হাজার বছর আগের; বৃন্দাবনের পথে হাঁটছি! সে প্রেমের আবেশ, সেই পরিবেশকে যেন ঘাড় ধরে টেনে আনছে, সে

বোষ্টমী আর বোষ্টম।

আহা-রে, ঈশ্বর গলা দিয়েছে বটে ওদের! বড় ঈর্ষা হয়, সে গলায় গান শুনলে। **পরিবেশ এমনি করে পরিবেশন করে, প্রাণের আকুতি কী উল্লাস!** আসুন, শুনি সে গান, সে সুর-মূর্ছনা—হিয়ায় মোচড় মারে যে গান আর সুর!

"ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-
কোমল-মলয়-সমীরে।
মধুকর-নিকর-করম্বিত-
কোকিল কূজিত কুঞ্জকুটিরে।।

বিরহতি হরিরিহ সরস-বসন্তে,
নৃত্যতি যুবতি জনেন সমং
সখি, বিরহী-জনস্য দুরন্তে।।

.......(ধ্রুবক = ধূয়া)"

.....শ্রীগীতগোবিন্দম্ (১ম সর্গ—পদ—১)

বাংলা মানে ঃ (বসন্তকাল এখন) সখি, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, লবঙ্গলতা নেশাধরা সুরভি ছড়াচ্ছে, কুঞ্জকুটিরে মৌমাছি আর ভোমরারা গান করছে আর কোকিলেরা কুহু ডাকছে। সবাই চারপাশে বসন্তে বিরহকাতর। আর হরি (কৃষ্ণ) কিনা এ' সময় প্রেম করছে, ভাগ্যবতী অন্য কোন যুবতীর সাথে! (এটাতো ঠিক না!)

..........(আমার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ)

(The spring veils in the nature oh dear, around thy bushy hut. The gale snatches and scatters the fragrance of cloves, the drone, bees and cuckoos are in tune with; and all are spring sick now. At this juncture, thou oh ill-fated, thy Krishna is in love with other milk-damsels! This is not fair and acceptable! .....(My translation)

"উন্মাদ-মদন-মনোরথ-
পথিকবধূজন-জনিত-বিলাপে,
অলিকুল-সঙ্কুল-কুসুম-সমূহ,
নিরাকুল-বকুল-কলাপে;

বিরহতি হরিরিহ সরস-বসন্তে,
নৃত্যতি যুবতি জনেন সমং
সখি, বিরহী-জনস্য দুরন্তে।। .... (ধূয়া=Repetition)

.....শ্রীগীতগোবিন্দম্ (১ম সর্গ-পদ—২)

বাংলা মানে ঃ [কামাতুরা পথিকবধূরা যাদের স্বামী বিদেশে থাকে, প্রেমের জ্বালায় তারা ছটফট করছে। বকুল কুমারীর কানে কানে ভোমরারা গুণগুনিয়ে প্রেম নিবেদন করছে। 'হায় অভাগি', আর তোমার হরি কিনা, এ সময় অন্য গোয়ালা যুবতীদের সাথে; প্রেমে ভেসে যাচ্ছে!] ..... (আমার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ)

(Estranged and Licentious they are, the grass-widows. The pangs of love burn them alive. And the drones kiss the Bakul petals and whisper to merry-go-with. And at this juncture, thou oh ill fated dear, the Krishna—thy love, is on with other Cow-keepers' damsels!) ..... (My translation)

"পীনপয়োধর-ভার ভরেণ
হরিম্ পরিরভ্য সরাগং,
গোপবধূরনুগায়তি
কাচিদুদঞ্চিত-পঞ্চম-রাগম্, ।।২।।

হরিরিহ মুগ্ধবধূনিকরে
বিলাসিনি বিলসতি কেলিপরে। ধ্রুবম্।" (ধূয়া = Repetition)

........শ্রীগীতগোবিন্দম্ ১ম সর্গ—গীতম—৪/২

বাংলা মানে ঃ সখি, দেখতে পাচ্ছি ওই গয়লা বউ-তার উঁচু উঁচু স্তন দুটো দিয়ে, শ্রীকৃষ্ণকে জাপটে ধরে গলা ছেড়ে মাতাল হয়েছে গানে গানে। এমনি করে তো, তোমার সে প্রেমিক কৃষ্ণ, প্রেমমুগ্ধা আতুরা গয়লা-বউদের সাথে মজা লুটছে!

...... (আমার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ)

(Oh, dear dear—look there yon, the milkman's daughter embraces thy Krishna, with her plumpy bulky breasts and in tune with madding Songs—tosses and turns over. And the Krishna—thy love, thus quenches His lust there.) .....(My free translation)

"প্রথম-সমাগম-লজ্জিতয়া—

পটু-চাটু-শতৈরনুকূলং,
মৃদু-মধুর-স্মিত-ভাষিতয়া
শিথিলীকৃত-জঘন-দুকূলম্।

............সর্গ-৬/২

সখি হে, কেশিমথনমুদারম্,
রমন ময়াসহ মদন মনোরথ,
ভাবিতয়া সবিকারম্।" ধ্রুবম্। (ধূয়া = Repetition):

.........শ্রীগীতগোবিন্দম্।

বাংলা মানে ঃ (প্রথম প্রথম রমণ করতে এসে, যে আমার লজ্জাকে দীর্ণ করেছিল, আমার কোমরের কাপড় খুলে নিয়ে, শত শত নারীকে যে তৃপ্তি দিয়েছে, উদ্দাম রমণ করে করে, মিষ্টি মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে, কেশীকে হত্যা করেছে যে লোক— সেই শ্রীকৃষ্ণকে ডেকে সখী বলোনা, সে এসে আমাকেও উদ্দাম রমণ করুক।)

...... (আমার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ)

(At the first intercourse with me, He tore out my blushness by snatching the skirt, and made me nacked, and thus He did so with hundreds of milk-damsels, by whispering alluring cacklings to their ears. Oh dear, you go and say Him come, to fuck and make me calm.) ..... (My translation)

পাগল করে তুলছে ওরা গানে গানে। মত্ত মাতন, লুকিয়ে থাকা পরিপূর্ণ সে লাস্য, কথার আর ভাষার গন্থীতে গ্রন্থীতে সরসতায় ভরা, মূর্ত্তি পরিগ্রহ করছে মনের ভেতর। একটা দুটো করে যেন হাজারে হাজারে লাখে লাখে, উলঙ্গ গোপবালারা উদ্দাম রতি খেলায় মেতে উঠছে। দুলে উঠছে তাদের হাজার হাজার সুউচ্চ স্তনভার। হারিয়ে গেছে সব ম্লেচ্ছতা, যৌনতা, বিকৃত-বিলাস।

একটু একটু করে বিকিয়ে যেতে থাকলাম, বুঁদ হয়ে গিয়ে গানে গানে। মনের আংটায় আঁকশী গলিয়ে, সে মেয়ে যেন সমূলে উপড়ে নিতে চাইছে এই মনটাকে। তার হাতের খঞ্জনীকে মনে হচ্ছে ক্ষুরধার খড়্গ। আর ডুগিটাকে মনে হচ্ছে একটা থালা, যেখানে শুয়ে আছে কেটে নেওয়া দুটো হৃদপিণ্ড। ধুক্‌ধুক্ করে নড়ছে যেন সেগুলো, চারপাশে তার সাজানো কুন্দফুলের সম্ভার রক্তলিপ্ত।

বোবা হয়ে গেছি ওই উম্মাদিনীর দিকে চেয়ে। এ' কে, আমাকে আজ সংগ

দিয়েছে! হে রাধামাধব, কা'কে তুমি আজ ভিড়িয়ে দিয়েছ আমার সাথে। ওদের কুরুচিপূর্ণ জীবনকে, আমি মনে মনে অপমান করেছিলাম গতকাল। খালি বাঁধহারা যৌন-লালসার তৃপ্তির জন্য, ওরা ভেক্ নিয়েছে বাউলের, এই ছিল আমার অর্বাচীন বিচার। বুঝতে পারিনি, অমন করে ওরা হাজার যুগের ওপারের বৃন্দাবনকে, এমনি করে টেনে আনবে, শ্যামরূপার গড় জংগলের পথে প্রান্তরে; চৈত্রদগ্ধ দুপুরের ছায়াকাঁপা শালবীথিতে!

করযোড়ে প্রণতঃ হলাম তার পায়ের কাছে। "মাগো, আমি তোকে বুঝতে পারিনি। আমাকে ক্ষমা করে দে মা। তোদের এই জীবনকে, আমি ঘেন্না করেছিলাম মনে মনে। দে তোর পা দু'টো, কেমন করে উড়িয়ে দিলি আমার ভেতরের ঘেন্না, ভরে দিলি মনটাকে—ওই সুধাসিক্ত রভসবিলাসে? কই, আমিতো এই শরীর দিয়ে এখন কোন শরীরকে উপভোগ করিনি! তবে কী ভাবে ওই বিলাস-বন্যায় ভাসিয়ে দিলি তুই আমাকে? মাগো, আমাকে দে মা শিখিয়ে দে, কেমন করে তাঁকে ডাকতে হয়! কেমন করে একান্তে তাকে পেতে হয়!

'এ' আমি কী দেখলাম তোর হাতে? বল্ মা, হৃদয়কে কী এমনি করে উপড়ে নিয়ে, থালায় সাজিয়ে কুন্দকুসুমে, এগিয়ে যেতে হয় তাঁকে পূজা দিতে? সেখানে কী তবে, শরীর শুধু খোলস মাত্র! এ বিশ্বচরাচরে তবে কী, সম্পর্ক বলে কিছু নাই? ছেলে-মেয়ে, বাবা-মা, ভাই-বোন—সম্পর্কটা তবে কী-ই-ই?"

—লেখাপড়া আমি বেশী করিনি বাবা। *আমি বুঝিনি ও'সব। শুধু জানি, কে যেন আমার গানে ভর করে। আমাকে চরমভাবে সে আলুথালু করে দেয়। এ' শরীরে একদিন অফুরন্ত ক্ষুধা ছিল, যা' সব মেয়েরেই থাকে। আজ সে পরিমান ক্ষুধা নাই—আছে তাঁর প্রয়োজনের তাগিদ— তাই বেছে নিয়েছি ওকে—শরীরের ভিতর অশরীরী যে মহাজন লুকিয়ে আছে, সে যে এ' জন্মের দেনাগুলোর উশুল চায়। দেবঋণ, জন্মের ঋণ শোধ করে চলেছি এমনি করে। শরীর দিয়ে তাকে পূজা করি, শবরীর মত তার আসবার পথ চেয়ে দিনও গুণি।*

বাবা, আপনাকে দেখে আমার, বড় আপনজন বলে মনে হয়েছে। তাই সঙ্গ নিয়েছি আপনার। পায়ের কাছে বসে এ'ভাবে, আমাকে অপরাধী করবেন না। *আপনি যা দেখেছেন, মাঝে মাঝে আমিও তাই দেখি, এ' বাউলও তাই দেখে। জানি না, কী এর মানে। আপনি যা' বললেন, হয়তো তাই-ই সত্য। দু'টো হৃদয়কে উপড়ে নিয়ে নৈবেদ্য সাজিয়ে, হয়তো তার কাছে যেতে হয় পূজা দিতে। এ' শরীর মন আর হৃদয়, সবটাই হয়তো তাকে দিতে হয়—জানি না!"*

দু' হাত ধরে টেনে তুললো আমাকে, ছোকরা বাউল গিরিজা। গিরিকা তার

বাউলানীর নাম। এই নামই ওদের ছিল কিনা জানি না। হয়তো দীক্ষা নামও হ'তে পারে। আমি যেমন এই সোমানন্দ অবধূত। কেউই আর কোন কথা বলছি না, শুধু অলস পায়ে হেঁটে চলেছি।

মাঝে মাঝে দমকা মেরে ছুটে আসছে বসন্ত-বাতাস, গাছের গজানো নতুন পাতাগুলোকে নাড়িয়ে দিয়ে। ঝরে গেছে শিমূলের সব পাতা। লাল লাল তার ফুলের কোরকে, বাঁকানো ছোট্ট ঠোঁট ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে মধু খুঁজে চলেছে মৌটুসী-বউ। ওরা যে বসন্তের দূত!

বুনো মাধবীলতা জাপটে ধরে বেড়ে উঠেছে গাছে গাছে। সুগন্ধী ফুলে ফুলে ভরিয়ে দিয়েছে, সে সমস্ত বনতল। যাকে জাপটে ধরে সে বেড়ে উঠেছে, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। থোকায় থোকায় ঝুলে আছে, আমের মুকুলের বাহারী শীষ, বহেড়ার শীষ। বসন্তের ফিকে নীল আকাশ যেন, তাদের কোল পেতে দিয়ে আদরে দোলাচ্ছে, দোদুল ছন্দে—ছায়ায় মায়ায়।

ছন্নছাড়া সেই বনের মধ্য দিয়ে কাঠুরেদের, ঔষধি কুড়ানো লোকেদের, মধু সংগ্রহকারীদের চলার পথ। অনন্তমূল, আলকুশী (হনুমান শীম), শতমূলী গাছ ছড়িয়ে আছে, পায়ে চলার পথের ধারে ধারে। প্রকৃতি অকৃপণ ভাবে যেন সেগুলোকে সাজিয়ে রেখেছে থরে থরে।

কত শত অচেনা পাখীর কিচির মিচির, ভোমরার-মৌমাছির গুণগুণ গান, যেন সুরের সিম্ফনি তুলছে দমকে দমকে। ভ্রমরীর পেছনে ছুটে চলেছে ভ্রমর, দৌড়বাজি খেলতে খেলতে। সে যেন খুলতে চায়, দেখতে চায় তার যোনিকন্দর। কেউ কেউ আবার যোনিকন্দরে জননদণ্ড সংলগ্ন করে, মুখবদ্ধ হয়ে উড়ে উড়ে চলেছে কোন্ এক অজানার সন্ধানে।

ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছিরা উড়ে চলেছে, কোথায় কোন নিরুদ্দেশ আশ্রয়ের খোঁজে। তাদের মহারাণীকে নিয়ে—বর্ষার আগে তার রাণীমহল (মৌচাক) বানিয়ে ফেলবে বলে। বহেড়ার মঞ্জরী থেকে ক্ষরিত হচ্ছে মধু, পায়ের নীচের শুকনো ঝরাপাতাকে ভিজিয়ে দিচ্ছে। গুলগুলে ফুলের পাতাঝরা গাছগুলো, ভরে আছে ফুলে ফুলে।

জবাফুলের মত আকারে বড় বড়, তাদের হলুদ হলুদ চেহারা। কোকিল ডেকে উঠছে বনান্তরালে মাঝে মাঝে। তিতিরের তিরতিরে আওয়াজ, যেন তার লুকিয়ে পড়া বৌকে খুঁজে চলেছে পত্রান্তরালে। কাঞ্চনের কাঞ্চননিভ কুসুমসম্ভার, যেন ডেকে ডেকে বলছে— "হে রাধামাধব, তোমাদের উৎসবের দিন এলো। এসো রতিরাগে, গন্ধে-পরিমলে তোমাদেরকে সাজিয়ে দিই!"

গাছের তলায় তলায় কাঁপছে রৌদ্রছায়া। প্রথম অপটু শৃঙ্গারে, যেমন প্রেমিক প্রেমিকা থরথর করে কেঁপে কেঁপে উঠে, ঠিক তেমনই যেন চঞ্চল ওরা। সাঁওতাল ছেলেমেয়ে-বউরা, কুড়িয়ে চলেছে মহুয়া ফুল। গায়ে ঢলে ঢলে পড়ছে একে অপরের, হাসির বন্যায় ভেসে ভেসে। নিরাবরণ সাঁওতালী কন্যার বুক, আমার এ' বৃদ্ধ শরীরটাতেও কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছে।

ওই উঠন্ত-ফুটন্ত বুকের কোরকে মুখ রেখে, নির্জনে এই বয়সে প্রেম করতে মন চাইলেও, প্রেম করা আর হয়ে উঠেনি কোন দিন আশভরে। শুধু ছুঁকছুঁকে নোলা বাড়িয়ে দু'এক জনকে চেটেছি মাত্র। তাই আজও মনের এই গহীন ভূমিতে একটা কথাই গুঞ্জরিত হয়, মহুয়ার মিশেল থাকলে। আর তা' হ'লো—"প্রেম করা সই আমার হোল না......।"

মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের, জবরদস্ত সেকশান্ অফিসার (Section officer) আমি। কেত্তন গাইতে পারি না গলা ফাটিয়ে— লজ্জা করে। তাই ইস্কন মন্দিরের স্যাঁতা-রঙ বোষ্টম-বোষ্টমীদের মত মনে মনে কেত্তন করি ইংরাজীতে, কমণ্ডলুটা বাজিয়ে নির্জনে :—

"Oh, dear dear!
Still I'm not aglint with,
The devotion—the love eternal
of her! and none to offer!

.... *Somananda Abadhut*

পথশ্রমে ক্লান্ত আমরা। বসে পড়লাম এক দীর্ঘ শালগাছের গোড়ায়, ওদের থেকে একটু দূরত্ব রেখে। ওখানে রয়েছে শত শত পোড়ানো মাটির ঘোড়া। মাঝে মাঝে কেউ হয়তো সেখানে মানত করে—পূজা দেয়, প্রদীপ জ্বলায়। তবে কী বনবিবির পূজা হয়? নাকি শ্যামরূপার? আমি জানি না শ্যামরূপা কোন্ দেবী, কীভাবে অমন নাম হ'লো তার! দেবতার যে কোন একটা রূপকে আঁকড়ে ধরে, এমনি করে চলে আসছে—তার পূজা আর সাধনা, যুগ যুগ ধরে। সে দেবতা, ঘুমায় কী জাগে— বুঝি না! বড় আশা জাগে তাকে জ্যান্ত ধরার—কিন্তু হয় কই?

বড্ড তেষ্টা পেয়েছে হাঁটতে হাঁটতে। তা'ও প্রায় ঘণ্টা দুই হাঁটা হয়ে গেল। কমণ্ডলুর জল ওদের দিলাম আগে, তারপর আমি খেলাম খানিকটা, রেখে দিলাম বাকীটুকু। বনের এই পথের সারাটায় ছায়া পাওয়া যায়, ফলমূল পাওয়া যায়, কিন্তু জল বড় অসুলভ। সমস্ত নালা-খানা-খন্দ শুকিয়ে কাঠ। বর্ষায় তাদের কাউকে কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়। অজয় তো নিজেই এখন তেষ্টায় জল চাইছে। উপবাসী সে, ক্লিষ্ট

তার গৈরিক গৈরিক চেহারা।

বুকে তার ধু ধু বালিয়াড়ী। গরম বাতাসের সাথে, সেখানে গরম গরম বালি উড়ে। ওই গরম বালির দিগন্তজোড়া বিস্তারের উপর, যখন ইথারের পাখনা কাঁপে বাষ্পের ধাক্কা খেয়ে, দূর থেকে মনে হয় যেন; জল টলটল করছে ওখানে। ছুটে চলে মানুষ, গরু, ছাগল, পাখীর দল।

ছুটতে ছুটতে, উড়তে উড়তে তেষ্টা বাড়ে, শরীর আর পাখা ক্লান্ত হয়, জলরেখা যায় পিছিয়ে পিছিয়ে। বালির উপর শুয়ে পড়ে, মুখ ঘসতে ঘসতে নাকে-মুখে রক্ত ঝরে, মারা পড়ে ওরা প্রায়শঃই। বালি খুঁড়তে আসা, শত শত লরীর লোকেরা দেখতে পায়, এমনি কত মৃত মানুষ, পশু আর পাখীদের।

ওদের দিকে তাকালাম এখন একবার। গভীর অভিনিবেশে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম তাদেরকে। কোথাও খুঁজে পেলাম না তাদের সেই অবাধ যৌনতার কলংকরেখা। বড় নিষ্পাপ মনে হলো ও' দুটো শরীরকে। তবে কি প্রতিকূলতার আগুনে পুড়ে পুড়ে, আর চোখের জলে ধুয়ে মুছে গেছে সব!

ওই নারী শরীরটায় তো বাসা বেঁধে থাকে, মহাশক্তি-মহাপ্রকৃতি। যে কিনা পুরুষকে গিলে ফেলে, জগৎ সৃষ্টির খাতিরে। তারই গর্ভ থেকেই আবার জন্ম নেয়, সচ্চিদানন্দ জ্যোতির্ময় পুরুষ। সেই পুরুষকেই আবার মোহে চুবিয়ে রাখতে, তৎপর হয় সে। কিন্তু যে চৈতন্যময়—পুরুষোত্তম, সব মোহাচ্ছন্নতাকে সে পাশ কাটিয়ে যায়। ধরা পড়ে না তার কাছে সে কখনও। মহাশক্তি হেরে গিয়ে, রাধা হয়ে যুগ হতে যুগান্তরে কাঁদে। রাধাকৃষ্ণের লীলাও তাই!

বিচিত্র খেলা সে বেটীর—এ' বেটীও (গিরিকা) কী তাই? সরে এসে বাঁ পাশে বসে থাকা সে বেটীকে জাপটে ধরে, গভীর এক চুম্বন এঁকে দিলাম হঠাৎই, তার ব্রহ্মতালুতে। ঘটনার আকস্মিকতায়, আমার বুকে মুখ লুকিয়ে, নীরবে কাঁদতে লাগল সে। ডান পাশে বসে থাকা ছোকরা বাউলের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললাম, "তোমাদের সমাজে তো, বড্ড ছাড়াছাড়ির ব্যাপার থাকে, কণ্ঠী বদলের ব্যাপার স্যাপার থাকে। তোমরা কেউ কাউকে কোন দিন ছেড়ো না।"

"পথে যখন বেরিয়েছ, একে অপরের হাত ধরে— আমৃত্যু ধরে রাখতে চেষ্টা কোরো নিজেদেরকে। ***যদি বিশ্বাস করো যে, এই শরীরের গোপন কুঠরীতে রাধাকৃষ্ণ বাস করেন, তবে তো তাঁরা অবশ্যই ক্ষুন্ন হবেন, একে অপরকে ছেড়ে গেলে! রাধা কী কৃষ্ণ, কেউ কাউকে কী কখনও ছেড়ে থাকেন?"***

উঠে পড়লাম আমরা সেখান থেকে। আরও খানিকটা যাবার পর দেখলাম,

বিরাট দিগন্ত বিস্তৃত শস্যের ডালি নিয়ে শুয়ে আছে এক ধানক্ষেত। গিরিকা বললো, "মাঠ পেরুলেই পাবো শ্যামরূপার মন্দির, ইছাই ঘোষের দেউল। এখন সে সব কিছুই নাই, সব ধ্বংস হয়ে গেছে।"

ভয় পেয়ে গেলাম ওই দিগন্তরেখা ছোঁয়া মাঠ দেখে। এতটা পথ গিয়ে আবার ফিরতে হবে, রাতও হয়ে যেতে পারে। তবুও এতটা পথ এসেছি যখন, আরও এগিয়ে যেতেই হবে। ছোটবেলায় ইতিহাস, ভূগোল যতটুকু পড়েছি, আবছা আবছা মনে আছে তার। সেই ইতিহাসের ইতিহাস খুঁজে, সময় নষ্ট করতে যাইনি আমি।

তবুও পোড়ো মন্দিরের ইতিহাসের কোঁচড় থেকে, কুড়িয়ে নিতে হয়, সত্য কী আধা সত্যকে—লোককথা আর লোকগাথাকে। যুগ যুগ ধরে কথার আর কল্পনার সূত্রে গ্রথিত যে কাহিনী—তাকে সাদরে গ্রহণ করতে হয়, সম্মান জানাতে হয়—অপমান করতে নাই। নিজেকে অনেক অনেক বিচক্ষণ ভাবতেও নাই।

ছাই উড়িয়ে অমূল্য কোন রতনকে খুঁজবার প্রয়াস চালাতে, নাই কোন বাধা। যাকে ধর্মীয় নোংরামী নাম দিয়েছি, তারও ভেতর থেকেই উঁকি মারে সে বেটী রাধা। লোভে নয়—লালসায় নয়, সে পথকে আঁকড়ে ধরে, এগিয়ে চলতে হয়—প্রণাম করতে হয় সেই পথকে, আর যুগ হতে যুগান্তরে চলা; সে পথের মহাপথিকদেরকে।

ইছাই ঘোষের দেউল। গ্রামটার নাম ছিল কাঁকসা। এখানেই শ্যামরূপার গড় ছিল, তার দুর্গ বা ফোর্ট। এখনকার মত ছিল না তার হতশ্রী অবস্থা। নাই সেই ঘন শালবনের সূর্য্য-ঢাকা ছায়া, বাতাসের সাথে মিশে যাওয়া, শাল নির্য্যাসের মাতাল করা ভুরভুরে গন্ধ। এখন চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে, তার সাধের সেই শ্যামরূপার গড়ের ধ্বংসাবশেষ। দু'চারটা মন্দির যা'ও বা দাঁড়িয়ে আছে, তার গাঁথুনির ফাটল থেকে গজিয়েছে গাছ, আগাছা। মোটা-সরু শেকড় ঝুলছে দেয়াল বেয়ে, সাপের ল্যাজের মত।

মন্দিরের ডগা থেকে ল্যাজা পর্য্যন্ত, জমেছে হাজার হাজার বছরের শ্যাওলা। দূর থেকে মনে হয়— কেষ্টা ব্যাটা দাঁড়িয়ে আছে ভগ্ন বুকে। এখনকার জাফরকুলী খাঁ আর মীর জাফরেরা, লোক্যাল কমিটির মতেই, সব কেটে ফাঁকা করে ফেলেছে—সেই বন-জঙ্গল যুগযুগ ধরে। দু'চারটা না থাকলে বড় ন্যাড়া ন্যাড়া লাগে। তাই দু' একটা শাল-মহুয়াকে রাখতেই হয়।

এই যে এই শাল জঙ্গল, সেটার বিস্তৃতি ছিল পূব থেকে পশ্চিমে, একেবারে সেই বিহারের সাঁওতাল পরগনা পর্য্যন্ত। এখন যার নাম হয়েছে ঝাড়খণ্ড। দক্ষিণে সেই দামোদরের কূল পর্য্যন্ত। দামোদরের ওপারেও ছিল শাল-মহুয়া-পলাশ-আমলকীর বন। বাঁকুড়া পেরিয়ে মেদিনীপুর, তারপর উড়িষ্যা পেরিয়ে নাগপুরের দিকে বিস্তৃত ছিল। আবার ওদিকেও ছিল বিস্তৃত শালবন—ওই মানভূম-সিংভূম-হাজারীবাগের দিকে।

শ্যামরূপার গড় জঙ্গল যেন-ওই ঘন অরণ্যের সিং-দরজা, অন্য কথায় সিংহ-দুয়ার! সিংহ ছিল না দরজা পাহারা দেবার জন্য। কিন্তু ফি বছর ফাগুন-চত্তির আর বোশেখের দিনগুলোতে বুনো শুয়োর, চিতা আর ভালুকের "পৌষ-মাস" হতো। মহুয়া খেয়ে গড়াতো, ওই দুই জাতের বাঞ্চোতেরা।

এক জাত আর এক জাতকে, মালখোর বলে গালি গালাজ দিত কিনা, আমার জানা নাই। তবে এই বুক ঠুকে বলতে পারি যে ওরা "লিশ্চয়ই" কামড়া-কামড়ি করতো। একটা দল ঘোঁতর ঘোঁৎ করলে, অন্যে থাবা না মেরে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে; তা'তো হয় না! চিতারা চিৎপাৎ হয়ে গড়াগড়ি দিতো না, কারণ ওরা মহুয়া খায় না। তবে ভালুকের সাথে আড়াআড়ি হ'তো ওদের, শুধুই তালুক ভাগের বেলায়, আর দু'এক খামচা মৌচাক গ্যাঁড়াবার জন্যে।

শ্যামরূপা জায়গাটা কিন্তু, এখন বর্দ্ধমান জেলায় পড়ে। কেন্দুলী হ'লো বীরভূমে। মাঝখানে শুকনো নদী অজয়। শ্যামরূপা থেকে দশ বারো কিলোমিটার হাঁটলে, পাবেন আর এক বাঘের ব্যাটা আর বাপের ব্যাটা কবি কাজী নজরুলের জন্মভিটা—চুরুলিয়া। রবীন্দ্রপ্রতিভা যখন মধ্যগগনে, সেই বাপের ব্যাটা নজরুল, একচেটিয়া রবীন্দ্র-জৌলুসকে খামচা মেরে; কেড়ে নিয়েছিল আপন কব্জি আর কলমের জোরে! আর গান! সেও কম যায়নি—নজরুল চাচা।

মুসলমানের সাচ্চা বাচ্চা, এবং এক কায়েতের-বাচ্চা সুভাষ বসুকে, এক নিশুত রাতে ফুল্লরার শেয়াল-ডাকা মহাশ্মশানে বসিয়ে, কানের গোড়ায় ফুঁক মেরে; মহাযোগী বরদাকান্ত মজুমদার সাহেব---দু'টোকেই বানিয়ে দিয়েছিলো "মা কালীর ছ্যানা। আর ওই দুই বিটকেল্ শুনেনি কারো কোন মানা। চারপেয়ে সিংহ না থাক, ওই দু'জন-সিংহ হয়েছিল বটে! গোটা বাংলায় সে কথাটা গেছলো রটে।

বর্দ্ধমানকে এক খামচা, আর বোলপুরকে এক খামচা শাল জঙ্গল দিয়ে, বাকীটা ফুঁকে দিয়েছে কেলোরা, মহাকালের বিচিত্র গতিতে। আর আমি দেখতে দেখতে চলেছি, সেই শ্যামরূপার গড় জঙ্গল। কাঁকসা-গৌরাঙ্গপুরের দিগন্তজোড়া মাঠ পেরিয়ে।

এই বাংলার রাজা ছিল বল্লাল সেন। সুশাসক হিসাবে তার নাম থাকলেও, কুকীর্ত্তি কিন্তু কম ছিল না তার। যত বামুন থাকবে, তাদের থাকবে ষোল হাজার করে গোপিনী, আর তবেই তারা হবে কুলীন। ওই যোনী আর লিঙ্গের উদ্দাম আর উন্মাদ খেলাটাকে, আইনসিদ্ধ করে দিল বাংলার এই হ্যাংলা রাজা। রাজার উপর বেজায় খুশী হলো বুড়ো-হাবড়া, চ্যাংড়া-চুংড়া বামুনগুলো। কেউ কেউ নিজের মেয়েকে ভেট দিয়ে, রাজার অলিখিত শ্বশুর হয়ে গেল।

রাজ্য গেল চুলোয়, কুলীন ধর্মের চুলকানির জন্য। রাজার ব্যাটা গজা---লক্ষ্মণ

সেন, শ্যেনদৃষ্টি আর বুদ্ধিতে ও'সব বিচার করে, একদিন বাবার সাথে ঝগড়া করে চলে এসেছিল, এই শ্যামরূপার জঙ্গলে। তখনও এর নাম হয়নি শ্যামরূপার জঙ্গল। কবিতা আর শাস্ত্ররসিক মানুষ, এই লক্ষ্মণ সেনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, গোস্বামীপাদ জয়দেবের। সভাকবি করে নিয়েছিলেন রাজা তাঁকে। কালে কালে সবই ধ্বংস হয়। ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়নি, লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বও। রাধাবিনোদ প্রতিষ্ঠিত হ'লো এবার জয়দেবের শ্রীপাটে।

চলছে ভাঙ্গনের পালা, রাজা সাজার পালা, পটপরিবর্ত্তন হচ্ছে অতি দ্রুত। লক্ষ্মণ সেন গেলো, কর্ণ সেন এলো, এলো ইছাই ঘোষ, লাউ সেন। এই সেন-রা, বল্লাল সেনের ভাই-বেরাদর, বা নাতির ব্যাটা পুতি ছিল কিনা জানি না। ঘোষের পো ইছাই সময় আর সুযোগ বুঝে—মেরেছিল এক গোঁত্তা, ওই সেনেদের। শক্তির উপাসক এই, ইছাই, করতো 'যা-ইচ্ছে-তাই'। শত্রুকে ধরতে পারলে, কচুকাটা করতো জঙ্গলের মধ্যে, মা দুগ্গা কী কালীর সামনে, হাড়কাঠে তার মাথাটা গলিয়ে দিয়ে।

বদমাসের দোসর হয় যত শয়তান। ইছাই-এর ইচ্ছার সলতেয় আগুন লাগাতে, তার ল্যাংবোট ছিল একপাল কাপালিক। লম্বা চওড়া খাঁড়া নিয়ে, খাড়া থাকতো সব সময় তারা, নরবলি দিতো মালে চুর হয়ে।

পালে পালে লক্ষ লক্ষ পাঁঠা-মোষ, আর বেয়াড়া প্রজাদের ধরে এনে, বলি দিত ওই কাপালিকেরা, শ্যামরূপার সামনে। কচি কচি মেয়ে কি ঝি-বৌ, যাকেই চোখে দেখে ওদের নোলায় জল ঝরতো; তাকে না চেখে কি করে ছাড়া যায়? তার জন্য একটা বায়না তো ধরতেই হয়! আর সে বায়নাটার নাম, "এসো মাগী, সাধন সংগিনী হও"।

বেয়াড়াপনা করলে, দেখিয়ে দেওয়া হ'ত—ওই হাড়কাঠটাকে। যেখান থেকে রক্ত বইতে বইতে, তৈরী হয়েছে এক নালা—নাম তার **"রক্তনালা"**। লক্ষকোটি মানুষের রক্ত, বইতে বইতে, গিয়ে মিশতো ওই অজয়ের বুকে। সেই অভিশাপেই হয়তো গঙ্গা নিজে, পৌষ সংক্রান্তির বারুণীর স্নানের সময়, আর আসেনা কদম্বখণ্ডীর ঘাটে। সেখানে আজ নদীর বুকে মরুভূমি। জয়দেবের **কুশেশ্বর ঘাট** আর **ফুলেশ্বর ঘাটেরও** সেই একই দশা। নবাবী আমলের **ইলামবাজার, জনুবাজার** আর **সুখবাজার,** এখন আর সুখে নাই— শুকিয়ে মরে গেছে সেই কবে!

বেঁধে আনা মেয়েদের নিয়ে চলতো পঞ্চ ম-কার চক্র'। আর তা' চলতো গড়গড়িয়ে—দিন পেরিয়ে—রাত পেরিয়ে। বড্ড রমরমার দিন ছিল, ওই ঘোষের পো ইছাই-এর। গভীর শাল জঙ্গল, জনমানবহীন প্রান্তর। দিনের বেলাতেও মানুষে ভয় পেত জংগলে ঢুকতে। ছিল বাঘ, হায়েনার ভয়, সাপ-খোপের ভয়, সর্বোপরি

কাপালিকের ভয়। কথাগুলো একদিন গল্প হয়ে হয়ে, অজয়ের ঢেউ ছুঁয়ে, ধাক্কা মেরেছিল গোস্বামীপাদের শ্রীপাট কেঁদুলিতে।

মনে বড় ব্যথা পেয়েছিলেন গোস্বামী কবি জয়দেব। বৈষ্ণব মানুষ, অহিংসাই তার ব্রত। বহু দিনের চেনা লক্ষ্মণ সেনের গড়-জঙ্গলে, ইছাই এ' কি অধর্মের কাজ করে চলেছে! অজয় পেরিয়ে তিনি নাকি শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে, পৌঁছে ছিলেন ইছাই ঘোষের সেই গড়-মহলে।

শাক্ত ইছাই ভ্রূকুটি করে বলেছিল, "কী গোস্বামী ঠাকুর, কী মনে করে? নিরামিষ অন্ন আর রুচ্‌ছে না নাকি! তা ভালো, তা ভালো। আসুন, আপনাকে শাক্ত মন্ত্রে দীক্ষা দিই। এই বুড়ো বয়সেও, খানিকটা আপনার গায়ে-গতরে লাগবার, সুন্দর ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

এতদিন তো তুলসীপাতা আর আলো-চাল মুখে দিয়েছেন, এখন না হ'য় মোষের মাথা আর মেয়েদের ন্যাতা চাখলেন। আমার তো আবার, ওই লিঙ্গ আর যোনী ছাড়া, মেজাজ উঠে না। বুয়েছেন গোস্বামীপাদ, আমি সব সময় আবার, এই দিগম্বর হয়েই থাকি, ওই দিগম্বরীদের সাথে নিয়ে, দিগম্বরী মায়ের সাধনা করবো বলে।"

বলেই ফড়াৎ করে খুলে ফেলেছিল, কোমরের গেরুয়া কাপড় তাঁর সামনে। আর দড়িতে বাঁধা, সোমত্ত এক ন্যাংটা যুবতীকে দেখিয়ে বলেছিলো, "কী, চলবে নাকি? দীক্ষা নিন, এরকম ডাঁসা মাল আপনি নিত্য নূতন পাবেন। মুখ বদল করার সুযোগ, আপনার আমি করেই দেবো, কথা দিচ্ছি। এখানেই থাকুন, অজয়ের 'গাং' পার হবার দরকার নাই।"

শান্ত অথচ গম্ভীর হয়ে, কথাগুলো শুনে গেছলেন গোস্বামীপাদ। তারপর ধীরে ধীরে, অথচ প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে উঠেছিলেন, 'ইছাই, দম্ভ আর উল্লাস দেখাচ্ছো— দেখাও। কিন্তু তোমার আরাধ্যা মা কী, সত্যিই তাই চান? সত্যি কী, এমনি করে তোমার কাছ থেকে, তিনি পূজা নেন, নাকি মুখ ফিরিয়ে থাকেন? তুমি আমাকে দেখাতে পারো, তোমার ওই আরাধ্যাকে? যে রাজী হবে প্রাণের ভয়ে, তাকে আকণ্ঠ ভোগ করবে, আর যে রাজী হবে না—তাকে হাড়কাঠে বলি দেবে?"

—— "মা কি চান, মা জানেন। আমি হলাম গিয়ে তাঁর তান্ত্রিক 'ছা'। এই আমার বিশেষ সাধন পদ্ধতি। যদি ওই রক্তলোলুপাকে দেখাতে পারি, তবে গোস্বামীপাদ—কী করবেন আপনি? মেনে নিতে পারবেন, আমি যা বললাম?"

—— "বৈষ্ণব ধর্ম ছেড়ে, তোমার শাক্ত ধর্ম গ্রহণ করবো। মেনে নেবো আমার ভুল আর ভ্রান্তি, মেনে নেবো তোমাকে আমার গুরু বলে! আর যদি না দেখাতে

পারো, তবে তুমি যে পথে চলছো, নিশ্চয়ই সেটা ছেড়ে দেবে? কথা দাও ইছাই। তুমি রাজা, তোমার কথার দাম অনেক। প্রজার বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা গায়ের জোরে আদায় করা যায় না। ধর্মকেও ধামা-চাপা দেওয়া যায় না, কিংবা ধরে মেরে কাউকে গিলিয়েও দেওয়া যায় না।

—— "তবে তাই হোক, নড়চড় হয় না আমার কথার। ইছাই ঘোষ আমার নাম, জানবেন। আমি পিছিয়ে আসতে শিখিনি, গোস্বামীপাদ!"

ছুটে গিয়ে মন্দিরের দরজা খুলে, সে ইছাই হতবাক। সেখানে বসে আছে, সেই দড়িতে বাঁধা ল্যাংটা মেয়েটা। মুখে চোখে তার বিমুগ্ধ দৃষ্টি, কোলের নাড়ুগোপালের প্রতি। ডান হাতে তার বাঁশের বাঁশী ধরা আছে, বাঁ হাতে ধরা আছে ডান স্তন মায়ের, আর বাঁ স্তনে মুখ গুঁজে, সে পান করছে অমিয় দুগ্ধধারা। ছুটে বেরিয়ে গেল মন্দিরের উঠোনে ইছাই। দড়িটাই সেখানে খোলা হয়ে শুধু পড়ে আছে, নাই সে মেয়ে, যাকে তার পাইক বরকন্দাজরা বেঁধে এনেছিলো।

আবার দৌড়ে এসে দেখছে, সে মেয়ে নেই মন্দিরে। বিশ্বপিতা শ্রীকৃষ্ণের পাদবন্দনা করছেন সেখানে, বিশ্বমাতা গোপকন্যা শ্রীরাধা। দূরে দাঁড়ানো গোস্বামীপাদের দিকে তাকিয়ে সে দেখলো, তাঁরও চোখ জলে ভরা। দড়াম করে সেই ইছাই পড়লো মন্দিরের চৌকাঠে। চেঁচাতে লাগলো বুক চাপড়ে, ঘোষের পো ইছাই। মিছাই সে ঘুরে মরেছে কষাই হয়ে। শাক্তের শক্তি কেড়ে নিয়েছে, মহাশক্তি—মহামায়া শ্রীরাধিকা!

—— *"আজ থেকে নরহত্যা বন্ধ। শাক্তমত শেষ, শুরু হবে দুর্গার সাথে রাধা-শ্যামের পূজা। মাগো, আজ থেকে তুমি 'শ্যামরূপা' হলে মা। ওরে—কে কোথায় আছিস, তাড়িয়ে দে কাপালিকদের। রক্তপাত বন্ধ করে দে আজ থেকে।'*

উঠে পড়ে দেখলো, গোস্বামীপাদ ধীর পদবিক্ষেপে, রক্তনালার পাড় ধরে হেঁটে চলেছেন, অজয়ের দিকে। সাহস হল না, তাঁকে ডেকে ফিরিয়ে আনতে। শুধু সে চেঁচিয়ে বললো—"ঠাকুর, আজীবন—আমৃত্যু আমি তোমাকে দেওয়া আমার কথা, রক্ষা করে চলবো। তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমি ভুল করেছি—ভুল পথে চলেছি এতদিন। সে ভুল আজ তুমি ভাঙ্গিয়ে দিলে, তোমাকে প্রণাম!"

এই হলো সেই শ্যামরূপার জঙ্গল। এই তার লোক-কাহিনী। বছরের পর বছর শুনেছি মানুষজনের মুখে, এই কিম্বদন্তী। নচ্ছার বাউল আর ভিখ্‌মাগা সাধুদের কাছে, সদুত্তর পাইনি কোন প্রশ্নের। পেটের রুটি আর পঁদের কাপড়, আর খানিকটা গাঁজা হলেই ওদের চলে যায়। বৃথা, ওই সব খুঁজে পাগলে।

কেউ কেউ আবার ভিক্ষা করতে বেরিয়ে, ভোটের ক্যানভাসটাও সেরে ফেলে,

'সিদের' অন্ন কোঁচড়ে ঢালতে ঢালতে বলে—"ও' পাড়ার কালু ড্যামটাকে ভুট্ দাও ক্যানে, এ-মি-লে (M.L.A) হবেক গ'। ভাল মনিষ্যি আছে উ বটে!"

কীষ্টকে খুঁজে না ওরা, ইষ্ট ওদের কাছে একমুঠো আলো-চাল আর আলু। কালু ডোমের জন্য তাই উমেদারী করে, বাড়তি কিছু রোজগারের ধান্দায়। কিম্বা লোকের বৌ মেয়েকে ফুসলাবার জন্য, যাতে পুলিশের লাঠি পাছায় না পড়ে, তার পথটাও মেরে রাখে, ওদের তেলিয়ে তেলিয়ে। কিংবদন্তীর ইতিহাস ঘাঁটবে ওরা!

বিরাট এক পাহাড়ের পাথর কেটে কেটে তৈরী হয়েছে শ্যামরূপার মন্দিরে যাবার সিঁড়ি। ধান মাঠ থেকে অনেক উঁচুতে মন্দির, সেটা তালাবন্ধ। পূজারী ব্রাহ্মণ আসবে বহু দূর-গ্রাম থেকে। অগত্যা এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে, দেখতে লাগলাম আর ছবি তুলতে থাকলাম। কিছুক্ষণ পরে এলো এক ছোকরা। সে নাকি ওই মন্দির আর জঙ্গলটার দেখাশুনা করে।

দলে দলে স্থানীয় মেয়েরা কেটে নিয়ে যাচ্ছে, দামী দামী সেগুন গাছ, সে দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নাই। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, সরকার ওই জঙ্গলটার মালিক। সরকারী পুলিশ, বন বিভাগের লোকেরা উল্টোদিকে চেয়ে, তাড়াতাড়ি গাছ কেটে নিয়ে, চোরদেরকে পালাতে বলে। যথারীতি নজরানা জমা পড়ে যথাস্থানে। ওখানে ছবি তোলা নাকি নিষেধ। কেন নিষেধ তা' জানি না।

সব ছবি তোলা হ'লে, বসে রইলাম শেষ ছবি তোলার জন্য। সে ছবি শ্যামরূপার। যে পাগলী বেটী—ইছাই ঘোষকে অতটাই ম্যাজিক দেখিয়েছিলো, তার ছবিটা না তুলে, তাকে না দেখে, ফিরে আসি কী করে! দেখবো না কেন তাকে প্রাণভরে? প্রাণে ধরে, ইছাই প্রতিষ্ঠা করেছিল যার!

গিরিজা আর গিরিকা গান ধরলো, খঞ্জনী-ডুগি আর একতারা বাজিয়ে, বাঁধানো চাতালে নাচতে নাচতে। আগেই বলেছি ওদের গলা শুনলে, যে কোন লোকের ঈর্ষা হবে। নিদাঘতপ্ত দুপুরে শাল-মহুয়ার ছায়াঘেরা, শ্যামরূপার চত্বরে চরকীপাক খাচ্ছে; দুই বাউল-বাউলানী।

"ঘনচয়-রুচিরে রচয়তি চিকুরে
তরলিত তরুণাননে,
কুরুবক-কুসুমং চপলা-সুষমং
রতিপতি-মৃগ-কাননে। ২ ।
ঘটয়তি সুঘনে কুচ-যুগ-গগনে
মৃগমদ রুচি রুষিতে,
মণিসরমমলম্ তারক পটলং

নখপদ শশী ভূষিতে। ৩ ।
রমতে যমুনা পুলিন বনে
বিজয়ী মুরারিরধুনা।। (ধূয়া—Repetition)

.......শ্রীগীতগোবিন্দম্

বাংলা মানেঃ— মেয়েদের মাথার চুলের সম্ভার পুরুষকে পাগল করে। হরিণীকে হরিণ যেমন বনে রমণ করে, তরুণ শ্রীকৃষ্ণও তেমনি রমণ করছে গোপবালাদের, ওই চিকুরভারে মুখ ঢুকিয়ে। কেন জানো সখি, ওখানে যে কুরুবকের (ঝাঁটিফুল) ফুল, সে তারার মত গুঁজে নিয়েছে। ২।

আর ওদের স্তনগুলো আকাশের মত বিশালাকৃতি। পীনোন্নত স্তনগুলোতে কস্তুরীকুঙ্কুম লেপ্‌তে লেপ্‌তে, নখের দাগ বসে গেছে আধফালি চাঁদের মত। মুক্তার হার দুলিয়ে দিয়েছে শ্রীকৃষ্ণ সেই স্তনরেখায়। ৩।

যমুনার পাড়ে ওই (বৃন্দা) বনে হরি এমনি করে প্রেম করছে, বিজয়ীর মত তার হাবভাব।। ধূয়া ।। ..... (স্বচ্ছন্দ অনুবাদ)

.......শ্রীগীতগোবিন্দম্ (৭ম সর্গ—১৫শ সন্দর্ভ-গীত ২-৩)

(There you see oh dear, the female lovelock always attracts a male one. The young Krishna is in Cohibition like a stag with milk-damsels by covering His nice face in their bunch of love locks, where *Kuruvaka* shines like stars. ।2।

Their plumpy bulky breasts are like the Blue above, and Krishna to paint them with *Saffron* and *Kasturi,* made there nail-scratches like a sliced moon. The pearl neckless adorns their breasts; and thus your Krishna is making love with Milk-damsels in the Brinda Garden and poses to be a hero-winner.) ।3। ....(My free translation)

পূজারী স্থানীয় মানুষ। জন্মেই দেখছে শুনছে, বাউল আর বাউলানীর গান। ওদের দেখে তার অবাক হ্‌বার কথা নয়। আমাকে দেখে কিছুটা কৌতূহল বোধ করলো যেন সে। যদিও আমার মত অনেক সাধুই, হরবখত্ ওই শ্যামরূপার জঙ্গলে যায়। পরিচয় দিলাম নিজের, আর ওদেরও। পূজা শেষে যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদও পেলাম। ছবি তোলার ইচ্ছাও জানালাম। রাজী হ'লো সে পূজারী। শ্যামরূপার সাথে তুলে নিলাম তারও ছবি।

শ্বেতপাথরের সে দুর্গাকে দেখে, কমণ্ডলু ভরে জল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম মন্দির থেকে। সূর্য্যি তখন ঢলে পড়েছে পশ্চিমে। তাড়াতাড়ি তো আর হাঁটা যায় না। মাঠ পেরিয়ে আসতেই লেগে গেছে প্রায় এক ঘণ্টা। বসে পড়লাম, ঘন সন্নিবিষ্ট বৈঁচি কুলের গাছের নীচে। কাঁচা কষাটে-টকটক মিষ্টি-মিষ্টি কুলগুলো পেড়ে, মুখে ফেলতে লাগলাম। ছোট বেলায় পেড়ে খেতাম ও'গুলো পেটভরে।

গিরিকাকে খাবারের পুঁটলিটা ব্যাগ থেকে বের করে দিলাম। ''এসো আমরা তিনজনে খাই। তার আগে দাও, শ্যামরূপাকে অঞ্জলি ভরে। গিরিজা, ওই দূরে তাকিয়ে দেখো, কী সুন্দর ফুল ফুটে আছে ওখানে। মন বলছে ওতেই সে বেটী নাকি তুষ্ট হবে। যাও, ক'টা পেড়ে আনো। গিরিকা তুমি শাল পাতায় সাজিয়ে ফেলো নৈবেদ্য। তোমার ইচ্ছে থাকলে, অন্য ফুলেও শ্যামরূপার পুজো করতে পারো।

এ' পূজার মন্ত্র শুধু—'মাগো, খেয়ে নে।' হৃদয় মন দিয়ে বল্ বেটী, সে ঠিক শুনবে।" চোখ ছলছল করছে তার। বললাম, "অশ্রু দিয়ে ওই ফুল ভিজিয়ে দে বেটী, আরে ও' সত্যিকারের চোখের জলে তুষ্ট হয়— কোল পেতে দেয়।"

ছুটে গিয়ে সে পেড়ে আনলো, হেলে পড়া এক বৃদ্ধ শালের পাতা আর মঞ্জরী। যত্ন করে থালা বানিয়ে সে সাজিয়ে ফেলল নৈবেদ্য। কোঁচড় থেকে দু'মুঠো মহুয়াও সে সাজিয়ে দিলো নৈবেদ্যের চার পাশে। শুকনো করা ঝরা মহুয়াফুল, হয়তো কেউ কেউ ভিক্ষেও দেয় ওদের।

অথবা ওরাই হয়তো শুকনো করা মহুয়া, কোঁচড়ে করে এনেছে খাবে বলে। মালের বোতল কেনবার মত রেস্ত ওদের সব সময় থাকে না। তাই যুতসই সাধন ভজন করতে গেলে, শুরুটা একটা ঘোরের মধ্য দিয়েই, শুরু করতে হয় কিনা! তো সে যাই হোক, আর একটু এগুলেই পড়বে, ইছাই ঘোষের রক্তনালার মাঠ।

গিরিজা ফিরে এসেছে, শ্যামরূপার ঈষৎ শ্বেতফুল নিয়ে। হাঁ করে, সে মেয়ে তাকিয়ে আছে ফুলের দিকে। যেন কোন কালে সে দেখেনি সে ফুল। সত্যিই তাই, স্বীকার করলো সে। মহা আনন্দে সে পূজা দিল— "খেয়ে নে মা মহামায়া!" থরথর করে কাঁপছে সে। এক সময় মূর্চ্ছাও গেলো সে।

কমণ্ডলুর জলের ঝাপটা দিলাম তার মুখে চোখে, খানিকটা সুস্থবোধ করলো সে। বেঁটে দিল মিষ্টি, রুটি তরকারী। যা আমি সেই ভোরবেলায় এনেছিলাম, কেঁদুলির বাজার থেকে, সবাই মিলে খাব বলে।

হাতমুখ ধুয়ে বসে বসে বিড়ি টানতে লাগলাম। ওদেরকে বললাম, ''তোমাদের যদি কোন নেশার বস্তু থাকে, তবে তা' এখন খেতে পারো। অসুবিধে নাই কোন, আমার কাছে খেতে।

রোদে বর্ষায়, প্রতিকূল পরিবেশে তোমার আমার অজান্তে, আমাদেরকে রক্ষা করে চলে এই আফিম-মদ-গাঁজা। এইগুলো তা'ই ঘরছাড়া সাধু ফকিরেরা, সাথে করে ঘুরে বেড়ায়। আমরা ঘেন্না করি ওদের—আবার লুকিয়ে চুরিয়ে যাই ওদেরই কাছে, সব মুস্কিল আসান করে নিতে। নির্লজ্জ এই আমাদের দ্বিচারী স্বরূপটাকে বুঝতে কষ্ট হয় না।"

—— "আমরা শুধু তুরীয়ানন্দ (গাঁজা) সেবা করি। অন্য কিছু কোথায় পাবো বাবা। ওটাই সস্তা। লুকিয়ে চুরিয়ে জঙ্গলে দু'চারটা গাছ, চাষ করি বর্ষাকালে। গাছে ফুল এলে, কেটে নিয়ে শুকনো করে ফেলি। না হলে তো, পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে আমাদেরকে, বে-আইনি গাঁজা চাষ করবার জন্য! সারা বছর ওতেই আমাদের চলে। কিনতে হয় না দোকান থেকে। বড্ড দাম চায় ওরা, আবার ভেজালও দেয় পেঁপে কী তামাক পাতা। ওরাই চোর—কিন্তু আমাদেরকে বলে চোর-ছ্যাঁচড়।"

—— "ঠিক আছে, তাই পান করো। আমি তোমাদের দেবো খানিকটা কারণ-অমৃত। বিশুদ্ধ জিনিষ, শ্যামরূপার বড় পছন্দের। দুগ্গাই শ্যাম আর শ্যামই দুগ্গা কী রাধা। সন্দেহের চোখে ওদেরকে দেখতে নাই।"

মুখ চাওয়া চাউয়ি করলো ও'রা। তারপর ঝোলার ভেতর থেকে, দুটো বড় বড় বিড়ি বের করে, ধরিয়ে টানতে লাগলো। ছিলিমের (কলকের) ঝামেলা নাই। লোকে বুঝবে বিড়ি, আর ওরা কিন্তু খাচ্ছে গাঁজা। চোখ দু'টো তাদের, একটু একটু করে, লাল হয়ে উঠছে। আমার ঝোলার ভেতর থেকে বের করলাম, গতকালের পড়ে থাকা বাকী হুইস্কির বোতলটা; আর তেল চুকচুকে, ঘন বেগুনী রঙের মাঝারি মাপের, চিত্রিত একটা শাঁখ। বড় পবিত্র জিনিস!

কলকাতার যাদুঘরের, ফুটপাতের দোকান থেকে কিনেছিলাম সেটা। কোথাও বেড়াতে বেরুলে, ওটা আমার সাথে থাকে। শাঁখের মুখটা কেটে নিয়েছিলাম হ্যাক্-স' দিয়ে। এক পেগ করে মাল ধরে তা'তে। বিচিত্র ওই বস্তু দেখে, ওরা লোভাতুর হয়ে উঠলো। ঢেলে ফেললাম পেগ্-খানিক মাল, সেই শাঁখে। গিরিকার মুখেই প্রথমে ঢেলে দিলাম। ঢকঢক করে খেয়ে ফেলল সে। কমণ্ডলু থেকে খানিকটা জলও ঢেলে দিলাম, তার বিস্বাদ মুখে।

—— "বড্ড জ্বালা করছে বুঝি, মা!"

—— "হ্যাঁ বাবা, এ' জিনিষ কখনও খাইনি তো!"

—— "গিরিজা, এবার তুমি প্রসাদ নাও।"

হাঁ করলো গিরিজা। তেমনি করে শাঁখে ভরে, ঢেলে দিলাম তার মুখে। ঢেলে দিলাম জলও, তার মুখে খানিকটা। নিজেও নিলাম এক পেগ্ শাঁখ ভরে। আন্দাজ করে

বুঝলাম, আরও তিন চার পেগ হয়ে যাবে। আবার দিলাম ওদের, আর আমি বাকীটা গলায় ঢেলে দিয়ে, বোতলটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম জঙ্গলের মধ্যে।

ভয় হ'লো, আবার না আজকে ওরা, গত কালের মত সেই রকম, বিশ্রী কাণ্ড করে বসে। এটা আমি না করলেই পারতাম। এখন আফ্‌সোস্‌ হচ্ছে। আরও ঘণ্টা-খানিক হাঁটতে পারলে, পৌঁছে যেতে পারবো বাস রাস্তায়। ফের ফিরে যেতে পারবো, যথা সময়ে দুবরাজপুর। সাধুমা সেখানে, অপেক্ষা করে থাকবে। নিজেই নিজের ফ্যাসাদ বাধিয়ে, হাত কামড়াতে লাগলাম, অজ-মূর্খের মতো।

মনের মধ্যে আমার কোন দুরভিসন্ধি ছিল না। বড় ভালবেসে ফেলেছি এই মেয়েটাকে। তার নিষ্পাপ মুখের দিকে চেয়ে, বড় মায়া লাগে। আস্তে আস্তে ঝুঁকে আসছে, তার মাথা আমার কাঁধে। মনে মনে বিশ্বপ্রসবিনী শ্যামরূপাকে বললাম—"মাগো, আমি কী ভুল করেছি? আমি তো খালি ওদের, একটু উসকে দিতে চেয়েছিলাম, গোস্বামীপাদের গানে গানে। বড় ভাল লাগে শ্রীগীতগোবিন্দমের অমৃত পদগুলো, ওদের গানেব আর সুরের হিন্দোলে। এ' তো দেখছি—হিতে বিপরীত হলো মা!"

মাথাভর্ত্তি একরাশ কোঁকড়া, অবিন্যস্ত চুলের মধ্যে, মুখ ঘসে বললাম তার কানে কানে, "গিরিকা, আমাকে গান শোনাবি না মা? দু'হাতে খঞ্জনী তুলে নে না মা।

বহু বিস্মৃত যুগের ওপার থেকে, সে যেন জেগে উঠে, আমার মুখের দিকে সতৃষ্ণ চেয়ে, উদ্গাত অশ্রুতে ভেসে গেল নীরবে।

আমার নিজের মনের মধ্যেও, বহুদিনের একটা চাপা দুঃখ আছে— তা' হ'ল, মেয়েকে গান গাইতে বললে, সে গান গায় না। বলে—'ভাল লাগে না'। এগারো-বারোটা বছর ধরে, শুধু পণ্ডশ্রম আর অর্থক্ষয় করেছি তার জন্য, হারমোনিয়াম আর দু'জোড়া তবলা কিনে দিয়েছি; দশ পার্সেন্ট মাসিক সুদ দিয়ে টাকা ধার করে এনে।

গিরিকা আমাকে গান শুনিয়ে, জয় করে নিয়েছিল আমার মন। ওদের সুর আর গোস্বামীপাদের কবিতা, বড় বিহ্বল করে তুলে আমাকে। গেরুয়ার খুঁট দিয়ে মুছিয়ে দিলাম, তার সেই বাঁধভাঙ্গা চোখের জল। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূণ্য হয়ে, তার ঠোঁটে ঠোঁট রেখে, এঁকে দিলাম এক গভীর চুম্বন।

আমাকে নির্নিমেষ নয়নে দেখতে দেখতে, সে জাপটে ধরলো আমার পা। মুখ ঘসতে লাগলো সেখানে। তাকে আর বিহ্বল গিরিজাকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরে, বললাম কানে কানে—"এখনও অনেক পথ বাকী। চল্‌ মা গান করতে করতে ফিরি। গিরিজা, সুর তোল্‌ তোর ওই—একতারায় আর ঘুঙুরে। গিরিকা, সুরের জাল বিছিয়ে দে মা, তোর খঞ্জনীতে-ডুগীতে।"

এ' কথায় কী মন্ত্র লুকিয়ে ছিল জানি না! ঝড়ের মত বেজে উঠলো, খঞ্জনী আর ডুগী, শ্যামরূপার জঙ্গলের বাসন্তী উপান্তভূমিতে। খাতা খুলে বের করে ফেললাম, আমার লেখা কবিতাটা। তিন চার বার আবৃত্তি করলাম আমি সেটা ঃ

"চৈত্র এখানে ঘুরে মরে হায়—প্রিয়ারে খুঁজে!
বুঝে না হৃদয়, চায় পরিণয়—শুধুই গুঁজে।
পত্রে-কুসুমে হৃতযৌবন খুঁজিয়া ফেরে,
থাকিয়া থাকিয়া বক্ষবিদারী আঘাত করে;
ছিঁড়ে নিতে চায় আপন হৃদয়
তপ্ত শোণিত মাখা,
হুতাশে কাঁপিয়া থরো থরো করে
শাল-তমালের শাখা,
'আয় ফিরে আয়—কোথা গেলি হায়,
আমি যে বড়ই একা।'
প্রিয়া ডেকে কয়—'হয়নি সময়,
জোছনায় পাবে দেখা—
হারানোর ব্যথা, সহো না মুখটি বুজে'। .... সোমানন্দ অবধূত

সরল করে মানেটাও বুঝিয়ে দিলাম। *স্থিতধী সে কন্যা গিরিকা, অসম্ভব আর অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায়, সুর বসিয়ে দিল কবিতাটায়—বদলে দিল গানে গানে। ঝরে পড়ছে প্রিয়া-প্রিয় হারানোর ব্যথা, গানের ধূয়ায় টুপটুপ করে। বিশ্বাসই হচ্ছে না যে, ওটা আমিই লিখেছি, লিখতে পারি! বার বার করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, গাইছে ওরা গানটা। আগে ভাবতে পারিনি—বুঝতে পারিনি, অসম্ভব স্মৃতিধর সেই মেয়ের ক্ষমতার ওজন।*

কখন যে পৌঁছে গেছি দুর্গাপুর-সিউড়ির বাস রাস্তায়, আমাদের খেয়াল ছিল না। একটা চায়ের দোকানের পাশে বসে পড়লাম আমরা। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট, পুলিশের লোকেরা অপেক্ষা করছিল, ওখানে চা খাবে বলে। আমাদের অনুরোধ করলো ওরা, একটা গান শোনাতে।

পুলিশ ঃ "একটা ভাল গান হোক, বাবা।"

গিরিকা ঃ "ভাল-মন্দ, তুমি কী বুঝ ভাই। গান গানই। তার আবার ভাল আর মন্দ কী? দিনরাত চোর চামার ধরতে ধরতে, নিজেই তো মনটাকে মেরে ফেলেছো! সেই **'চামারের বেটা-বিটীকে'** কী করে ধরতে পারবে?"

চুপ করে গেল ওরা। অত সুন্দর কথাও সে বলতে পারে, বুঝিনি।

দোকানদারকে বললাম তিন কাপ চা দিতে। তারপর গিরিকাকে বললাম, "মা, অতিথিকে যেমন বিমুখ করতে নাই, তেমনি গানের প্রত্যাশীকেও অমন করে বলে না। ও' ভাবে হয়তো সে বলেনি কথাটা। দেখ্, ওর মনে শুভেচ্ছা না থাকলেও, কদিচ্ছা তো থাকতে পারে। সেটাই হয়তো ও'—আমাদের উপহার দেবে, না চাইতেই। তার চেয়ে বলি কি মা, তুই একটা গান শুনিয়ে দে না। চা হ'তে তো অনেক দেরী হবে। বাসও নাকি আসবে ঘণ্টা খানিক পরে। বসে থেকে থেকে, কী আর করবি বল্!"

——: "তোমার সেই গানটাই তবে গাই?"

সম্মতির মাথা নাড়লাম আমি। বেজে উঠলো ডুগি আর খঞ্জনী, একতারার টনটনানীর সাথে ঘুঙুরের বোল্। একটু আগে গাওয়া, সে গানের রেশ এখনো মিলিয়ে যায়নি, আমাদের মন থেকে। মনের সেই রসসিক্ত কোটর থেকে, আবার বেরিয়ে পড়ে, ডানা মেলে ঝাঁপিয়ে পড়লো যেন, মঞ্জরীর আম আর শাল মিষ্টি গন্ধভরা গোটা শাল জঙ্গলটায়।

চুলোয় গেল খদ্দেরের জন্য চা বানানো। শ' খানিক লোক ঘিরে ধরেছে তখন আমাদেরকে। গোল হয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনতে শুনতে, মজে গেছে ওরা। কেউ হাতে তালি দিচ্ছে, কেউ বসে পড়ে দুই হাঁটুতে তালি মারছে, তবলা কী খোলের মত। কেউ কেউ হাতে টুসকী মারতে মারতে, মুখে বলে চলেছে—ধা-ধা-ধা—তেরে কেটে তাক্—তাক্, তাক্। সেও এক একবার চরকী পাক ঘুরে নিচ্ছে, ওদের সাথে সাথে। গানে মশগুল্ হয়ে, বসে বসে আমি শুধুই দেখতে লাগলাম ওদেরকে।

প্রাণের আর্ত্তি দিয়ে, গিরিকা যেন টেনে টেনে বের করছে, গানের অন্তর্লীন বেদনাকে। অনেকটাই রূপসী সে, মধ্য যৌবন তার। তারই দীপ্তি ছড়িয়ে, সে মন জয় করে নিয়েছে, সমবেত সকলের। ঝরঝর করে পড়তে লাগলো টাকা আর পয়সা। এতটুকুও ভ্রূক্ষেপ নাই সেদিকে তার।

গান থামিয়ে সে, আমার পাশে বসে পড়লো ধপাস করে। দু' হাতে আমাকে জাপটে ধরে, মাথাটা রাখলো আমার বাঁ-কাঁধে সে। বাঁ-হাত দিয়ে তাকে জাপটে ধরলাম, তার কাঁধে হাত রেখে। গিরিজা এসে বসলো ডান পাশে। ডান হাতটা তার কাঁধে চড়িয়ে দিলাম, "তোদের খুব ক্লান্ত লাগছে গিরিজা, একটু বিশ্রাম করে নে। আজ আর গান নয়। গলাকে বেশী কষ্ট দিস্ না। সব সময় সাথে লবঙ্গ আর কাবাবচিনি রাখবি। গলাটা ঠাণ্ডায়ও খুলবে, কিনে দেবো-খন।" কেঁদুলির বাজারে ও'গুলো পাবো বোধ হয়!"

এসে গেল চা আর সিঙ্গাড়া। পুলিশের লোকেরা বললো, "বাবা, চায়ের পয়সা আমরাই দিয়ে দিয়েছি। খেয়ে নিন আপনারা। ওঁরা কি আপনার কেউ হ'ন?" কি যে

উত্তর দেবো বুঝতে না পেরে, মিথ্যাই বললাম, "মেয়ে গিরিকা, আর জামাই এই গিরিজা। মেয়ে বড় হলেও, বাবার কাছে সে তো চিরকালই মেয়েই থাকে।"

পুলিশ ঃ "টাকা পয়সাগুলো কুড়িয়ে নিন বাবা।"

গিরিকা ঃ "ছুঁড়ে ফেলা টাকা-পয়সা-সিদে নিতে নাই, নিইও না। কুড়িয়ে না দিলে নেবো না। আমাকে ভিক্ষা দিয়েছো—কী ভালবেসে দিয়েছো, সেটা আগে তোমরাই ঠিক করো! আমরা ভিখারী না, ভিক্ষা করি না, গোস্বামীপাদ জয়দেবের গান গাই! ওইই আমাদের ধর্ম আর ওইই আমাদের দীক্ষা!"

দোকানদার লোকটা চায়ের কাপগুলো রেখে, কুড়াতে লাগলো টাকা-পয়সা, লুঙ্গীটাকে কোঁচড়ের মত করে। অনেকগুলো টাকাপয়সা হয়েছে বুঝতে পারলাম। সেগুলো সে এনে গিরিকার ঝোলায় দিয়ে দিলো। চা খেতে খেতে আমি এবার দেখতে লাগলাম গিরিকার পা দু'টো, আর তার মুখ। আজ দু'দিন ভাল করে খেয়াল করিনি।

ফর্সা সে মেয়ে। পায়ের পাতা দুটো অতি সুন্দর। বীরভূম আর বর্ধমানের, রুক্ষ শুষ্ক টাঁড় মাটিতে চলতে চলতে, বিবর্ণ হয়ে গেছে। লাল ধূলোর ছোপ পড়েছে তা'তে। মাথার গেরুয়াটা খুলে ঝেড়ে দিলাম, তার সুন্দর পা দুটো। আসল চেহারা ফিরে পেল গৌরী সে মেয়ের পা। লজ্জায় সে ছাড়িয়ে নিতে চাইলেও, ছাড়িনি তার পা।

—— "অমন সুন্দর পা দু'টোকে, নষ্ট করছিস কেন মা! হাটে মাঠে ঘাটে চলতে গিয়ে ব্যথা পাবি। চলতে ফিরতে, নাচতে পারবি না। জুতো পরতে নাই, কোন শাস্ত্রে বলেছে? তুই তো রাধার মত, পদ্মের পাপড়িতে পা রেখে চলিস না। চল্ তোর আর গিরিজার প্লাসটিকের নরম জুতো কিনে দিই। তোর পায়ে নুপুর খুব সুন্দর মানাবে। কাল কিনে দেবো। আজকে যতটুকু পয়সা আছে, তাতে কুলোবে না।"

আরও গভীর আবেশে জাপটে ধরলো সে আমাকে। মনের ভেতর খালি একটা প্রশ্ন বার বার করে ধাক্কা মারছে—এ' কী ওর বাবাকে পায় নি? তার স্নেহ আর আদর থেকে বঞ্চিত কী গিরিকা? কিন্তু বলতে পারছি না কিছুই। জানবার জন্য মন উসখুস করলেও. লজ্জা আর ভদ্রতা বার বার করে যেন, আমার মুখটাকে চেপে ধরছে। থাকগে, যদি বলার হয়—তবে ওরাই নিজে থেকে বলবে।

কন্যা বড় হলে ভয় লাগে, সে শেখে বিশ্বমাতা কী বিশ্ববেশ্যার ছলাকলা। অসহায় পিতা-ভ্রাতা-পুরুষ, তার ইচ্ছার কাছে তৃণ মাত্র। তাই শিব তার পায়ে ধরে পড়ে থাকে, শ্রীকৃষ্ণও তার পা মাথায় নেয়, আর ধুয়ে ধুয়ে জল খায়। বড় বিচিত্র এ' জগৎ। নিজের অপদার্থতা ঢাকতে, হামবড়া ভাব দেখিয়ে চলি আমরা পুরুষরা, সজ্ঞানে। বোকা পাঁঠা আর কা'কে বলে!

দুর্গাপুর থেকে ফিরে এলো বাস, যাবে দুবরাজপুর মোড় হয়ে সিউড়ি।

ও'বাসেই ফিরতে হবে আমাকে। উঠে পড়লাম আমরা সে বাসে। কন্ডাকটারকে তিনটা টিকিট দিতে বললাম। কেঁদুলি গিয়ে ওটা দাঁড়াবে আধঘন্টা। বাস চলতে শুরু করলো, অজয়ের বুকের উপর দিয়ে, গড়িয়ে চলেছে আস্তে আস্তে বাসটা, বোল্ডারের রাস্তা পেরিয়ে। ও'পথেই যায় বালির লরী, ট্রেকার।

সন্ধ্যার রক্তিম আভা পড়েছে শুকনো অজয়ের দিগন্তপ্রসারী সোনালী সোনালী বালির বুকে। ও'পারে কেঁদুলীর সেই কদম্বখন্ডীর ঘাটের কিনারায়, কে যেন মনে হলো বিছিয়ে রেখেছে, আরক্তিম আলোর পাটল উত্তরীয়। গোপীদের কাপড় কেড়ে নিয়ে ওখানেই কী জমা করেছিল কেষ্ট?

বাস এসে থামলো কেঁদুলীর হাটে। বেশ কিছুক্ষণ থামবে এখানে। নেমে পড়লাম আমরা। পাশের একটা জুতোর দোকান থেকে, ওদের দু'জনকে কিনে দিলাম বাটার স্যান্ডাক্—ঠিক আমার জুতোর মত। ওরা থেকে গেলো সেখানকার বাউল পাড়ায়, আর আমি ফিরে এলাম বাসে, ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে। ওরা তাকিয়ে আছে, বাসের ভিতর আমার দিকে।

আবার নেমে গেলাম ওদের কাছে। কিনে ফেললাম রাঙ্গা আলু, তরমুজ, শশা আর ফুটি বেশ কিছুটা। বেশ খানিকটা ওদের দিলাম, সন্ধ্যায় খাবে ওরা। চলতে চলতে এমনি করে, হৃদয় যে কোথায় জড়িয়ে যায়, কে তার খবর রাখে! কয়দিন পরে আমাকেও ফিরে যেতে হবে। শুধু স্মৃতিকে বুকে জাপটে ধরে, বেঁচে থাকতে হবে ঃ

অজয়ের তীরে দেখা হয়েছিল,
কি জানি, কী সে লগনে,
সেদিন ছিল না বরষা-মেদুর
মেঘেদের আনাগোনা,
তাল তমালের, শাল-মহুয়ার বনে!
বিদায় দিয়েছি প্রিয়তমদের—
সেদিন অশ্রুসনে!

.... সোমানন্দ অবধূত।

I came them across,
And that moment, I lost.

I roamed thither—
Through the Taal-Tamala,
The Mahua and the Shala

In mad March days;
With Tears—I paid the costs.

..........Somananda Abadhut.

হাতছানি দিয়ে আবার, ডাকলাম ওদেরকে। বললাম "কালকে এখানে থেকো তোমরা। যে দিকে মন চাইবে, সে দিকেই যাবো। এখানে নাকি **'ঝোপড়া' কুঠিয়া** ভাড়ায় পাওয়া যায় শুনি। এ' জায়গাটা যদি ভাল লাগে, তবে সে রকম থাকার একটা 'ঝোপড়া' ঠিক করে নিও। কোথায় রাস্তাঘাটে পড়ে থাকবে, কালবৈশাখীর দিনে। যাই হোক—কালকে আমাকে আসতে দাও।" সম্মতির মাথা নেড়ে গেল ওরা। ছেড়ে দিল বাস সিউড়ীর পথে। মনে গুমরে উঠছে একটাই কথা—**'মেয়েটাকে ছেড়ে এলাম'!**

টুকটাক দু'একটা মামুলী গল্প করে মার সাথে, গিয়ে বসলাম ভৈরব তলায়। মা বললো, "কারণ করবি নাকি?" বললাম, "নেই একটুকুও, সবটাই শেষ হয়ে গেছে। মিঠুকে দিয়ে একটা আনিয়ে রেখো কাল। তোমার কাছ থেকে টাকা দিও, পরে আমি তোমাকে দিয়ে দেবো।" সে বেটী হাফ একটা বোতল, তার 'সঞ্চয়' থেকে এনে দিলো। ভৈরবতলায় বসে, ভৈরবের মাথায় খানিকটা ঢেলে, নিজের গলায়ও ঢাললাম।

নির্জন এই আশ্রম, কয়দিন পরে গমগম করে উঠবে, হাজার হাজার মানুষের চেঁচামেচিতে। বাৎসরিক পুজা হবে দশ-পনের দিন ধরে। সে সময় পালাতে হবে আমাকে, সারাদিন অন্য কোথাও। রাত দশটার পরে, সবাই হয়ে যাবে ফুড়ুৎ। আমাকে ফিরতে হবে তখন। স্বার্থপর ধূর্ত্ত ওই সব ভক্ত লোক দেখলেই, গোটা শরীরটা আমার রি রি করে উঠে। ভক্তির নামে মার কাছে হারামে খিচুড়ি খায়, তাবিজ কবচ নেয়, আর মাকে কলা দেখায় গরীবপনা দেখিয়ে!

একটু একটু করে জমছে নেশা। কত কথা মনকে আলতো করে, ছুঁয়ে চলে যাচ্ছে। **ঝুমুর গান** নিশ্চয়ই জানে গিরিকা। কালকে শুধাবো তাকে। **টপ্পা**? টপ্পা সে কী জানে?' এমনিতরো কত কথাই, বলতে লাগলাম নিজেকে, সেখানে বসে বসে। মনের মধ্যে দেখতে পেলাম না আজ, শংকরখ্যাপার ছায়া ছায়া আনাগোনা। মুস্কিল হয়েছে, সে রকম লোক না পেলে, গপ্পো মারি কার সাথে!

অগত্যা জপে বসে গেলাম। বার বার করে শুধু, গিরিকার মুখ ভেসে উঠলো। আমার সমস্ত চেতনাকে, সে বেটী যেন ছেয়ে ফেলেছে! আমার অস্তিত্বের সব কোনায় কোনায়, তার নিঃশব্দ নুপুর-সঞ্চার, ক্ষণে ক্ষণে উন্মন করে তুলছে। চুলোয় গেল আমার জপধ্যান!

পরের দিন সকালে, আবার নামলাম বাস থেকে কেঁদুলিতে। কিনে ফেললাম গিরিকার নুপুর। ভেবে ছিলাম, বেজায় চমকে দেবো তাকে। ভেবে ছিলাম এ'ও যে,

রাধাবিনোদের মন্দিরে, হয়তো দেখা পাবো, গিরিকা আর গিরিজার।

আপন কন্যাকে মনের মত করে, গড়ে তুলতে পারিনি, আর আমার রুচিমত সে গড়ে ওঠেনি বলে, একটা সুপ্ত ব্যথা প্রতিনিয়ত মনকে কুরে কুরে খায়! তার পায়ের নুপুরের ছন্দে, বিশ্বমাতার পায়ল্ ছনক্ ছনক্ করে, বেজে উঠেনি বলে। খালি মনে হয়, বিয়ের প্রথম দিনে কালীঘাটে যে প্রার্থনা আমি জানিয়ে ছিলাম—'মাগো, তোর মত যেন, একটা মেয়ে আমি পাই—নিজের রক্তে মাংসে তৈরী কন্যাকে দেখে, যেন আমার সমস্ত সত্ত্বায়, এ' অনুভবের বান এমন ছুটে যে, তুইই আমার সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছিস'—সে প্রার্থনা ডাহা মিথ্যায় পর্য্যবসিত হয়েছে।

'রাজার বাড়ীতে পেটভরে খেতে পাবো'—এই ভেবে যে সব কুত্তারা দৌড়ায়, খাবার পাবার বদলে যারা শুধু ডাণ্ডাই খায়, তাদের মতো মিথ্যাই আমি মহাকালীর কাছে, মূর্খের প্রার্থনা করেছিলাম যে —তার মত যেন একটা মেয়ে হয়। আমার সমস্ত পূর্বজ পুরুষেরা তার পুণ্যে—কর্মপ্রচোদনায় অন্ততঃ মুক্তি পাবে!

মহাকালীর বাবা হ'তে চেয়েছিলাম। তখন বুঝিনি, ওই পাগলীকে সামাল দিতে, বহু জন্মের বহু বহু সুকৃতি দরকার! চুরাশী লক্ষ নয়, চুরাশী কোটি জন্মের বৃত্তের ঘূর্ণনকে, ঘূর্ণায়িত হ'তে হবে। আর তার পাকে পাকে আমাকেও ঘুরতে হবে, এই পাঁক থেকে উদ্ধার পেতে! এই চোর চামারের জগৎ—এই রাজনীতির জগৎ—এই হুকার-বেকারের জগৎ, যারা আমাকে .... ছেলে বলে, আমি কারুর কাছে যাই না বলে; কাউকে তেল মারি না বলে; সে জগৎটাকেও আমাকে চিনতে হবে।

আর সেটা আমি এতদিন চিনিনি, চিনতে পারিনি, অথবা চিনতে চাইনি বলে—ও' শালী' মহাকালী আমাকে বানিয়ে রেখেছে......... ছেলে! তা হলেই বুঝতেই পারছেন, আমার মেয়ে বা ছেলে কেমন হবে! অর্থ্যাৎ, পরতে পরতে রস নিংড়ে নিয়ে, ছিবড়ে করে রাস্তায় ফেলে দেওয়া! আমার বই **নর্মদা-তীর্থ হতে**—আট-টা খন্ড পড়ে কী বুঝলেন আপনারা? নিশ্চয়ই এটা বুঝেছেন যে, বেদবতী মাইয়ার মুখোশ পরে, নর্মদাই এসেছে আমার কাছে। সত্যি কথা বলি, বেদবতী আর কেউ না। নর্মদাই—বেদবতী—সে মহাকালীও!

আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া, আমার আত্মার অনুভবে ছায়া ফেলে, পালিয়ে যাওয়া তার পক্ষে, কোন কালেই সম্ভব নয়। কথায় আর কাজে আমি অন্য রকম নয় বলেই—বুক চিতিয়ে তার সামনে দাঁড়াতে পারি। অনেক আচ্ছা-আচ্ছা সাধুমহাত্মাকেও, কুত্তার বাচ্চার মত আমি কাঁপতে দেখেছি তার সামনে।

গুড্ডুবাবা এমন কি ছ্যাঁছড়াবাবাও, থর থর করে কাঁপে তার সামনে। তাই যতবার আমি আত্মহত্যা করতে চেয়েছি—সে বেটী কোঁচড় পেতে, বার বার করে আমাকে লুফে নিয়েছে, কমপক্ষে ত্রিশ—চল্লিশবার। তাকে দেখলে আমি ভয়ে কাঁপি

না, কাঁপে সে বেটী, নিজের সাম্রাজ্য সামলাতে!

'মুসলমানের মুরগী পোষার মত, আমাকে বাঁচিয়ে রেখে, সে বেটী কি করতে চায়; সেটা সেইই জানে। কিন্তু যখনই বলেছি তুমি আমাকে ধ্বংসের ক্ষমতা দাও, সমস্ত পৃথিবীটাকে আগা পাশতলা গুঁড়িয়ে দিতে দাও—তখন সে বেটী বলেছে—'কাম্ মেরা হ্যায়, তেরেকো কুছ নহী কর্‌না হ্যায়। কুছ্ ত্যু মুঝে মৎ মাঙ্গ। মাঙ্গনা মানা হ্যায়! নর্মদাতট্ পর আকে, কোই কুছ নহী মাংতা'!

বার বার মনে হয়েছিল—ও' শালি'কে সেঁটে তিন চার চড় লাগিয়ে দিই—ওর বাপের বিয়ে দেখিয়ে দিই—কিন্তু সেইই বার বার করে, আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে 'ভুটি' আর সুমনার অশ্রু-সজল মুখ, আর গভীর কালো চোখ—চড় মারতে গিয়েও, সে চড় আমার নিজের গালে পড়েছে—যন্ত্রনায় ছটফট করেছি—শুধু মা-আ-আ, মাগো-ও-ও-ও, বলে বার বার ককিয়ে উঠেছি।

চড় মারা আর হয়ে উঠেনি! নিজের ক্ষুধার অন্ন বেদবতীর মুখে তুলে দিয়ে, শুধু বার বার বলেছি—আমাকে ক্ষমা কর্ মা। পায়ে তার মুখ ঘসেছি পাগলের মত—আর যাকে এতই ঘেন্না আর অসমীহ করি—তারই বরদ পদারবিন্দে এতটুকু ঠাঁই পেতে 'পাগলস্য পাগল' হয়ে গেছি! ঝর ঝর করে অসহায় হয়ে কেঁদেছি!

আজ গিরিজা আর গিরিকাকে খুঁজতে গিয়ে মনে হয়েছে—সে তো আমাকে 'বাবা' বলে, তবে আমি *'বাবা-গিরি'* ফলাই! *জন্মসুত্রে একটা লিঙ্গ আমি পেয়েছি বলে, সেটা যে শিবলিঙ্গ তাইই বুঝে ফেলেছি, সেটাই আমার হয়েছে কাল! আমি শিবও নই, দুর্গার সাথে এক খাটে শুইও না।*

ওই বিশাল যোনীতে আকাশ প্রমাণ লিঙ্গ গলাতে গেলে, যে নক্ষত্রে জন্মাতে হবে, সে নক্ষত্র সাতাশটার মধ্যে একটাও নাই। নিজের সেই অণ্ডকোষ জাপটে ধরে, মনে হয়েছে আমি রাজা—আসলে আমি রাস্তার কুত্তা, পাড়ার লোকের বলা... ছেলে।

রাজার ব্যাটা কা'রা? ওরা, যারা—ট্রেনের টিকিট কাটে না, একটা ভোটের অধিকারী হয়েও, হাজারটা ভোট যারা—আঙুলের কালি মুছে ফেলে দিয়ে দেয়, যারা পঞ্চাশ—একশ' বিঘা জমি আর তিন তলা ঝাঁ চকচকে পাকা বাড়ীর মালিক হয়েও, এক টাকা মাত্র পঞ্চায়েতের ট্যাক্স দেয়—অথচ সেই পাড়ায় দু'কাঠা জায়গা কিনেও, পঞ্চাশ টাকা ট্যাক্স দিতে হয় আমাদের! কী ব্যাপার? না আমরা সরকারী চাকরী করি—সেটাই সবচেয়ে বড় অপরাধ! সরকারী চাকরী করি সেটাই জঘন্যতম পাপ—

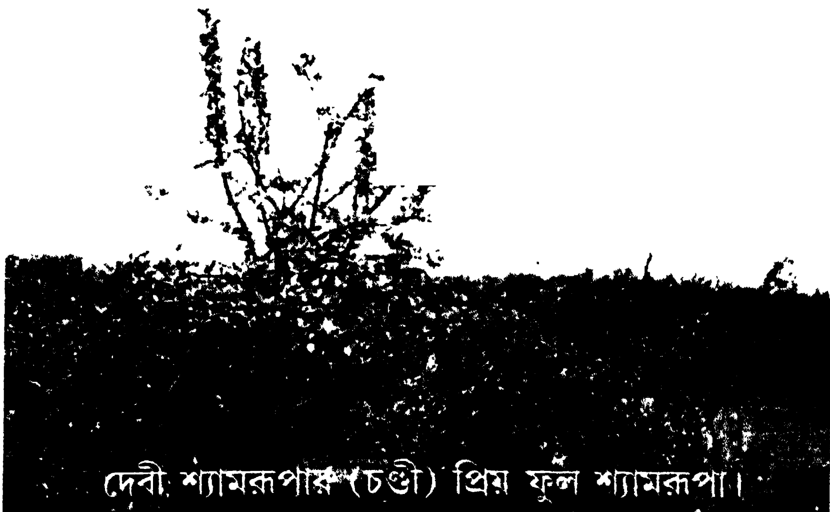
তাই র‍্যাশণ আর কেরোসিন আমরা পাবো না। গোটা কলকাতা আর পুরো মফঃস্বল জুড়ে, মাসে মাসে পার্টিকে মাসোহারা দিয়ে, আলু-কলা-মূলো আর চা-পান-চুল্লুর দোকান করে, কেন নিজেকে সর্বহারা বলে, বেকারদের দলে নাম

লিখাইনি, সেটাই অপরাধ। অপরাধ এ'ও যে, মাথার চুল গুনতি করতে পারলেও, কেন আমি পূজা-প্যান্ডেলের গুনতি করতে পারিনি!

স্কুল কলেজে যেটা পড়েছি—হাইকোর্টের চাকরীর সুবাদে, ফাণ্ডামেন্টাল্ রাইট্ বলে যা বুঝি, তার সবটাই ল্যাজা থেকে ডগা পর্য্যন্ত যে মিথ্যা, সেটা কেন বুঝিনি! কেন রাস্তায় চায়ের দোকান কী শেয়ালদা-গড়িয়াহাটার বাজারে, জামাকাপড়ের দোকান দিয়ে, রাষ্ট্রপতি কী প্রধানমন্ত্রী কী নিদেনপক্ষে কেন মেয়রের ভোটে দাঁড়াইনি! অথবা কেন M. P. হ'তে পারিনি! কেন 'কেলাস্ ফাইপ' পর্য্যন্ত পড়ে—পাঁচশ টাকা ঘুস দিয়ে কেন কেলাস্ এইটের সার্টিফিকেট্ কিনিনি? কেন টুকলি করে বাংলায় M. A. পাশ করেও, কেলাস এইট এর সার্টিফিকেট কিনিনি, ঝাড়ুদার-স্যুইপারের চাকরী পেতে?

কেন পুলিশ ভেরিফিকেশন-এর সময়, পুলিশকে জন্মদাতা পিতা বলে মেনে নিইনি—সেটাই হ'ল জঘন্যতম অপরাধ! জঘন্যতম অপরাধ এ'ও যে, বাটার এম্ব্যাসাডর্ জুতো পরে, এক্সিকিউটিভ জামা পরে, অফিসে কেন ঝাঁট দিইনি? কেন বলতে পারিনি যে আমি হাইকোর্টের জজ বা রেজিষ্ট্রার? নিদেনপক্ষে ডেপুটি রেজিষ্ট্রার! আর আমি কিনা গেছি রাধামাধবকে ধরতে, মা কালী আর শিবকে ধরতে, লক্ষ্য কোটি জন্ম যার জন্য অপেক্ষা করতে হয়!

আমার মত কুত্তার বাচ্চার আবার কেতাদুরস্ত চিন্তা? আজকের দুনিয়ায় আমি অচল। এটা বুঝতে, কাটিয়ে ফেলেছি ৫৫/৬০ বছর! শ্মশানও বলছে, আমাকে নাকি নেবে না! যাই কোথায়? বল্ মা তারা, দাঁড়াই কোথা?



দেবী শ্যামরূপার (চণ্ডী) প্রিয় ফুল শ্যামরূপা।



মজে যাওয়া রক্তনালা (ইছাই ঘোষের রাজত্বকাল)।



প্রায় ১২ শ বছরের পুরাতন তেঁতুলগাছ। ইছাই ঘোষের দশ-বারো জন কাপালিক এক সাথে এর কোটরে বসে সাধন ভজন করতো।



ইছাই ঘোষ আর লক্ষণ সেনের ভগ্নরাজপুরী।



বী শ্যামরূপা (চণ্ডী)।

র কাছে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে একে

পূজা করতো ইছাই ঘোষ। এই নাম সেই রে



রাজা লক্ষণ সেনের রাধাবিনোদ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ।

চতুর্থ অধ্যায়

বীরভূমের পথে-প্রান্তরে

কেঁদুলী আবার

কোথাও ওদেরকে না পেয়ে, খুঁজতে খুঁজতে চললাম **কদম্বখণ্ডীর** নির্জন ঘাটের দিকে। যেখানে আমি একান্তে শুনেছিলাম, ***"শ্রীকৃষ্ণের সেই বুকেই তোমার ইচ্ছা প্রতিবিম্বিত হোক, যে বুকে আঁকা আছে শ্রীরাধার মাইয়ের ছাপ, কুঙ্কুম আর মৃগনাভির ছোঁওয়ায়!"***

নিজের মেয়েকে হারিয়ে, পরের মেয়েকে আত্মজা বলে, আঁকড়ে ধরবার বালখিল্যতা। হঠাৎ খেয়াল হ'ল, কেউ যেন রিহার্সাল দিচ্ছে ঝুমুর গানের। একতারার সুরে আর ঘুঙুরের তালে মিলছে না সে গান। বার বার চেষ্টা করেও, তারা মেলাতে পারছে না তা'।

আমাকে দেখে ছুটে দৌড়ে এলো গিরিকা! হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, গান আর সুর সে মিলাতে পারছে না। বললাম, "মা, ঝুমুর-টপ্পা কী তুই গাইতে চাস? যদি বলিস, যদি তোর ভাল লাগে, তবে আমি লিখে দিতে পারি কয়েক হাজার গান, যা আমার পাঁচ-দশ মিনিট করে সময় লাগবে মাত্র!"

"নে, তোল্ তোর ডুগিতে বোল্, আয় মহামায়া,—তোর বাবা সরস্বতীর কলম্ পেয়েছে, যা সর্‌সর্ করে লিখতে পারে, যে কোন কবিতা! তার আগে পরে নে, তোর পায়ের এই নুপুরজোড়া! তোর জন্যেই এনেছি আমি, বাস থেকে নেমেই—সেটাই আজ আমার প্রথম কাজ ছিল!"

ঝড় উঠলো ডুগিতে, নুপুরজোড়া পরিয়ে দিয়েছে তাকে, গিরিজা আপন হাতে। আরে—আঃ, চৈত্রের নীল আকাশ নিংড়ে সে পাগলী, টেনে নামিয়ে আনছে—সুর আর ছন্দ, যাতে আমি বসিয়ে দিলাম এই কথার ফুলঝুরি ঃ

**"অজ্যয় লিলেক্, ছাড়াঞ
রে মোর রাধামাধব—সই,
মুই মর‍্যে যেছি সোন্‌ঝা-সকাল—
পিরীত কোরি, লাগর কই?**

ও' সইলো—সই, মোর
থনের বঁটায় দুধ যে উজায়,
পিয়াই কারে—বল্‌না সই,
অজয় লিছেক শুক্‌না বুকে
সবটা শুষ্যে—কী আর কই? .... সোমানন্দ অবধূত

সরলার্থ ঃ [অজয় আমার রাধামাধবকে নিয়ে নিয়েছে, সকাল সন্ধ্যায় আমি, কার সাথে প্রেম করি; বলতে পারো সই! আমার নাগরকে তো আমি খুঁজে পাচ্ছি না! আমার স্তনে যে অমিয়ধারা (দুধ) উজিয়ে আসছে, আমি সেটা কাকে পান করাই? অজয়ের শুকনো বুক, (শ্রীকৃষ্ণের) সবটা যে শুষে নিয়েছে?]

(Halo hark oh dear--dear, the Ajay has picked my Radhamadhava. In morn' or even', whom I share with lustful game? My dear ones now an untraced one, and my milchy breasts that are overflown, how could that be sucked off, if there's the none! Oh dear, had He been sucked off by the Ajaya?)

আরও একটা গান ঃ

"মউয়া ফুলের লেশা, হামার
পঁদের কাপুড় ছাড়াই্‌ লিছেক রে—
মাইয়ের মাঝের কিষ্ট ঠাকুর
পালাঞ যেছেক্‌ রে—
কঁটের পানি দিয়াঁ তারে
করবো পূজা রাত দু'প'রে—
সে যদি লাই ঠাকুর ঘরে,
কার বুকে মুখ রাইখব রে!
লেশা হামার চড়েঞ যেল,
আন্ধার, হোল্য জগৎরে—
সখী, মউয়া মুক্যে ম্যারাঞ্‌ দিছেক রে!"

.... সোমানন্দ অবধূত

সরল মানে ঃ—

(সখি, মহুয়া ফুলের নেশা আমাকে, উলঙ্গ করে ছেড়েছে। আমার কোমরের কাপড়টুকুও কেড়ে নিয়েছে। দুই স্তনের ফাঁকটায়, বুকের ভেতর যে কেষ্ট ঠাকুরকে

সংগোপনে রেখেছিলাম, সেও এখন পগার পার। যোনিধোয়া জলে রাতের নিরালায়, তার যে পূজা করবো ভেবেছিলাম! কিন্তু সে তো ঠাকুর ঘরেই নাই, আমি কার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদবো? হায় সখি, মহুয়াই আমাকে মোক্ষম করে ডুবিয়েছে!)

(Oh dear ones, I'm just betrayed by the Mahua and it made me nacked. It snatched my appron and clothings and that too, where the Krishna dwellth, hath departed. The dales of breats turned grey, I Kept Him off.there, and arranged for His Worship with aquous juice of my Vagina. The temple is now abandoned and I so presume, only the Mahua there haunted me!)

থামাচ্ছে না গান গিরিকা। নতুন গানের গন্ধে, সে খুঁজে পেয়েছে তার মনের নবান্নের গন্ধ। অজয়ের বাঁধের উপর বিশাল বটের তলায়, সে মেতে উঠেছে গিরিজাকে নিয়ে। একতারাতে গিরিজা সুর ভাঁজে, ঘুঙুর পরা পা ঠুকে ঠুকে, আর কান পেতে শোনে গিরিকা। ভুল হলে বলে—"হোল্য না গো লাগর—চড়া সুর দাও ক্যানে—মিঁজির মিঁজির (lifeless) কোরছেক্ গ'।" সাবধান হয় গিরিজা—উড়ে চলে তারা অন্য অন্য সুরে।

বাংলা-বিহারের সংযোগ ভুমি ওই বীরভূম, বাঁকুড়া আর পুরুলিয়া। পুরুলিয়ার গায়ে এখনো বিহারের গন্ধ লেগে আছে। গিরিকা চায় তার গান, শুধু কথার কচকচি হলে চলবে না, টাঁড় মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ, তা'তে থাকতে হবে। পুরানো গান সে বড় একটা গাইতে চায় না। নুতন কোন গান শুনলে, সে অত্যন্ত ধৈর্য্যের সঙ্গে চায়, সেটাতে তার বাউল মার্কা সুর বসাতে। বানিয়ে নেয় সে তার গানের নুতন এক বাউল সংস্করণ।

আমার অন্তর্লীন ইচ্ছার প্রকাশভূমি ওই কবিতাগুলোয়, মিশে আছে মেদিনীপুর—বাঁকুড়া— পুরুলিয়া আর বীরভূমের টাঁড় আর গেরুয়া মাটির গন্ধ; স্বাদে মেজাজে তা' প্রাণস্পন্দহীন প্রাচীন নয়—তাই সেগুলো অকৃত্রিম ভাবে, মনের দরজায় নাড়া মেরেছে গিরিকার।

ওদেরকে বললাম, " তোরা গান কর, আমি দেখি কিছু খাবার পাই কিনা। ব্যাগ আর ক্যামেরাটাকে ওদের কাছে রেখে, কমণ্ডলুটা নিয়ে আবার ফিরে চললাম বাজারের দিকে। কিছু মুড়ি-চিঁড়ে, কয়টা তেলে ভাজা, আর—বেশ গরম গরম চা নিয়ে, চলে এলাম দোকান থেকে। বুদ্ধি করে সে দোকানদার ভরে দিয়েছে, তিন চারটা প্লাসটিকের কাপ, তেলে ভাজার সাথে। চা দেখে মহাখুশি গিরিকা।

তাকে বললাম, "মা, চা-টা ঠান্ডা হয়ে যাবে। তেলে ভাজার সাথে খেয়ে নে আগে।" যতন করে সে ঢেলে দিল খানিকটা চা, রাধামাধব আর অজয়কে। তারপর

তিনটে কাপে ঢেলে, সে আমাকে আর গিরিজাকে দিল। নিজেও নিল সে। খেতে খেতে বললাম—"কতদূর তোরা পড়েছিস্ মা?"

—"যতদূর পড়ি, তোমার পারা পড়ি নাই গ'। বাবা তোমার সব কবিতা-গুলোই আমি লিখেঁ লিছি গ'। চুরি কর‍্যাঁ লিছি গ'!"

চুরি করে কবিতাগুলো লেখবার জন্য, মনে মনে খুশী না হয়ে পারিনি। এখন থেকে বাজবে তার সুরেলা কণ্ঠে, ওই আমার গানগুলো, যা আমি ভাবতেও পারিনি। মনটা তার কাছে আগেই চুরি গেছল, আর ও'তো সামান্য কবিতা! সম্মতির মাথা নাড়লাম শুধু, তাদের দিকে তাকিয়ে। খেয়ে উঠে গিরিকা বললো, " বাবা, একটা বর্ষার গান লিখেঁ দে ক্যানে!"

বললাম, " তোর নুপুরটা বাজাতো, দেখি বর্ষাকে এই খর বৈশাখের দিনেও, নামিয়ে আনতে পারি কিনা! ময়ূরের মত তুই সুরের পেখম ছড়িয়ে দে তো মা।"

" বাঁধ্না ক্যানে মাইয়ের খাঁচন্,
বিন্দ্যা ও' সই—বিশাখা,
মেগের বুকে সি ছুঁড়াটো,
দেয় দেখা—দেয় দেখা—দেয় দ্যাখা।

কদম গাছের উ' পারে,
তমাল গাছের উ' ধারে—
মিচ্কি হাসে লাগর হামার
খোলের খোলে দ্যায় ঠ্যাকা।

যাবক্ হামি তার কাছে,
ওই ময়ুরী ওই লাচে,
কাঁচুল্ খুলে থন্ দুটারে—
দ্যাখবে য্যখুন আন্দরে,
ভিজাই দিছেক ভান্দরে।

তমালছায়া ঘনাই যাবেক
রইবে না মন উচ্যাটন—
বাঁধনা ক্যানে জলদি সখী,
র‍্যাশম্ কীটের মাই-খাঁচন!"

...........সোমানন্দ অবধূত

(Fasten the brassieres, oh Visakha, Brinda, around my breast. I behold there in the cloud's corridor, my sweet love smiles, who beyond Kadama and Tamala trees playth on cloud-tom-tom and beconth me. The peacocks and hens distended tail-feathers. He while unknotting rain-aglint breasts and trampling too, would lessen my pangs. And you please do it now with my silky brassieres). ....Somananda Abadhut

বুঝিয়ে বললাম, "রাধা বলছে বৃন্দা আর বিশাখাকে যে, তাড়াতাড়ি তার কাঁচুলীটা(মাই-খাঁচন=Brassieres) বেঁধে দেওয়া দরকার। কদম গাছের ও'পারে— তমাল গাছের ও'ধারে যে মেঘটা ঘনাচ্ছে, সেটার ভেতর থেকেই সে নাগর উঁকি মারছে মুচকী হেসে হেসে। মেঘের মত বিরাট এক খোলে, সে যেন তাল ঠুকছে ঠ্যাকা মেরে, অর্থ্যাৎ মেঘ ডাকছে। রাধা যাবে তার কাছে, ময়ুর ময়ুরীরা পেখম মেলে নাচছে। ভিজতে ভিজতে যখন সে তার কাছে যাবে, শ্রীকৃষ্ণ ছোঁড়াটা যখন তার স্তন দুটো খুলে দেখবে, তখন মনটা আর রাধার আইঢাই করবে না। গুরুভার স্তন নিয়ে সে দৌড়াতে পারবে না। বলছে যে, জলদি করে 'রেশমের মাই-খাঁচনটা' বেঁধে দে"!

—— এই হ'ল গানের মানে—সুর বসিয়ে নে তোরা। মেঘের গুরু গুরু রব, আর ময়ূরের 'কেকা' যেন ধুয়া(repetition/ Burden) দেবার বেলায়, গুঞ্জন করে উঠে গানে গানে! তবেই দেখবি বর্ষার আবহ তৈরী হচ্ছে। আসলে, বাইরের জগৎটার সাথে আমাদের মনের জগৎটার মিল বড্ড অল্প। নে চেষ্টা কর্ তোরা, আমি শুনি। আমি তোদের থেকে অনেকটা দূরে গিয়ে শুনবো গান আর সুরের আবহ। কাছে থেকে ঠিক ঠিক বুঝা যায় না।"

যাকে যার ভাল লাগে, কুশ্রী বিশ্রী হলেও, সে তার কাছে সুন্দর, মনোহর। শ্রীরাধাকে আমি দেখিনি, দেখার সে সৌভাগ্য কোন্ প্রজন্মের জন্য তোলা আছে, তাও জানি না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আজ দেখতে লাগলাম গিরিকাকে। ধীরে ধীরে সে আর এক অন্য রূপে, মনের মধ্যে মেঘাচ্ছন্ন নিবিড় ছায়া ফেলছে—মায়া বিস্তার করছে।

সকালের স্নান, হাতে কপালে নাকে আঁকা তার অলকা-তিলকা, বৈষ্ণবীর পরিশুদ্ধ পোষাক, শাসনে না-আনা-স্তনভার. তার গুরুনিতম্বরেখা—সবটাই উন্মত্ত বাদলের, কদম্বের মত প্রকাশমান হচ্ছে। মাটিতে পাছা ঘসতে ঘসতে, সে পিছিয়ে এসে বসলো, আমার গায়ে হেলান দিয়ে। দূরে যেতে চেয়েও যাওয়া আর হলো না।

—— " বাবা, তুমি কী কখনো প্রেম করেছিলে, মায়ের সাথে? তোমার সেই যৌবন বেলায়?" মা কার মত দেখতে—তোমার মেয়ে আছে বাবা?"

—— "কেন বলবো না মা, আমার জীবনের সে অনেক কথা। গুহ্য রাখতে হয় সে সব, আপন অন্তরে। তবে এটা জেনে নে যে, যে আমার স্ত্রী—সে আমার অতি

আপন হয়ে গেছে—কবে, কেমন করে, তা' আমি জানি না। এই অন্তরের তন্ত্রীতে যে যত দারুণ করে নাড়া মারতে পারে, সেই তত আপন হয়ে যায়! জানি না, তোদের সাথে আমার, কোন জন্মের যোগসূত্র আছে কিনা!

কিন্তু মা, তুই কেমন করে, অধিকার করে নিলি আমাকে; এখনও তা' আমি বুঝে উঠতে পারিনি। কার ঘরে তুই জন্মেছিলি, কার বুকে আজ মুখ লুকাতে তুই উন্মুখ, এ'যে কে ঘটিয়ে দেয়—সে উত্তর যে আমার আজও, জানা হয়ে ওঠেনি মাগো। আমার অনেকগুলো মেয়ে আছে তোর মত। **সবচেয়ে বড়টার নাম কী জানিস—এই গিরিকা—জ্যান্ত সরস্বতী।"**

আনন্দের অশ্রুতে ভাসতে ভাসতে, আমার মুখের দিকে চাইলো গিরিকা। গিরিজা বুঝে সে চাওয়ার মানে। অসম্ভব এক পরীক্ষায় আমি কূলহারা। খড়কুটোকে আঁকড়ে ধরার মত, জাপটে ধরলাম গিরিজাকে বাঁ হাতে, ডান হাতে গিরিকাকে। পুরুষশাসিত সমাজে, সে হয়তো পায়নি অনেক কিছু। কিন্তু কী যে সে পায়নি, না বুঝলেও—বুঝতে এটা কষ্ট হয় না যে, *সে সতত তার বাবাকে খুঁজে। তাই নিঃসঙ্কোচ এই সমর্পন, এই এক অচেনা সাধুর কাছে। লাল কাপড়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকা, আমার মত এক অতৃপ্ত পিতাকে, সে বের করতে চাইছে, চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়ে।*

প্রতিটি কাজের জন্য, তার উপকরণ লাগে। আমার কাছে থাকেও সে উপকরণ কিছুটা কিছুটা। কিন্তু আজ তার এতটুকুও নাই। কেনা হয়ে উঠেনি সে জিনিস। গিরিজাকে বললাম—"তুই জানিস, কোথায় মাল পাওয়া যায় এখানে? বিলাতী পাবি? যদি পাস, তবে হুইস্কি নিবি—পাঁইট।"

মাথা নেড়ে সে টাকা নিয়ে চলে গেল। বসে রইলাম আমি আর গিরিকা। সুরভিত তার মাথাব চুলে, মুখ গুঁজে বসে রইলাম। কী দিয়ে যে সে, অঙ্গ-প্রসাধন করে—সেই জানে! আজ যেন বকুল বকুল গন্ধ ছড়াচ্ছে, তার একরাশ কোঁকড়া চুলে। মুখ গুঁজে রেখেই বললাম, "মা, বকুল গন্ধ কোথায় পেলি, বলতো?"

—— "আতর-সেন্ট কিনার পয়সা লাই গ'। বকুল কুড়াঞে ভাঁড়ে ভিজাই রাখ্যি। চান্যের পর—ওই জল্যে আবার চুল ভিজাই। সুগন্ধ ঘুরে মরে ওখেনটায় গ'! যখুন যে ফুল পাই, তাই চট্‌কে অঙ্গারতি করি বাবা। বাবা, শরীরট্যারে বেড় দিয়েঁ সে রাধামাধব নাকি ঘুরে বেড়ায়? তুমি দেখেছ, বল ক্যানে?"

—— "সাধু মহারাজরা তো, তাই বলে মা। মিথ্যা হয়তো বলে না ওরা। তবে আমিও কিছু কিছু, সে রকম দেখেছি। সে বড় সুন্দর এক মুহূর্ত—তুইও হয়তো দেখা পাবি একদিন তাঁর—হয়তো তোকে ঘিরে ঘিরেই, তিনি কোন একদিন বেরিয়ে

আসতে পারেন। তাঁর ইচ্ছা আর অনিচ্ছাকে বুঝা বড় মুস্কিল। তাঁর পথ চেয়ে থেকে থেকে, শুধু নিজেকে কষ্ট দিস না।

একটু একটু করে নিজেকে সাজাতে সাজাতে, নিজের অজান্তেই একদিন পরিপূর্ণ সজ্জা তুই করে ফেলবি। আর সেদিনই আসবে সে মনোহরন, সেখানে আসন পাততে। সেদিন পূর্ণ হবে তোর সারা জীবনের গোপন অভিসার। দুঃখের ভিতর দিয়ে সে আসে বলে শুনি—এসে গেলে নাকি, সব যন্ত্রনার পরিসমাপ্তি ঘটে। মাগো, সে অনুভব তো আমার আজও হয়নি, তোকে বলি কেমন করে।"

কথায় মশগুল ছিলাম আমরা। বুঝতে পারিনি গিরিজা কখন ফিরে এসে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে হুইস্কির বোতলটা নামিয়ে রেখে, সে আমাকে প্রণাম করলো গভীর শ্রদ্ধায়। হঠাৎ প্রণামের ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে, আমি আর গিরিকা, তার মুখের দিকে তাকালাম।

—— "আমার মনে পাপ জেগেছিল বাবা, তুমি আর তোমার মেয়ে, আমাকে ক্ষমা করো। আমি পাপী বাবা। মনের মধ্যে সন্দেহের কাঁটা থাকলে, খচ্‌খচ্‌ করে ব্যথা দেয় সব সময়। সেটাকে তুলে ফেলতে হয়, সব কাজ ফেলে রেখে।"

দু' দিনের এই সাহচর্য্য, একদিন না একদিন ওদের জীবনে বিষকে বহন করবে, তার মূলোৎপাটন করা দরকার। তাই বললাম, "তা, আমার আর গিরিকার শরীর ঘিরেই কি, তোমার মনকে সন্দেহে দোলা দিয়েছিল?"

—— "হ্যাঁ বাবা, গিরিকার শরীর।"

—— "এখন কী বুঝলে, গিরিজা?"

—— "বুঝলাম আর যা দেখলাম, তা'তে নিজেকে আমি আর, ক্ষমা করতে পারছি না। দুই পিতাপুত্রীর এ' গভীর আবেশ, আমি আর আগে দেখিনি। সংসারে তো নয়ই, বাউল জীবনেও না। বাবা, এমনি করে আমারও ইচ্ছা করে, ওর মাথার ঘ্রাণ নিতে। কিন্তু সে তো আমার সাধন-সঙ্গিনীর, আমারই ঔরসজাত কন্যার নয়। বলো বাবা, বাউল হলেও আমাদের ঘর সংসার বাঁধতে হয়।

যদিও বন্ধনহীন জীবনই শ্রেয়, তবুওতো বন্ধনে বাঁধা আছি আমরা, হাজার পরিবেশে। গিরিকাকে বুঝিয়ে বলো বাবা', ও' যেন আমাকে ওরই মত, একটা কন্যা উপহার দেয়। অমনি করে তার মাথার চুলে মুখ লুকিয়ে, পড়ে থাকবো 'বাবা' হয়ে। বাবা, আমি ভেবেছিলাম অন্য রকম।

তোমাকে আমি চিনি না—জানি না। তোমার কথা যে অত উঁচু-দরের, সেটা দাঁড়িয়ে থেকে শুনে শুনে বুঝলাম। অসমর্থ নও তুমি, নয় গিরিকাও— তাই মনে

হয়েছে যে, ওখানে মন ভুলানো প্রেমের গল্প চলছে, দু'জনার মধ্যে। চলছে, যা স্বাভাবিক দুই সমর্থ নারী আর পুরুষে।

নিজের ভুল বুঝতে পেরে, তাই আর নিজেকে, ক্ষমা করতে ইচ্ছা হচ্ছে না। আমাদের সমাজে যা' হয়, আজ মালাবদল কী কণ্ঠী বদল তো, কাল ছাড়াছাড়ি। একদিন এই মূর্খতা বশে হয়তো, আমিও অন্যায় করে বসবো, তোমার মেয়ে এই গিরিকার সাথে। কিন্তু বিমুগ্ধ বাবা আর তার আদুরে মেয়ের যুগলরূপ—এভাবে কখনও কোথাও দেখিনি।"

গিরিকা আর গিরিজাকে বুকে জাপটে ধরলাম। মনের মধ্যে গিরিকাকে হারানোর, ভয়ের মেঘ তার কেটে গেছে। বৃষ্টিস্নাত আকাশের মত সে নির্মল এখন। জাপটে ধরলো সে গিরিকার পা—"তুই সই ক্ষমা করে দে আমাকে। আর ভুল বুঝবো না তোকে। সীতার মত তোর আজ অগ্নি-পরীক্ষা হয়ে গেছে।" পা ছাড়িয়ে নিল না গিরিকা। শুধু আমার মুখের দিকে, চেয়ে রইল আদরিনী কন্যার গভীর গভীর প্রত্যয়ে, তার কাজল কালো দু'চোখ মেলে।

—— "মা, আজ গিরিজা যে ভুল করেছে, সে ভুল তুইও কোন দিন করতে পারিস। মনটা যে বড় অচিন জগৎ মা। ওর আকাশে কখন যে মেঘ ঘনায়, সেটা আগে ভাগে তো জানা যায় না। ক্ষমা করে দে তুই গিরিজাকে।"

টসটস করে পড়ছে তার চোখের জল। পিপাসার্ত্ত তার ঠোঁট, এগিয়ে এলো আমার ঠোঁটের কাছে। গভীর আশ্লেষে চুমু দিয়ে ফেললাম গিরিজাকে। গিরিজার মাথাকে জাপটে ধরে, চুমু দিলাম তাকেও। তারপর ঢেলে ফেললাম চা খাওয়া কাপে তিন জনের জন্য তিন পেগ হুইস্কি। গলায় ঢেলে নিলাম কাঁচা কাঁচা (raw)। পাশের কুঠিয়া থেকে গিরিজা নিয়ে এলো জল। সবাই একটু করে খেলাম। আবারও নিলাম এক পেগ করে। একটু একটু করে লাগছে নেশা। মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা, সুরের ভাণ্ডারে তা' পরশ রাখছে গিরিকা—গিরিজার।

ওদিকটায় লোক প্রায় চলে না বলতে গেলে। রাস্তায় ঘাটে ঘুরে বেড়ানো আউল-বাউল ছাড়া, নিরালা আশ্রয় কেউ খুঁজে না। আমাদের তিন জনকে এক জায়গায় দেখে, এক ফোঁটা-কাটা বৈষ্ণব জয় রাধে বলে স্বাগত জানালো। তার কুঠিয়ায় সে আমন্ত্রণ জানালো আমাদেরকে। কারো কুঠিয়ায় যে আমরা যাই না—সে কথা জানাতে সে বললো, "আমার রাধামাধবের ভোগরাগের, প্রসাদটুকু অন্ততঃ তোমরা নাও।" কী আর করা যায়। উঠে পড়লাম আমরা তার অনুরোধে।

গান ধরেছে গিরিকা আর গিরিজা। আমারই লেখা সেই গান, একটু আগে যা আমি তাকে লিখে দিয়েছিলাম। বর্ষার গান—-খর বৈশাখে। বেলা হবে তখন প্রায়

দশটা। বিচিত্র গান আর তার কথা, সেখানে বসানো সুর, পাগল করে তুলেছে বুড়োকে। মেতে উঠেছে সেও গানে গানে। গানের আগে আগে সে নেচে চলেছে। যোগ দিয়েছে আরও অনেকে। সে এক আনন্দের পশরা, ওরা যেন মেলে ধরেছে, কেঁদুলীর কদম্বখণ্ডীর ঘাটের পাশে। ঘুরে ফিরে গাইছে ওরা গানটা। *" বাঁধ্‌না ক্যানে জলদি সখী, রেশম্‌ কীটের মাই-খাঁচন! ও' বিন্দা, ও বিশাখা.........."!*

সবাই চলে গেল গান শুনে। প্রসাদ পেলাম আমরা, রাধামাধবের ভোগরাগের। সিদাও পেলাম তিন জনের। আবার ওদের কুঠিয়ায় আসবার আমন্ত্রণও পেলাম। *শ্মশান জাগবার মত, এমনি অনেক কুঠিয়ায় থাকে বাউল বৃদ্ধ বৃদ্ধারা। রাধাকৃষ্ণের নাম করে, দীক্ষা দেয় শিষ্য বানায়। যুগযুগ ধরে চলে আসছে এই প্রথা। পাখী আসে আর পাখী উড়ে যায়, রাধাকৃষ্ণ দেখা দেয় না, ভারও নেয় না। একদিন ওরা দেখে মাথার চুলে পাক ধরেছে, চোখ হয়েছে ঘোলাটে । শরীরের সমস্ত কলকব্জায় লেগেছে ঘুণ। রাস্তায় ঘাটে হকারের দোকানের মত, মালিক বদল হয় কুঠিয়ার— রাধা-কৃষ্ণকে নিয়ে চলে রমরমা ব্যবসার সাথে, দেহ ব্যবসাও।*

ইদানিং আফিম-গাঁজা-মদ, আর হেরোয়িন এসে জুটেছে। রাজা-উজীর-বাদশা-ফকীর সকলেরই, তাই পায়ের ধূলো পড়ে, এই সব কুঠিয়ায়। কেউ কেউ রাজনীতির আখড়াও বানায়, ওটাকে কেন্দ্র করে ভোটের সময়। চলে ভোট আর ভেটের, রমরমা গোপন কারবার। কুঠিয়ার আঙিনায় কীর্ত্তনের বদলে, চলে পার্টির মিটিং, হ্যাজাক লাইট জ্বেলে। ধর্মও হলো—রাজনীতিও হলো। এ' ব্যাপারে কোন বুদ্ধিমান লোকের, এলার্জি থাকা কি উচিৎ? এলাহি কারবার, এলাহি ভরসায়!



পঞ্চম অধ্যায়

বীরভূমের পথে-প্রান্তরে

পাণ্ডবেশ্বরের পথে

উঠে পড়লাম আমরা কুঠিয়া থেকে নমস্কার জানিয়ে। অজয়ের পাড়ে এসে উঠলাম আবার। ওদেরকে বললাম, " আজ সারাদিন আমার কোন কাজ নাই। শুনেছি ওদিকটায় নাকি পাণ্ডবেশ্বর! অজয়ের তীরেই নাকি প্রাচীন সে তীর্থভূমি। একবার ইচ্ছা আছে ওদিকে যাবার। তোমরা কোন দিকে যাবে?"

—— "আমাদেরও ঠিক নাই বাবা! যেথায় সূয্যি ডুবে সেথায় থাকি। যা' জুটে তাই খাই। রাধামাধবের ইচ্ছা যা' হয়---তাইই হয়। পাণ্ডবেশ্বর, সে তো অনেক দূর বাবা, অজয়ের পাড় ধরে এভাবে হেঁটে যেতে যেতে, সন্ধ্যা হয়ে যাবে। কী করবে তুমি ভেবে দেখো বাবা। আমাদের মনে হয়---হাঁটা ঠিক হবে না!

চিন্তায় পড়লাম খুব। হাঁটতেই যদি সন্ধ্যে হয়ে যায়, তবে সে জায়গাটার চার পাশ দেখবো কেমন করে? ফটো তুলতে গেলেও, আলো দরকার। সবটাই মাটি হয়ে যাবে---হবে সেটা পণ্ডশ্রম। থমকে গেলাম। গিরিকা বললো যে, আসানসোল-সিউড়ীর বাসে গেলে, তাড়াতাড়ি হবে।

কাছে মাত্র শ' খানিক টাকা পড়ে আছে। ওরা পিছু নিলে, প্রায় পঞ্চাশ ষাট টাকা খরচ হয়ে যাবে। গিরিকা বললো, "বাবা, এখন যে বাস আসবে, চলো যাই, সে বাসে সবাই আমাকে চেনে। একটাও পয়সা নেবে না। তাড়াতাড়ি পৌঁছে যেতে পারবো, সাড়ে বারটার মধ্যে। সারাদিন থাকবো সে পাড়ায়। সন্ধ্যেবেলায় পাণ্ডবেশ্বরের মন্দিরে, থেকেও যেতে পারি!"

—— "দেখ্ টাকা আমার কাছে যা আছে, তা'তে চলে যেতে পারে। তবে আমার **'খাবার'** কেনা হবে না। ওটা আমারতো কিছুটা লাগেই। যদি বাসও'লা পয়সা না নেয়, তবে উঠে পড়ি চল্। তবে একটা কথা, আমি তো কখনও, এমনি এমনি যাই না। আমি টিকিট কেটেই না হয় যাবো।"

—— "না, তোমাকে আমরা টিকিট কাটতেদেবো না। চলো না, তোমাকে পয়সা

ওরা চাইবেই না। ওদের মালিকের বারণ আছে। সাধুসন্তদের কাছ থেকে পয়সা ওরা চায় না। গাড়ীর নীচের মেঝেতেও, বসে যেতে হয় না। আমরাতো ওইটুকু পথ যাবো!"

—— " তবে তাই চল্। দুবরাজপুরের উপর দিয়েই তো যাবো।"

গিরিজা-গিরিকা আর আমি, দাঁড়িয়ে থাকা বাসটায় উঠলাম। কন্ডাকটার—হেল্পার—ড্রাইভার খেতে গেছে। আমাদের পেট তো, রাধামাধবের ভোগরাগের প্রসাদে ভরেই আছে। গিরিকার কথা বিশ্বাস হ'ল না। আমি রেডি থাকলাম, টিকিট কাটার জন্য। ওদের এই রকম জীবনে, আমি অভ্যস্ত নই। যা' কিছু সহজ ওদের কাছে, সেটা কঠিন আমার কাছে।

জীবনটা সে ভাবেই গড়া হয়ে গেছে। গড়িয়ে চলেছি ঘাট থেকে ঘাটে, ধাক্কা খেতে খেতে। বাস ছাড়লো সিউড়ির পথে। সবার টিকিট কাটছে কন্ডাকটার। আমার কাছে এসেও, অন্যের টিকিট কেটে চলে গেল। গিরিকা মিষ্টি করে হাসলো একবার, তার দিকে চেয়ে। চলতে শুরু করেছে বাস।

কন্ডাকটার প্রদীপ, গিরিকাকে বললো—"গিরি-দি' একটা গান শোনাবে না? অনেক দিন তোমার গান শুনিনি। পায়ের ধুলো দাও।" তারপর সে আমার দিকে চেয়ে বললো, "বাবা, আপনাকে তো আগে দেখেছি বলে মনে হয় না। এই জেলায় থাকলে কোথাও না কোথাও, অন্ততঃ আপনাকে দেখতে পেতাম? মনে লয় আপ্যুনি অন্য কুথাকার!"

—— "বেটা, আমি তো কলকাতায় থাকি। বেড়াতে এসেছি তোমাদের বীরভূমে আর বর্দ্ধমানে। বড় ভাল লাগে, এই আধা-পাহাড়ী জায়গা বীরভূম। বেটা আজ পাণ্ডবেশ্বর যাবো। দেখবো ও' জায়গাটা। কিছু ছবিও নিতে হবে। টুকটাক লেখালিখি করি তো! তাই ঘুরতে হয় এদিক ওদিক।" গিরিকা আমার বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে বললো, "বাবা, প্রদীপ বড় ভাল ছেলে। তুমি ওর মেয়েকে আশীর্বাদ করবে না!"

বড় কঠিন পরীক্ষা এটা। আমি কী করবো বুঝে উঠতে না পেরে বললাম, "বাবা, মেয়ের জন্য সবাই তটস্থ হয়, সে পরের ঘরে যায় বলে। বৌমা, যে তোমার ঘরে এসে, তোমার মেয়েকে ডেকে এনেছে; তার দান কী তুমি কম মনে করো? আগে তাঁকে মনে মনে প্রণাম করতে শেখো। স্ত্রীকে 'মা' বলে মেনে নিও।

কারণ সে তোমাকে আর তাকে, তোমার পিতৃকুল আর মাতৃকুলকে, সমস্ত উৎসাহে বেছে নিয়ে, জন্ম দিয়েছে না তোমার মেয়েকে? ফলে মেয়ে শুধু মেয়ে নয়। মা আর সেই শাশুড়ি, যাঁরা রূপ নিয়েছে কন্যাতে। আব তোমার কন্যার মা, তোমার বউ, যে তোমাকেই জন্ম দিয়েছে মেয়ে করে। বিচার করে দেখো, তুমি তাকে কি

দিচ্ছো, কী দিচ্ছো না! প্রদীপ এ' বড় কঠিন কথা, অনেক গভীর আর গোপনে সে কথাটা বুঝতে হয়।

গিরিকা আমার ধর্ম-মেয়ে, আর গিরিজা আমার জামাই। তো বাবু-রে, আজ যদি ওরা একটা মেয়ে ডেকে আনে, তবে সব রকমের মমতা আর সুরক্ষা না, ওদেরই তাকে দিতে হবে! তোমার স্ত্রীকে আমি দেখিনি, দেখিনি তোমার মেয়েকেও। তবু বলি, আমার দৃষ্টির আড়ালে ওরা নাই। আজ বাড়ি গিয়ে বুঝবে সেটা। যাকে ডেকে এনেছো, জীবন গেলেও, তাকে দেখতে হয়— সে তো ইচ্ছা করে তোমার বাড়ি আসেনি !

এত অবহেলা কেন? মেয়ে বলে? মেয়ে না, ওরা মা! ও'রকম এক মায়ের যোনি থেকে, তুমি আমি সবাই এসেছি? মাকে সম্মান জানাতে হয়— সে বিশ্ববেশ্যা হলেও! তাকে যাচাই আর বিচার করার ক্ষমতা, কোন সন্তানকে কোন কালেই দেওয়া হয় নি, কোন নিয়ম—কোন শাস্ত্রে!"

বাস চলছে। তবুও অনেক গভীর অভিনিবেশ সহকারে; শুনলো সে কথাগুলো। ড্রাইভার-–হেল্পারকে কী যেন সে বলে এলো। তারপর বললো— "'গিরিদি' গান শুনাবে না?" শুরু করলো—সেই গান " **চৈত্র এখানে ঘুরে মরে হায়, হারানো প্রিয়ায়!"** মেঝেতে বসে পড়েছে সে। পা ঠুকছে তাল রেখে। গিরিজা বাসের রডটাকে বাঁহাতে আঁকড়ে ধরে, ডান হাতে একতারাটায় সুর তুলছে টুং টুং।

গোটা বাসটাতে সবাই পাগল হয়ে উঠেছে। পাঁচ টাকা, দশ টাকা সবাই ফেলছে ছুঁড়ে ছুঁড়ে। ভ্রূক্ষেপ নাই গিরিকার সে দিকে। সে পাগল হয়ে গেছে গানে-সুরে-কথায়! **বুঝতে পারছি না, সে কেন এমন পাগল হয়ে উঠে, আমার কিম্বা গোস্বামীপাদের লেখায় সুর দিতে গিয়ে!**

খুব সাধারণ বিদ্যায় তো—তুড়িমারা যায়, রামকে শ্যাম বলা যায়—কিংবা সংকেতে বাপকেও .... ছেলে বলা যায়। আজকাল-কার শিক্ষাটা সেখানে, কেতাদুরস্ত। জামা-প্যান্ট-জুতা খুলে ফেলে, ল্যাংটা হতে বলে। গিরিকা তবে কতটা গিরিকা, যার তল আমি আজও খুঁজে পাইনি। 'মাগো-ও-ও, ক্ষমা করে দে তোর এই বাবাকে। মনে মনে এ লোকটা, অসম্ভব অহংকার বয়ে বেড়ায়, মনে করে একমাত্র ওইই শিক্ষিত'।

সবচেয়ে অবাক করেছে তার সুরের জ্ঞান। ঝুমুর হবে, কী টপ্পা হবে অথবা বাউল সুর, সেইই সেটা ঠিক করে। গান গাইতে আমি জানি না। লিখতে পারি নিমেষে নিমেষে শত শত কবিতা। আমি কী লিখছি, আমি নিজেও বুঝি না। কিন্তু যখন সুরের আল্পনা মেখে তা' বেরিয়ে আসে—ডুগি আর নুপুরের তালে, ঘুঙুর আর একতারার

সুরের মূর্ছনায়—তখন গিরিকাই বলে দেয়—'বাবা, ওটাই তোমার ক্রিয়েশান্!'

মা, মাগো, তোর পা দু'টো দে মা, আমাকে একমাত্র তুইই চিনিয়ে দিতে পারিস! আমার আর কোথাও, যাবার দরকার নাই! তোর আয়নায় আমাকে দেখতে দে মা! মাগো, দে না তোর দুটো পা, বিশ্বমাতার পায়ের মত আমার মাথায়।' "দেহি পদপল্লবম্ উদারম্।"

বাসের মধ্যে ওই বালখিল্যতা সাধারন মানুষ বুঝবে না। বুঝবে না এ'কথাও যে, কোথায় লুকিয়ে থাকে—লাল মাটির যন্ত্রনার মেঠো সুর! তবুও বলি, কন্যা—মাকে এড়িয়ে বাবাকে বুঝে নেবার চেষ্টা করে? সে কী শুধুই অয়দিপাউস কমপ্লেক্স? না—মিথ্যা! পুত্রের চেয়ে কন্যার মনে ইমপালস্ আরও গভীর করে ব্যঞ্জনা রাখে। আর তাই, সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি তার বিপক্ষে গেলেও, ক্রেয়নের মত নিষ্ঠুর রাজা-মামাকেও পরোয়া করেনি সে আঁতিগোনে। তার দুই ভাইয়ের কবরে, সে ঠিকই দিতে পেরেছিল শেষ মাটি, রাজার আজ্ঞাকে তুচ্ছ করে, থুতু ছিটিয়ে দিয়ে।

থিবস্ নগরীর বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া, দুই সহোদরের দেহকে বুকে জাপটে ধরে, কান্নায় ককিয়ে উঠেছিল সে। রাজা ক্রেয়নের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে, জীবন আর মৃত্যুকে পরোয়া না করে, সে কবরস্থ করতে পেরেছিল তাদের। সাবাস গিরিকা, সাবাস্ গিরিজা—তোরা আমার প্রণাম নে! তোরা আমার স্বরূপটাই বুঝিয়ে দিয়েছিস আমাকে আজ রে মা!

নেমে পড়লাম বাস থেকে অজয় পেরিয়ে। সামনে কোলিয়ারীর অফিস। সেটা পেরিয়ে ডানদিকে হনুমানজীর এক দশাশই মন্দির। তারও নীচে অজয়ের ঢালে নেমে, একটা সরু পায়ে চলার রাস্তা ধরে, মিনিট তিনেক হাঁটবার পর, পেলাম সেই প্রত্যাশিত **পাণ্ডবেশ্বরের মন্দির**। এই পাণ্ডবেশ্বরটা কে? ব্যোমভোলা শিব।

ওই ল্যাংটা বাবাজীকে, পূজাপাটে খুশী করে, গাঁজাভোগ চড়িয়ে, সিদ্ধি ঘুটে—সিদ্ধি পেয়েছিল—কুন্তী। ওর ব্যাটারা নয়। কারণ, ছেলের আগে, ছেলের মাকে খুশী করতে হয়। না হ'লে যে পুংদণ্ডটা নিয়ে এত বড়াই, বড় বড় ফুটানীর বাত্ আমরা ঝাড়ি, সেটাকে সে নারী খচে গিয়ে, ছিঁড়ে নিতে পারে—অথবা কেটে নিতে পারে। সব মেয়েই শালা মা কালী—কী খ্যাপা কালী! হাতে তার সব সময় খাঁড়া কী বঁটি থাকেই। তাই ওদেরকে খচাতে নাই।

ক্ষমতাবান বা ক্ষমতাবতীকে কখনও চটাতে নেই। কেন নেই? ক্ষমতাটা অন্য কারুর নয়, ক্ষমতাটা ঈশ্বরের, যার ক্ষমতা পেয়ে ওরা—সমস্ত সমাজে অত্যাচার করে চাঁদা তুলে, তোলা আদায় করে কী দু'চারটা বোমবাজি করে অথবা একটা লোকের গলা কেটে কী তাকে গুলি করে—শুধু ভয় ছড়ায়, যাতে অন্য কেউ আর সাহস না

করে প্রতিবাদ করতে।

প্রতিটি জীবের ঈডিপাস কম্‌প্লেক্স (OEDIPUS COMPLEX—Sigmund Freud Complex) কুন্তীর যেমন ছিল, তেমনই আবার ছিল ওই পাঁচটা বাচ্চার জন্য মঙ্গল কামনা! সিংহীর কোল থেকে সিংহ যেমন একটাকেও খেতে পারে না, তেমনি কুন্তীর রান্না ঘরে, শিবের বাপও খুনতি নাড়তে পারেনি। যৌবনের আগেই সে যোনী পেতে দিয়েছিল, ঝকমকে কেতা দুরন্ত এক লিংগ সর্বস্ব পুরুষকে। কী নাম সে ছোঁড়াটার—সূয্যুই হবেক বটে! ল্যাং মেরে দিয়েছিল সূয্যু তাকে, পেটটা ফুলিয়ে দিয়ে।

আর কুন্তী সংসারের খুন্তি নাড়তে নাড়তে, মোটা পাছা সামলাতে সামলাতে বুঝে ফেলেছিল, পাছায় কাঁছা থাকলে—বাছারা বেঁচে বর্তে থাকবে না। পাছাটাকে একটু আলগা করে তোল, ছটকে এসে পড়বে ওই যম-সূর্য্য-ইন্দ্র-পবন। আর এই হলো, আমাদের ওই মহারাণী কুন্তী পিসী। ব্যাটার কাছে শুয়েছে, তার বাপের কাছেও কুন্তী শুয়েছে।

প্রথম যৌবনে সূর্য্য, আর মধ্য যৌবনে পাণ্ডু। তার আবার বীচিতে বাচ্চা পয়দা করার মত বীর্য্যকীট ছিল না। তারপর এক সময় মরেও গেলো T.B. হয়ে। মরার আগে বললো— বারো রকম বাচ্চা পয়দা করতে পারো তুমি। আমাকে দিয়ে তো আর হলো না, ডিয়্যর! তাই, শোও যার কাছে পারো। **(মহাভারত, অধ্যায়-১৩০—আদিপর্ব)**। তাই কুন্তী খেপে গিয়ে শুতে থাকলো—যমের কাছে (সূর্য্যের বড় ছেলে), ঝড়ের কাছে (পবন)—ঝাড় খাবার জন্য। পাণ্ডবেশ্বরের (শিব) কাছে তাণ্ডব কেত্তন করে, অজয়ের তীরে শুয়ে শুয়ে; সে বেটী কুণ্ডী বাগিয়ে নিয়েছিল, protection ওই গাঁজাখোরের—যার নাম **পাণ্ডবেশ্বর**।

সে কুন্তীকে বলেছিল—তোমাকে তো ভালই লুট্‌লাম। ওই যে protection চাইছো—তুমি তা' পাবেই। আমি তো আছিই ত্রিশূল হাতে নিয়ে—তোমার সতীনও আছে আমার সংগে, কামকেলীতে পাহারা দেবে বলে।"

"তেমন তেমন যদি বুঝি তবে, ওই ও'পারে বকডিহির শাল-মহুয়ার জঙ্গলে, তোমাদেরকে পাচার করে দেবো। শালা, নদী পেরিয়ে যাবে নাকি—রাক্ষসেরা তোমার ব্যাটাদের পেছনে? জলে ডুবে ওরা মরবে নাকি? ও' আমি বুঝবো। তুমি এখন আরামসে চুপচাপ থাকো। আমি তোমার সংগ পেয়ে বেজায় খুশী—এই অজয় নদের পাড়ে। যাওগে খুন্তি নাড়ো-গে কুন্তী—বাচ্চারা এসে গেলে, খেতে চাইবে। তোমরা লুকাতে চাইছো—এটাই তো মোদ্দা কথা? ঠিক আছে—দুয্যুধনের বাপধনও খুঁজে পাবে না তোমাদের—এটাই হক্ কথা! যাও—আবার পেস্যাদ দিও মাইরি!"

তাই ঠ্যাকায় পড়ে চাঁদাও দিয়েছিল—শুয়েও ছিল যার কাছে, সে হ'লো এই পাণ্ডবেশ্বর! ব্যাসদেবের খেরোর খাতা (মহাভারত) খুললে, দেখা যায় ল্যাংটা শিব-সূর্য্য-যম-পবন আর ইন্দ্র—কেউ বাদ দেয়নি শুতে তার কাছে।

তা' যাক গে যাক্, যাকগে যাক্—ধান ভানতে শিবের গীত না বলে —এবার বলি আসল গীত। লুকাতে জায়গা না পেয়ে, কুন্তী আর তার পাঁচ ব্যাটা ব্যাসদেবকে বললো, "পিতামহ-লুকাবো কোথায়? দুয্যুধনেরা তো তেড়ে বেড়াচ্ছে আমাদের। আমাদের জন্য কিছু একটা করো!" ব্যাসদেব কী আর করে? শেষে একচক্রা বলে একটা জায়গায়, এক টিকিনাড়া বামুনের ঘরে তাদেরকে রেখে এলো।

তা ভাই এই একচক্রা জায়গাটা কোথায়? ভূগোল বলে, ওটা নাকি-বিহারের আরা জেলা। আরে, মেদিনীপুর কমতি যায় কীসে? সে বলে, ধ্যুর—মামদোবাজীর জায়গা আর পেলে না বুঝি? ওটা হ'ল আমাদের শালবনির গনগনির মাঠ। বক ব্যাটা সে রাক্ষস, দিনরাত আড্ডা মারতো এখানে। হুঁ, বললেই হ'লো সে বিহারী। সে মেদনীপুরিয়া, ডাহা ডাহা শালবনীর লোক।

পেল্লায় মারপিট হয়েছিলো, আস্ত আস্ত মোটা মোটা শালগাছ উপড়ে নিয়ে। তখন ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট ছিল না, এই যা রক্ষে। না হলে শাল গাছ উপড়াবার জন্য, ঘুস্ দিতে হতো সরকারী রাক্ষসদেরকে (রক্ষক)। ভীম কী বক রাক্ষসকে, শাল গাছ উপড়ে, ঝাড়পিট করবার লাইসেন্স, দিয়েছে নাকি ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট? সরকার অনেক ঠেকে বুঝেছে যে—শাল গাছ বাঁচাতে গেলে, ওই শালাদের চাকরী দিতেই হবে।

ভীমের চেহারা আমি দেখিনি। কতটা সে খেতে পারতো তাও দেখিনি। তবে সেই ব্যাটা ভীম, কী ওই ব্যাটা বক্ যে, গাণ্ডেপিণ্ডে গিলতে পারতো, সেই কথাই বড় করে লেখা আছে শাস্তরে। পুরো মাল ফুঁকে দিয়ে, বক্‌কে নাকে দু' চারখানা ঠুঁসো ঝেড়েছিল ভীম। ব্যস, কেল্লা মাৎ। ভিরমী খেয়ে পড়ে চেল্লাতে চেল্লাতে, দাঁত কপাটি লেগেছিল তার। সে দাঁত-কপাটি তার আর খুলেনি। ও' জায়গাটার এখনও তাই নাম নাকি ওই **ভীমগড়-পাণ্ডবগড়**।

শালা, গুলমারা গপ্পো, গড়গড় করে সবাই বলে যায়। চা দোকানে বসে বসে, যারা বাপের অন্ন ধ্বংস করে, তাদের কাছে লম্বা আর চওড়া এ'রকম গপ্পো; কিনতে মিলবে সন্দেহ নাই। আট দশ জায়গাব গপ্পো একসাথে টেনে এনে, পাঞ্চ্ করতে গিয়ে দেখি, আমি নিজেই পঞ্চু হয়ে গেছি—কোনটাকেও মেলাতে পারিনি। তাই কন্যা গিরিকাকে বললাম—"মা, মাল খানিকটা পড়ে আছে, তিন জনের এতে কুলোবে না। এখানে মহুয়া কেউ বেচে না?"

গিরিজা বললো, "লরীর খালাসীরা রাখে, কয়লা খনির কুলীদের বস্তিতেও

পাওয়া যায়—চোলাই আর মহুয়া। একটু খুঁজে দেখবো বাবা?"

—— 'টাকা নিয়ে যাও গিরিজা। দেখো খানিকটা যদি অন্ততঃ পাওয়া যায়! মিলিয়ে মিশিয়ে চালিয়ে নেবো। এই মাথাটা এখন কাজ করছে না। মহাভারতের গল্প মিলছে না কেন, বুঝতে পারছি না! ধর্মকে নিয়ে অনেক অনেক, গাঁজাখুরি গপ্পো আমি শুনেছি। কেউ কেউ আবার চৌদ্দটা পুরুষ ধরে, একাধিক্রমে মাল খিঁচবার জন্য, ঠাকুরকে নিয়ে ব্যবসা করে। সব জায়গায় ভাই, এ' সবই তো চলছে।

আমি শুধু বুঝতে চাই যে, এখানে ওই পাণ্ডবেরা—সত্যি সত্যি এসেছিল কিনা। সামনের মন্দিরের দেওয়ালে লেখা আছে "**পাণ্ডবেশ্বর**"। আমি ওখানে এখন ধ্যান লাগাবো। তার আগে কারণবারি চাই। গিরিকা, তোকে একটা ঝুমুর গান লিখে দিই। ওটাতে তুই সুর চড়িয়ে দে। বাজা তো মা নুপুরটা, একটু ছনক্ ছনক্ করে!



পাণ্ডবপূজিত পাণ্ডবে



পাণ্ডবেশ্বরের পথে

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ

বীরভূমের পথে-প্রান্তরে

পাণ্ডবেশ্বরের আঙিনায় ঃ

গিরিজা একটা পঞ্চাশ টাকার নোট নিয়ে, বেরিয়ে গেলো ঝোলাটা কাঁধে করে। আমার পিঠে মাথা বেখে, গিরিকা তার পায়ল বাজাতে লাগলো, আস্তে আস্তে তালে তালে। তারপর এক সময় বললো—"বাবা, একটু নাচবো?"

বললাম—"এখন না, আগে তো গানটা লিখি। এখন নাচলে ক্লান্ত হয়ে পড়বি। মহুয়া খেয়ে নাচবি। গানের ভাবটা তোকে বুঝিয়ে দিই। হিড়িম্বা লোভ দেখাচ্ছে ভীমকে, তার শরীর দেখিয়ে। সে তাকে বিয়ে করতে চায়। রাক্ষসী হলেও, বহু তন্ত্রমন্ত্র তার জানা আছে। নিমেষে নিমেষে সে রূপ বদল করে, মাথাটা ঘুরিয়ে দিতে লাগলো ভীমের। এই গানের মেজাজটা হবে সেকেলে, আর বুনো বুনো।

"তুক্যে দেখেঞ মনের ভিত্যর
হাঁকু পাঁকু পেরাণ রে,
আয়রে লাগর বিহা কোরি
বারাই যেছে জান্ রে।

সন্ঝা সকাল খ্যাল্ব খেলা,
লাগাই দুবক যৌবন ম্যালা,
তুর্ উরুৎ লীচে রাখব পাছা
মন্যে বোড়ো লিছেরে—
তুক্যে হামি ক্যরব বিহা
বারাই যেছে জান্ রে!

রাজার ব্যাটা বঠ্যে ত্যু,
রাজার বিটি হছি ম্যু,
অনেক বয়োস হছে ম্যুর্,
বিহার বয়োস পারাই যেছে—

ম্যুর বুক্যের পানে তাকা রে!

ধামসা পঁদে ধামসা বুকে,
সুখে চুবাই রাইখব ত্যুকে—
উঁ—উঁ—উঁ, রাজার ব্যাটা—ত্যু, ক্যাবলা ক্যানে,
বারাই যেছে জানরে—পেরাণ রে!

.... সোমানন্দ অবধূত

ফিরে এসেছে গিরিজা। ব্যাগের মধ্যে মালের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে যে,সে ওই কাজে সফল হয়েছে। রাস্তায় ঘাটে ওরা ঘুরে বেড়ায়, খোঁজ খবর রাখে কোথায় কী পাওয়া যায়। মহুয়ার মদ আমি খাইনি কখনো। আজ হবে তার হাতে খড়ি। দুপুরের নির্জন তমাল আর খেজুরতলা, অজয়ের পাড় ঘেঁসে। প্লাসটিকের তিনখানা গ্লাসে ঢেলে ফেললাম হুইস্কি—এক পেগ করে। তাতে মিশালাম মহুয়া বাকীটা।

মোটামুটি দু'শ এম. এল. করে, আমরা গলায় ঢেলে দিলাম। তারপর ওদের বললাম, "গানটাতে সুর লাগা তোরা। বুঝিয়ে দে গিরিজাকে। ও' সাজবে ভীম, আর তুই হবি সেই হিড়িম্বা। আমি ধ্যান লাগাচ্ছি, ওই অন্ধকার গর্ভগৃহে, পাণ্ডবেশ্বরের কাছে।"

নির্জন দুপুর—ধ্যান জমতে দেরী হলো না, ধেনোর গুঁতোয়। মনের চোখের সামনে বার বার করে, ভেসে উঠতে লাগলো, ছ'খানা ভয়ার্ত্ত মুখের ছবি। এক বর্ষীয়সী মহিলার সাথে, পাঁচজন বলিষ্ঠ পুরুষ। ফিস ফিস করে ওরা, কী যেন বলে চলেছে। স্পষ্ট নয় সে ভাষা, আর কথোপকথন। গভীর ভাবে মনোনিবেশ করলাম, চলমান ছবিগুলোর দিকে। বার বার করে আরও একটা ছবি ভেসে উঠছে।

সে ছবি বড্ড চেনা চেনা একটা পাহাড়ের। স্মৃতির কানায় নাড়া মারতেই, উঠে এলো দুবরাজপুরের সেই, মামা-ভাগ্নে পাহাড়। চারপাশটা তার বার বার করে, ভেসে উঠছে মনের পর্দায়। উঠে পড়লাম পাণ্ডবেশ্বরের সামনে থেকে। একটা প্রমাণ পেলাম যে, পাণ্ডবেরা সত্যিই এসেছিল এখানে।

মনটা আনন্দে ভরে উঠছে, নতুন কিছু পাওয়ায়। বেরিয়ে এলাম মন্দির থেকে, খুঁজলাম ওদের, পেলাম না। পেছন ফিরতে এক দেহাতী লোক বললো—"তুক্যে লিয়ে যাবার কথা বুললো সাদুমা।" নমস্কার করলো লোকটা আমাকে। তার পেছনে পেছনে চললাম আমি—ওরা গেছে যেখানে।

নাট-মন্দিরটা সামান্য দূরেই। দেখলাম ওরা সেখানে দু'জনে মিলে, রিহার্সাল দিচ্ছে গানটার। আর জনা পঞ্চাশ আবালবৃদ্ধ বনিতা—মায় পূজারীও, ওদের ঘিরে

বসে বসে, শুনছে সে রিহার্সাল। নাট মন্দিরের পাকা বাঁধানো, সিমেন্টের উঠোনে পা দেবার সংগে সংগে, বেজে উঠলো গিরিজা-গিরিকার ঘুঙুর আর নুপুর। সুর ছড়িয়ে চললো একতারা, খঞ্জনী আর ডুগি। মেতে উঠলো ওরা ঝুমুর গানে।

—— **"তুক্যে দেখেঞ মনের ভিতর হাঁকুপাঁকু পেরাণরে......।"** ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার গেয়েও আশ মেটাতে পারছে না ওরা শ্রোতাদের। পাগলা হয়ে হাতে তালি দিচ্ছে তারা। বাপের জন্মেও শুনেনি এ'গান ওরা!

—"একবার ফির্ গাইয়ে সাধু-মা। আউর এক দফে। এ্যায়সা গানা আউর কভী নহী শুনা হমনে, পহলে পহলে! বহৎ মিঠাসা সুর-তাল-বুলাবট্।" কমণ্ডলুতে ঢেলে রাখা মহুয়া, আরও খানিকটা কবে খেয়ে, আবার গান ধরলো ওরা। খেলাম আমিও তার খানিকটা। আধা বাংলা, আধা হিন্দীভাষী ওখানকার মানুষরা, ভীমের আর হিড়িম্বার অভিনয় দেখে; পাগলা হয়ে গেছে। এ' রকমের গান, আর তার উপস্থাপনা, এই প্রথম দেখছে ওরা। বইয়ের পাতা থেকে, সে কাহিনী আট দশ হাজার বছর পরে, হয়েছে জীবন্ত এই নাটমন্দিরে।

আঁচলের খুঁট খুলে, ট্যাঁকের গেরো খুলে, ছড়িয়ে দিল ওরা টাকা ঝড়ঝড় করে। আর সে পয়সা-টাকা-আধুলি, পড়তে থাকলো মেঝেয়। ওদেরকে বললাম—"উঠাকে একাঠ্যা করো জী, সাধুমা ঐসা ভিক্ছা নেহী লেঙ্গী। সাধুমা সাধু হৈঁ, লেকিন ভিখারী নহী হৈঁ। বহৎ গানা পসন্দ করতী—পরিব্রাজন্ কর রহী হৈঁ। রোটি চাবল-ঝোপড়াকা ভিখারী, নহী হৈঁ উন্হোনে। সম্মানপূর্বক ঝোলীমে ডাল দো বেটা, মাইয়া বহৎ খুস্ হোগী"—ওরা তাইই করলো।

বেলা প্রায় তখন, তিনটা সাড়ে তিনটা হবে। উঠে পড়লাম আমরা। সবাই হাতজোড় করে বললো "ফিন্ আসবেন হাপনারা।" গিরিকা বললো "হাঁ, হাঁ, আবার সময় পেলে ঘুরে যাবো।" আমি ওদেরকে বললাম, "আমিতো দুবরাজপুর ফিরে যাবো, তোমরা কোথায় যাবে?"

—— "এখনতো মাধুকরী করি, সন্ধ্যে হলে তখন ভাবা যাবে। রাস্তায় কোন মন্দির পেলে সেখানেই থাকবো। যদি না মিলে তো, গাছতলায় থাকবো। পথে যখন বেরিয়ে এসেছি, পথই আশ্রয় দেবে। বাউলদের আবার ঘর!"

—— "দুবরাজপুরের মামা-ভাগ্নে পাহাড়ের, নাটমন্দিরে থাকতে তো পারো রাতটুকু। পথে ঘাটে না থেকে, ওটাই মনে হয় নিরাপদ হবে তোমাদের। তাহলে আমিও কালকে ওখানে তোমাদেরকে ধরতে পারি। এদিকটায় অনেক কিছু দেখার বাকী আছে। তোমরা থাকলে, আমার খুব ভাল হয়। তোমাদের সঙ্গ আমার খুবই ভাল লাগে।"

—— "চলুন তবে, ওই পাহাড়েই রাতটা আজ কাটাবো। কালীতলার সাধুমাকে আমিতো চিনি। তবে ওখানে আজ আর যাবো না।"

যে বাসটায় করে ওখানে গেছলাম, সেটাই আবার ফিরে আসছে কয়-ঘণ্টা পরে। উঠে পড়লাম আবার সেটায়। সেই কন্ডাক্টার আদর করে, বসিয়ে দিল আমাদের। সময় লাগবে তো মাত্র আধঘণ্টা। গান শোনাবার অনুরোধ এলো, যাত্রীদের কাছ থেকে। মালের নেশার আগুনটুকু, এখনও নিভে যায়নি, শরীরের সলতে থেকে। গিরিজা আমার ডানপাশে, গিরিকা বাঁয়ে। মাঝখানে আমি দু'জনের কাঁধে হাত রেখে, বসে ঢুলতে থাকলাম।

গিরিকা গুনগুন করে, সুর ভেঁজে চলেছে। মনের মধ্যে আমার খেলা করছে কত কিছু কথা। আমার কাঁধে মাথা রেখে সে বললো, "বাবা একটা আলকাপের গান লিখে দে ক্যানে—গেয়েঁ লিই গ'। মজ্যা লাগবেক্ মনে লিছে। আধুনিক্ কর‍্যাঁ লিখ্যে দিবিক।" বড় বিচিত্র এ' মেয়ে। কখনও বলে সুন্দর বাংলায়, আবার কখনও তার সাঁওতালী ভাষা মেশানো টানে। সে ভাবেই লিখলাম।

সবাইকে ঠেলে সরানো যায়। যায় না শুধু কন্যাকে, সে ঔরস কিম্বা অনৌরসজাত হোক। সম্পর্কটা এমনই মনের এক জায়গায় কামড়ে ধরে যে, মুক্তি নাই তার থেকে। আবার মুক্তি পেতে গেলেও তাকেই লাগে। ছেলে মৃত্যুর পর বাপ-মায়ের মুখে আগুন লাগিয়ে, বাড়ী ফিরেই ভুলে যায় বাপ কী মাকে। 'বাবা-মা' বলে অপয়া দু'টো জন্তু যে সংসারে ছিল, সেটা স্বীকার করতেও—সে লজ্জা বোধ করে। আর কন্যা, সে সমানে বুক চিতিয়ে লড়াই করে দেহে-মনে, সমাজে-সংসারে-সংস্কারে।

এক নষ্টালজিয়ার মত ঘিরে রাখা পিতৃস্মৃতি, নাড়া মারে তাকে প্রতিক্ষণে। আপন সন্তান-সন্ততির মাঝে, খুঁজতে থাকে সে হারিয়ে যাওয়া বাবা-মায়ের আদল। উদোম বুকের মাইটা বাচ্চার মুখে গুঁজে দিয়ে, এক এক করে খুঁটে খুঁটে সে দেখতে থাকে, হাত-পা-কান, নাক-মুখ-চোখ। খুঁজে না পেলে হতাশ্বাস চেপে রাখে বুকে, আর খুঁজে পেলে কোন মিল—মিটিয়ে দেয় ছোটবেলার ঋণ, চুম্বনে চুম্বনে। এই সেই কন্যার রূপ, আজন্ম কাঁদে আর হাসে যে—ওই একটাই নাড়ীর টানে, (umbilical cord) যার থেকে আমি-তুমি-বিশ্ব-নিখিল ঝুলে থাকি, মায়ের পেটের ভেতর।

সেই মেয়ের আব্দার এবার মেটাতে হবে, একটা আলকাপের গান লিখে। মেজাজটা হবে আধুনিক, চিন্তাও হবে আধুনিক—সুর হবে আলকাপের। আলবাৎ লিখে দিতে হবে, আল্লাও এসে ঠ্যাকাতে পারবে না গিরিকাকে। মহা ফ্যাসাদে পড়লাম। আলকাপতো লেখাই যায়, কিন্তু আধুনিক মেজাজ আর ভাবনা পাই কোথায়?

মনে মনে স্মরণ করলাম, বেদবতী মা আর ছ্যাছড়াবাবাকে। সরস্বতীর কলম বলে, যে খাগের কলমটা সে আমাকে দিয়েছিলো, নর্মদা-পরিক্রমার সময়—সেটা এখন সাথে থাকলেও না হয়, একটা কিছুর ব্যবস্থা আশা করা যেতে পারতো। হেরে যাই দুঃখ নাই—লড়াইয়ের মাঠে নেমেই না হয়, পরাজয়টাকে মেনে নেবো।

বললাম, "নুপুরটা মা, একটু বাজাতো দেখি, মেজাজটা একটু আড়মোড়া ভাঙ্গে কিনা। চলতি গাড়ীতে কী আর ও'সব হয়! মিনিট পাঁচেক সময় পেলে লেখা যেতে পারতো হয়তো!"

বলতে বলতে হঠাৎই 'ফু-উ-উস্—ফু-উ-স্' শব্দে, গড়াতে লাগলো চাকা। ফেঁসে গেছে সেটা। তড়াক্ করে লাফিয়ে নামলো কন্ডাক্টার আর হেল্পার। ঘুরে এসে হেঁকে সবাইকে বললো, "নামুন নামুন সবাই, চাকা বদলাতে হবে।" হুড়মুড় করে বাস থেকে নামলাম আমরা।

বুঝে নিলাম, পনেরো কুড়ি মিনিটের আগে, উনি আর নড়ছেন না। অনেকটাই দূরে, একটা দাঁড়ানে শিরিষ গাছ দেখে, সেদিকটায় নির্জ্জনে আমি বসতে চাইলাম। পাশ দিয়ে চলে গেছে অণ্ডাল-সাঁইথিয়া রেল লাইন। দূর দিগ্বলয়ে ফাঁকা প্রান্তরে তৈরী করেছে, খুব সুন্দর একটা ল্যান্ডস্কেপ। মহুয়ার নেশার ঘোর তখনও বেশ ভালই রয়েছে; মনে আর শিরায় শিরায়।


পাণ্ডবেশ্বরে আত্মগোপনকালে কুন্তী সহ পঞ্চপাণ্ডব।

সপ্তম অধ্যায় ঃ

বীরভূমের পথে-প্রান্তরে

মামা-ভাগ্নে পাহাড় : দুবরাজপুর

ব্যাগ থেকে খাতা আর কলম বের করে, ভাবতে লাগলাম বিষয়বস্তু—কী লেখা যায়? হঠাৎই নজরে পড়লো, একতাল একটা পাথুরে কয়লা, বেওয়ারীশের মত পড়ে আছে, রেল লাইনের ধারে। ট্রেন থেকে পড়ে থাকতেও পারে ও'টা। নামে **'প্যাসেঞ্জার-ট্রেন'** হলেও—ওটা আসলে **কয়লার ট্রেন**।

সারাদিনই ভারতের এক নম্বর নাগরিকরা, লক্ষ লক্ষ টন 'মাল' পাচার করে, আমার মত খোজা—পাঁচ নম্বর নাগরিকের নাকের ডগায়। প্রতিবাদ এতটুকুও করলে, আমার মৃত পিতাকে ওই কয়লা দিয়ে, **দ্বিতীয়বার-মুখে-আগুন** দেবে ওরা, নাতিপুতির সাথে! ওটাতেই পেলাম **আইডিয়াটা**—তার **আধুনিকতাও**। লিখে ফেললাম কবিতাটা।

"উর্য়ে উর্য়ে—   উটা বটেক্ র‍্যালের গাড়ী হো—
দশটা থিএ্যা—পাঁচ্টা সোন্ঝা,
মিলাই লিবার লাগবেক্ হো!
পাত্থর বয়্যাঁ লাগর্ হামার্
পাত্থর হঁয়্যা যেছেক গ'।।
মনে লিছে—ভুল্যাঁ যেছেঁ—
এ' থন—এ' যুনিটা,
লিঙ্গো গলাই দিছেক বটে;
সি ক্যান এক ছুঁড়িটার!
মন লাই উর শরীট্টোয়,
খালি-মাগী খুঁজ্যা যায়,
খ্যেএ্যা খ্যেএ্যা ফ্যালাঁয় যায়—
থাইকবো লাই ই দেশে হো।
আসানসুলের পানে যাবো,

একটা ভাতার কিনে লিবো,
মউয়া খ্যেঞা চইড়বো বটেক
উ র‍্যালের গাড়ীর ভিত্যর হো।"

.... সোমানন্দ অবধূত।

লেখা হয়ে গেল আলকাপের গানটা। সেটা তুলে দিলাম গিরিকা আর গিরিজার হাতে। দূরে তাকিয়ে দেখলাম, গাড়িটা তখনও সারানো হয়নি। ওদেরকে বলেই এসেছে গিরিকা, আমাদেরকে ডেকে নিতে।

মাঠ ভেঙ্গে রেললাইন পেরিয়ে, দূরের গাঁয়ে চলেছে এক সাঁওতাল বুড়ো। আমাদেরকে দেখে সে পাশে বসে পড়লো, আমাদের গা ঘেঁসে প্রণাম করে। মুনিষ-খাটা উসকো খুসকো লোকটা, পাশে রাখলো তার ঝোলাটা। সেটা একটা জলভর্ত্তি ব্লাডারের মত, একটু একটু গড়াতে লাগলো টলটলায়মান হয়ে। তরল কিছু একটা বস্তুর অস্তিত্ব আছে ওতে, সেটা বুঝতে অসুবিধা হলো না।

—— 'কী আছে ও'তে বটে? জলের পারা নড়ে?

—— "মহুয়া, মহারাজ। ল্যাশার বস্তু হো'ল্য কি না!"

—— "তুমি মহুয়া বিক্রী করো—নাকি কিনে আনছো খাবে বলে? আখের গুড়ের নাকি? কতটা জল মিশিয়েছে ?"

—— "হামি লিজে বানাই গ' বাবা। বিক্রী করি বাজ্যারে— উই দিয়া আলু-চাল-ডাল কিন্যি। বেশী হ'ল্য, ফিরে লিয়ে যেছি গ'। আঁক্যের গুড়্যের বটে!"

—— "পুলিশ ধরে না তোমাকে? মাল বিক্রী করা বে-আইনি, তুমি জানো?"

—— "মাল বিক্রী করি লাই গ' সাদুবাবা। মউয়া! মউয়া মাল হবেক ক্যানে? গাছ্যের ফুল বটেক—দেখ লাই? পুলুশ লিজেই খায় বটে! উরা কম কম ট্যাকা দেয়। বাজ্যার করি লাই আজ। ট্যাকা দিয়া আজ সন্ঝাবেলাই, খাসীর মাংস লিব গ'! দেশ্যের সব আইন, মউয়ায় ডুবছে উঠছে গ'।"

বুঝলাম, সে আজ বাজার-হাট করেনি। সন্ধ্যে বেলায় সে আজ মহুয়া বিক্রির পয়সায়, পাঁঠার মাংস কিনে খাবে। তাই বললাম, "আমার কাছ থেকে তুমি কত টাকা চাও! আমাকেই দাও ও'টা। কতটা হবে—এক লিটার?"

—— "দেড় সের গ' সাদুবাবা। লাও ক্যানে, ছ'টা ট্যাকা লিব বটে! বাজ্যাবে পঁদ্‌র ট্যাকা পাই গ'। মিছা কতা বলি লাই গ' সাদুবাবা!"

বলেই সে খুলে ফেললো তার পোঁটলার সংসার। মহুয়ার ব্লাডার। সেদ্ধ করা

মটর আর ছোলা—তার সাথে সিদ্ধ-ভাজা লংকা—আর এক চিমটে নুন। সবটা সে দিয়ে দিল আমাদেরকে। খেতে শুরু করলাম আমরা। পড়ে থাকা দুটো প্লাসটিকের গ্লাস, বের করলাম ব্যাগ থেকে। মহুয়া ঢেলে প্রথমেই দিলাম গিরিকাকে। তারপর গিরিজাকে দিলাম। নতুন লেখা গানটায় সুর লাগাতে, চাই ওদের মৌতাত।

ব্লাডার ধরেই আমি, ঢেলে নিলাম তার খানিকটা গলায়। যার মাল তাকেও, গিলিয়ে দিলাম বেশ করে। তারপর দশ টাকার একটা নোট বের করে, তার হাতে দিতেই, লোকটা অসম্ভব খুশী হয়ে চলে গেল, মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে।

লিটার দুয়েক মাল, সে দশ টাকায় দিয়ে গেল—চেয়েছিল মাত্র ছ' টাকা। চারটাকা তার উপরি পাওনা হ'তেই, সে বেজায় খুশী। সন্ধ্যেবেলায় পাঁঠার মাংসের সাথে, তার যোগ হবে অন্য কিছু আইটেম্—এ'টা বেশ ভালই বুঝতে পারছি।

মহুয়ার নেশা একটু একটু করে, চারিয়ে যাচ্ছে রক্তের স্রোতে। সেদ্ধ ছোলা-মটর, গালের মধ্যে ছুঁড়ে দিতে দিতে, সুর ভাঁজছে গিরিকা। আলকাপের মত হয়েছে, কী পাকামো হয়েছে, নিজেই তা' বুঝতে পারছি না। বর্দ্ধমান-বীরভূম-মুর্শিদাবাদের লোকেদের, ভালই জ্ঞান আছে ও' গানগুলোর ব্যাপারে।

হঠাৎ ভয়ে ঠিক্‌রে উঠলাম, রেল গাড়ীর শব্দে। যে গাছটার গোড়ায় বসে আছি, সেটা রেল লাইন থেকে মাত্র পনেরো কুড়ি ফুট দূরে হবে। গাড়ী চলবার সময়, বিছিয়ে রাখা পাথরের খোঁয়াগুলো, তীরের মত দু' একটা ছিটকায়, এ' আমি বহুবার দেখেছি। দেখেছি আহত হ'তে, বেশ কিছু পথ চলতি মানুষকে—যারা রেল লাইনের পাশ ধরে হাঁটে। আমার ঠিকরে উঠা সেই জন্যই—কী জানি, কখন আবার দারুণ কোন আপদ-বিপদ ঘটে যাবে।

অগুালের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, না—রেলগাড়ী নয়! ওটা গিরিকার ডুগি আর মুখের কেরামতি। চলতি রেলগাড়ীর অরিজিনাল্ শব্দ আর তার হুইশেলকে, ধরবার চেষ্টা করছে সে, তার গানের দোসর করে নিয়ে, তাকে মিশিয়ে দিতে তা'তে! **এ' মেয়ে যে হরবোলা, বুঝিনি তা' এ' ক'দিন।**

অত্যন্ত আনন্দে ফেটে পড়লাম। যাদের এই সঙ্গ পেলাম, তারা যে অতি অসাধারণ—আমার মত তারা যে একটুও ফালতু নয়—সেটাই আমাকে বেজায় অভিভূত করেছে! হাঁ করে তাকিয়ে দেখলাম, অবাক চোখে তাদের দিকে। গিরিজাও প্রস্তুত। শুরু হলো গান আর নাচ। ডুগিটা ততক্ষণে চালান হয়েছে গিরিজার কোমরে।

একক গান—ভুমিকাই শুধু নারীর এখানে। তাই গাড়ীর শব্দ, তার হুইশেলের শব্দ-তরঙ্গ, সৃষ্টি করতে হবে গিরিজাকে। গানে আর্ত্তি আর তার কথাগুলো ফুটিয়ে তুলবে গিরিকা। **"উর‍্যে উর‍্যে উটা বটেক্, র‍্যালের গাড়ী হো"**।..........

চরকী পাকের মত ঘুরছে গিরিকা। হাতে তার শুধু সেই খমক-খঞ্জনী বেজে উঠছে, উর্ধ্বে-নীচে উঠে-পড়ে, শরীরী তাল বজায় রেখে রেখে। গিরিজা শব্দ যোজনায় ব্যস্ত, মুখে-একতারায় আর ডুগিতে। চলন্ত রেলের গাড়ীর শব্দের বিমূর্ত্ততাকে, সে পাঞ্চ করছে গানের ভেতর।

যা' সৃষ্টি করলাম আমি, বুঝতে পারিনি তা' এমন একটা রূপ পাবে। নিজেকে মাপতে গিয়ে বার বার যখন, শূন্য হাতে ফিরে এসেছি—অক্ষমতা-অসাফল্যের জন্য, মাফ করতে পারিনি নিজেকে। আজ ওরাই আমাকে, ওদের ক্ষমতার আলোয় মেপে দেখিয়ে দিলো, আমার দৌড় কতটা।

রাঢ় বাংলার সুর আর কথা, সাঁওতালী কী বুনো মানসিকতা, আর স্বামী-বিছিন্না নারীর চিরকালীন আর্ত্তি, এবং পুরুষের তাদেরকে ভোগ করে পালিয়ে যাওয়া—এসব গুলিয়ে মিলিয়ে যে কবিতাটা, মহুয়ার ঘোরে কলমের ডগায় প্রকাশ পেল মন থেকে—সে ধনে ধনী আমি, ক্ষ্যাপার মত ছুঁড়ে ফেলেছি আজ পঞ্চাশটা বছর ধরে, সেই পরশ পাথরগুলোকে উনুনের আগুনে।

ধনি সে গিরিকা, ধ্বনিত করেছে তার অন্তরের সুরে সুরে, আমার মেদুর অন্তরের কথা। অন্তর দেখতে পাইনি গিরিকা আর আমাতে। তার দিকে চেয়ে চেয়ে শুধুই মনে হয়েছে—গিরিকা তো আমি নিজেই—ও' আমার নারী রূপ। আমার হিয়ার ভিতর এতকাল ও'যেন লুকিয়ে ছিল, আমি দেখতে পাইনি ওকে।

পুত্র কন্যার রূপ দেখতে দেখতে, মানুষ যেমন করে অচিন প্রত্যাশায় হারিয়ে যায়, নিজের অক্ষমতা আর অপ্রাপ্তিকে, সে যেমন পুরিয়ে পুষিয়ে নিতে চায় তাদের মধ্য দিয়ে; তেমনই এক বিমুগ্ধ বালখিল্য অপ্রমেয় উচ্ছ্বাস—পেয়ে বসলো আমাকে। সেই আনন্দবিধৌত অশ্রু দিয়ে, শুধু প্রণাম জানালাম গিরিকাকে, মনে মনে—সংগোপনে।

ভেঁপু বাজাচ্ছে বাস, ঠিকঠাক হয়ে গেছে ওটা, এবার ছেড়ে দেবে। গান বন্ধ না করে, গিরিকা চললো গিরিজাকে নিয়ে সেদিকে—আমি চললাম ওদের পিছু পিছু। সমস্ত যাত্রী ওদের ঘিরে ধরলো। পয়সা পড়তে লাগলো টপাটপ। সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

একজন পয়সাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে, তুলে দিলো গিরিকার ঝোলায়। কন্ডাক্টর বসিয়ে দিলো আমাকে একটা সীটে। গান তখনও বন্ধ করেনি ওরা। বাসের মেঝেতে বসেই বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, গেয়ে চলেছে ওরা সেটাই—যাত্রীদের অনুরোধে।

এসে গেলাম আমরা মামা-ভাগ্নে পাহাড়, দুবরাজপুরের কোল ঘেঁসে। নেমে পড়লাম আমরা বাস থেকে। ওদেরকে ওই পাহাড়ের মাথায় মন্দিরের চাতালে পৌঁছে দিয়ে বললাম, "সামনে দোকান আছে অনেক। নিজেদের পছন্দ মতো খাবার কিনে

নিতে পারো। না হলে আমার সাথে কালী মন্দিরে যেতে পারো। ভোগ-প্রসাদ পাবে সেখানে, সাধুমার সাথে দেখাও হবে। থাকবে সেখানে আশ্রমের মন্দিরে। কোন অসুবিধা হবে না। যাবে কিনা সেটা ভেবে দেখো। এ' ব্যাপারে তো জারিজুরি করাটা, আমার পক্ষে ঠিক হবে না। তোমাদেরও হয়তো ভালো লাগবে না।"

—— "অন্য একদিন যাবো বাবা। রাতটা আমরা একটু, নির্জনেই কাটাতে চাই। তা'ছাড়া আমাদের এই অবস্থাটা, মা কতটা মেনে নেবেন, সেটাও দেখার। আপনি যান—কালকে আমরা অপেক্ষা করবো, আপনার জন্য এখানে। আপনি এলেই বেরিয়ে পড়বো একসাথে। সকাল ছ'টা-সাড়ে ছ'টায় চলে আসুন।"

—— তবে তাই হোক। এ' কয়টা টাকা তোমরা রাখো।

টাকা পয়সা নিল না ওরা। শুধু প্রণাম করে বললো, "অনেক পয়সা আমরা পেয়েছি, আপনার গান শুনিয়ে। অত পয়সা আগে আমরা কখনও, আয় করিনি বাবা। প্রতিদিনের শুনা গান, কে আর শুনতে চায় বলুন। আপনি বরং অন্য গান লিখবেন আজ রাতে। কালকে আবার সুর দেবো। আপনার গান 'মার-মার-কাট-কাট' ফেলে দেবে পাবলিকের মনে। আপনার গান গাইতে, আমাদের খুব ভাল লাগে বাবা।

উঠে পড়লাম ওদের কাছ থেকে। পাহাড় থেকে নেমে আসবার পথে, দেখা হ'ল পূজারীর সাথে। ওদের কথা বললাম তাকে। সে চেনে আমাকে—চেনে গিরিকাকেও। খুশী হলো সে। লোকের আনাগোনা হলে, ভরে তার ভিক্ষার ঝুলিটাও। এদিকে কালে-কস্মিনে দু' একটা লোক আসে, তা'তে তার চলে না। সাধুসন্তের ভিড় বাড়লে, পাণ্ডীর দলেরও ভিড় বাড়ে। তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, পাহাড়ের থেকে নেমে এলাম পথে। পাহাড়ের পেছন দিকে না নেমে, পাকা রাস্তায় নেমে পড়লাম।

পাশেই একটু দূরে, একটা বিলাতী মদের দোকান থেকে, নিতে হবে একটা বিলাতী হুইস্কির বোতল। হাতড়ে দেখলাম শ' খানিক টাকা পড়ে আছে, জাঙ্গিয়ার বুক-পকেটে। কিনে ফেললাম একটা বোতল। ব্যাগে ঢুকিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে, একটা তেলে-ভাজা দোকান থেকে, কয়টা তেলে ভাজা আর মুড়ি কিনে, খেতে খেতে চললাম কালীতলার দিকে।

পনের কুড়ি মিনিটের পথ। পৌঁছাতে দেরী হলো না। সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিয়ে, সাধু মা তখন আরতি করছে, ভৈরব তলার বেদীটায়। মাকে বললাম, "কমণ্ডলুতে মহুয়া আছে। ওটা তুমি অন্য একটা পাত্রে ঢেলে রাখো। আর বোতলটা রাখো, কারণ করার জন্য। এখন আমি চান করবো। মিঠকে বলো খানিকটা [illegible] থেকে।



বীরভূমের পথে-প্রান্তরে

যুবরাজপুর : দুবরাজপুর : অষ্টাবক্র মুনি

মনের আনন্দে স্নান করলাম, অনেকক্ষণ ধরে। সারাদিন টো-টো করে রোদে ঘোরা, শরীর ঘিরে শ্রান্তির ছায়া নেমে এসেছে। গা-হাত-পা মুছে, ভৈরবের কাছে বসতে যাবার মুখে, সাধুমা বললো—"তেলে ভাজা-বেগুনী ক'টা খেয়েঁ লে ক্যানে—ভাল বানাইছে বটেক গ'—আমৃত্তোর পারা লাগে।"

বলেই মাটির খুরিতে করে গোটা চার পাঁচ তেলে ভাজা, আর হাফ হুইস্কির বোতলটা ধরিয়ে দিল সে বেটী। কোন কথা আর এখন বলতে ইচ্ছা করছে না। তবুও বললাম, "মা, তুমিতো কই কখনো মদ খেতে বারণ করো না? নিজেই এনে দাও, না চাইতেই। সমাজের সবাই যেটাকে 'না' করে, তুমি নীরবে সেটাকে 'হাঁ' কর কেন?"

—— "সমাজে সবাই যা করে, আমু তো তা' করি না। আমু ভিক্ষা করি, সমাজে সবাই কি তাই করে বটে? সমাজের প্যামানন্দোকে দিয়ে, কিচ্ছু হ'বার লয় যে! তোর ভিত্যরের প্যামানন্দো না জাগলে, লিখবে কে রে? কালীখে লিয়ে লিখবি, কানাইকে লিয়ে লিখবি। সাধের লাউকে লিয়ে, উই যে বাউল-পারা মনিষ্যি-গুলান্, ঘুর‍্যাঁ ব্যাড়ায়—উদের লিয়ে জবর কর‍্যাঁ লিখবি।

কারণ দিবার কারণ আছ্যে গ'। উপ্পরের প্যামানন্দো ঘুনাইব্যাক্, নীচের প্যামানন্দো জাইগব্যাক—তব্যে না কলমটো চলব্যাক্ গ'। চলতে হল্যে গাড়ী তেল খায়, সাধু পণ্ডিতেরাও গাঁজা-মাল খায়—হোল্য?"

কিছু বলতে পারলাম না আর। চার পাশের জগৎটাকে ভুলতে না পারলে, সত্যিই অন্তরের জগৎকে জাগানো যায় না। এরই নাম হ'ল শব-সাধনা, সব সাধনা। শবের মত পড়ে থেকে, এই পৃথিবীর মাটিতে সব কিছু ভুলে গিয়ে, শুধু তাকে ডাকা। তাহলেই সব হয়—গুণীজনেরা মুনিজনেরা তাই বলে। জীবন্মৃত এই মানুষগুলো, বৃথা আস্ফালন করে— ওরা কী সত্যিই বেঁচে আছে! ওরা যা' করে, তাইই নাকি জীবনের ধর্ম বা স্বরূপ।

তাহলে ওরা যা' করে না, যা' মানে না, বা মানতে চায় না—সেটা তবে কী! আসলে ওরা মৃত, তাই অমৃতকে চাখতে পারেনি। সন্ধান দিলেও ওরা তা' নেবে না। হিতে বিপরীত করে, কালীকে কালি মাখিয়ে ছেড়ে দেয়।

তাই যখন কেউ 'কারণ করে' কলম ধরে, তখন ওরা লাঠিসোটা বল্লম নিয়ে আস্ফালন করে। কারণ করে কেউ করে সৃষ্টি, আর ওরা করে অনাসৃষ্টি। কারণ দেওয়ার কারণটা, এমনই করে বুঝিয়ে দিল সে বেটী। মূর্খ বেটীর পণ্ডিত উত্তর, আমার মত সবকিছু পণ্ড করার রিং-মাষ্টারের কাছে।

বসে পড়লাম ভৈরবতলায়, আধো আলো—আধো অন্ধকারে। বাল্ব-লাইটটা এমন করে লাগানো আছে যে, যেন আবছায়া তৈরী হয়, সাধন ভজনের জন্য। তৈরী করে নিতে হয় কৃত্রিম নির্জ্জনতা। ঠাণ্ডা তেলেভাজার সাথে হুইস্কির মিশেল—মন্দ হচ্ছে না। সারাদিনের মহুয়ার নেশার জের, এখনো থেকে গেছে রক্তে।

আবার তায় নুতন করে বিলাতীর ছোঁওয়া, যেন মোয়া হাতে ধরিয়ে দেওয়ার মত হয়েছে। একটু একটু করে হারিয়ে যেতে লাগলাম। আগেও কয়টা তেলেভাজা খেয়েছি। পেটটা ভারী ভারী লাগছে। হঠাৎ মনে হ'লো, বসেই যখন আছি, তখন ধ্যানের আসনে বসাই ভালো। ধন পাই কি না পাই, সে কথায় কাজ কি?

ভেসে আসতে লাগলো অনেক ছবি, মনের পর্দায় এক এক করে। ঘন শাল জঙ্গল। তার মধ্যে পাথরের তৈরী, এক রাজবাড়ীর মত—বাড়ী দেখতে পাচ্ছি। দুই জন নারী আর পাঁচ জন পুরুষ দাঁড়িয়ে সেখানে। বুনো সাঁওতালদের মত, অনেক ধনুকধারী টাঙ্গীধারী লোকলস্কর, ব্যূহ তৈরী করেছে, যেন ওই সাতজনকে ঘিরে।

তবে কী ওরা কোন রাজা কী জমিদার? ওদেরই বা আমি কেন দেখছি? চিন্তা আরও গভীর হচ্ছে। সমস্ত ছবির পটভূমিকায়, ঝুলে থাকছে একটা করে প্রশ্নচিহ্ন। কা'কে জিজ্ঞেস করি? নাজেহাল হতে লাগলাম, অগণিত ছবির দৌরাত্ম্যে। নিজের মাথার চুল নিজেই জাপটে ধরলাম। হঠাৎ মনে হলো কেউ যেন, হাতের মুঠি দু'টোকে, ছাড়িয়ে দিতে চাইছে। চোখ খুলতে চেষ্টা করেও বিফল হলাম।

একটু একটু করে, ভেসে উঠছে এক সাধুর মুখ। অসম্ভব বিশ্রী তার চেহারা। হাত-পাগুলো তার পাট প্যাঁকাটির মত অসম্ভব সরু সরু, আর মোচড়ানো দুমড়ানো। যেন পোলিওর রোগী। ঘাড়টা তার বাঁকানো ডান দিকে। চোখ দুটো যেন বেরুতে চাইছে ঠেলে। কিম্ভূতকিমাকার এই চেহারার কোন সাধুকে আমি দেখিনি। হঠাৎ করে ধ্যানের গভীরে এ' কার মূর্ত্তি ভেসে উঠছে? ভয়ে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম—মা-আ-আ। বরাভয় মুদ্রায়, উঠে গেল তার হাত। উচ্চারিত হলো বজ্রগম্ভীর স্বরে—মাভৈঃ।

দরদর করে ঘামছি, তেষ্টায় আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। সাধু কুমড়োর মত গড়াতে গড়াতে, কাঁকড়ার মত চার হাতে-পায়ে, কোন মতে মাটি আঁকড়ে ধরে, এলো আমার কাছে। আবার বলে উঠলো—মাভৈঃ।

হাত দুটো পাতলো সে আকাশের দিকে। তামার কমণ্ডলু একটা হাওয়ায় ভেসে এসে, বসে গেল তার দু'হাতের চেটোয়। সেটা আড় করে, তার নলটা সাধু আমার মুখের কাছে ধরলো। ঝরঝর করে ঝরতে লাগলো হিমশীতল জল। আকণ্ঠ পান করলাম, পরিতৃপ্ত হলাম। তারপরও সাধু ঢেলে চললো রাশি রাশি জল, আমার মাথায় আর গায়ে, সেই ছোট্ট কমণ্ডলুটা থেকে। ভয়ে ঘেমে নেয়ে উঠা শরীরটা, ধুইয়ে দিল সাধু।

বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। কে এই সাধু? কাঁকড়ার মত চেহারা, একটা দলা পাকানো শরীর! ভয় একটু একটু করে, কেটে যেতে শুরু করেছে। হঠাৎই প্রণাম করে বসলাম, সেই কাঁকড়ারূপী মানুষটাকে। "শুভমস্তু" বলে ওই শীর্ণ দু'হাতে হাজার হাতীর বল নিয়ে, সে বসিয়ে দিল আমাকে, একটা শিলাখণ্ডের উপর।

অনেকটা পিছনে ধূমায়মান অনেক প্রস্রবণ, উগরে চলেছে অনন্ত উষ্ণ জলরাশি। মাঝে মাঝে তার বাষ্পরাশির ধাক্কা লাগছে পিঠে। বাতাসে আন্দোলিত হতে হতে সেই বাষ্পরাশি, কুয়াশার মত ঢেকে ফেলছে আমাদেরকে । মুখ খুললো সেই সাধু। শ্বেতশুভ্র তার দাড়িটার অর্ধেকটা পিঠের উপর ঝুলছে, আর অর্ধেকটা তার ডান বুকের উপর নড়ছে, মাথাটা ডাইনে ঘুরে থাকার জন্য।

—— *"যে ছবি তুই দেখছিস, তোকে দেখানো হচ্ছে—সেটার সবটাই ওই রুদ্রানীর খেলা। এখনই শুরু হয়েছে নীলকণ্ঠের নীল সংক্রান্তির পুণ্যলগ্ন। আর তুই তোর অজান্তে বসেছিস তারই ভৈরবের পাদপীঠে। লোকাচারে আগামীকাল পালিত হবে এই চৈত্র-সংক্রান্তি। এই পুণ্যলগ্নই তোকে দেখিয়ে চলেছে এসব ছবি, বহু হাজার যুগের ওপার থেকে টেনে এনে।*

আজ যেখানে বসে আছিস, তার নাম দুবরাজপুর। আসলে ওটা এক সময় ছিল যুবরাজপুর। পঞ্চপাণ্ডবের বঙ্গবিজয়ের সময়, তাদের রাজধানী ছিল এ জায়গাটা। যুবরাজ যুধিষ্ঠির রাজা হয়েছিলেন, এখানে সাময়িকভাবে। যে ছবি দেখলি, সেটা পঞ্চপাণ্ডব-কুন্তী আর দ্রৌপদীর। তাঁদেরকে ঘিরে রয়েছে হাজার হাজার মল্লভূম-সেনা।

আজকের বাংলার এই প্রান্তের নাম ছিল মল্লভূম। ওই মল্লবীরেরা বনের দুলাল। শক্তপোক্ত শরীর ওদের, যেন কষ্টিপাথরের তৈরী ওরা। সে সময়ে এখানে

অনেক রাজা ছিল। সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত অধিপতি কর্কোটক প্রভৃতি প্রধান ছিল। সবাই হেরে গিয়েছিল যুদ্ধে। সাগরদ্বীপের ম্লেচ্ছরাজাও তার পদানত হয়েছিল। বহু ধনরত্ন খাজনা বা কর হিসাবে নিয়ে, ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে গিয়েছিল ওরা বহু বছর পরে। আজ দেখে এলি সেই পাণ্ডবেশ্বর। সেই মহাকালই ওদের উপাস্য ছিলেন। তুই না জানলেও, ওই ছবি তোর মধ্যেই লুকিয়ে ছিল। রুদ্রানীর কৃপায় তাই, আজ তা' দেখতে পেলি।" জানবি, কালের হিসাবের খাতা থেকে, কোন দিন কিছুই হারায় না। সবই লেখা থাকে সেখানে অতি যত্নে।"

—— "কিন্তু ভগবন, আপনি কে? আপনার শুভনাম কি? আপনিইবা জানলেন কেমন করে এসব? আপনি কার কাছ থেকে, শুনেছেন এ' কাহিনী"

স্মিত হাসি ছলকে উঠলো ঋষির মুখে। "আমি? আমিতো তখনও ছিলাম। আমি দেখেছি ওদের। আমাকে শুনতে হয়নি, কারুর কাছ থেকে এই কাহিনী। যে ঈশানী তার এ্যালবাম থেকে, আজ তোকে দেখালেন ছবিগুলো, তাকেই ধরতে আমি এখানে এসেছিলাম, তোদের এই বঙ্গভূমিতে কাঁকড়ার মত এইরূপে।

তারপর—অনেক প্রতীক্ষা আর পরীক্ষার ভিতর দিয়ে, আমাকে যেতে হয়েছে। আমার এই বিকৃতরূপ, তোর মনে প্রশ্ন জাগাতেই পারে। প্রশ্ন, নিগুঢ় জ্ঞানের গভীরে নিয়ে যায়, লুকানো কোন এক চির সত্যকে খুঁজতে শেখায়। আমি হ'লাম কহোড়-পুত্র, উদ্দালক-দৌহিত্র—অষ্টাবক্র। সকলে আমাকে বেদবিদ্ বলে জানে। বল, আরও কিছু জানতে চাস্ বৎস?"

বহু মানুষের চেঁচামেচির মধ্যে জেগে উঠলাম। গোটা শরীরে কেউ যেন জল ঢেলেছে কয়েক কলসী! সামনে দাঁড়িয়ে সাধু-মা, ত্রিশূল ঠেকিয়ে আমার মাথায়। জেগে উঠতেই, সে বেটী একটা গেরুয়া কাপড় ছুঁড়ে দিয়ে বললো—"পরে ফেল। অনেক জল ঢালা হয়েছে।"

পরে ফেললাম, সেই গেরুয়া কাপড়খানা। শুনলাম, আমি নাকি নেশার ঘোরে, গোঁ গোঁ করে ছটফট করছিলাম, আর ভুল বকছিলাম। কেউ কেউ বললো, "ছোট সাধুবাবাখে ভর হঁয়েছিল গ'।" তাই ওরা ফুলের মালা পরিয়েছে আমার গলায়, আশীর্বাদের লোভে। মালায় ফুলে নাকি, আশীর্বাদ লেপটে থাকে মধুর মত!

অজমূর্খ এই হাফ-বুনো মানুষদের, আমি বুঝাই কী করে! এতটুকু নেশাও হয়নি, আর ভরও হয়নি আমার। অবচেতন মনের, এক একটা স্তরকে পেরিয়ে যাবার সময়, দেখা পেয়েছি মহাঋষি অষ্টাবক্রের। আর শুনেছি তাঁর মুখে পঞ্চ-পাণ্ডবদের বঙ্গ-বিজয় কাহিনী। যা' আমি কোন দিনও জানতাম না, পড়িনি কোথাও সে কথা।

যুবরাজপুর নাম থেকে কালক্রমে যে, দুবরাজপুর নাম হয়েছে, সে কথা এই প্রথম শুনলাম। ডিগ্রীধারী, ঝোলা চশমাবালা, অসম্ভব বোদ্ধা, ঐতিহাসিকেরা আমাকে জুতোপেটা না করলেই বাঁচি। সরকারী তকমার অধিকারী, এই জাতটাকে আমি চিনি।

সবাই সতৃষ্ণ নয়নে, আমার গলার দিকে তাকিয়ে আছে, আশীর্বাদী জবা-গাঁদা ফুলের জন্য। গলায় তিন চারখানা জবাফুলের আর গাঁদার মালার থেকে, একটা করে পাঁচটা ফুল খুলে নিয়ে সাধু-মার পায়ে দিয়ে, বাকীগুলো একটা একটা করে, সমবেত সকলকে দিলাম।

কোরাসে সবাই বলে উঠলো— "ছোট্ট সাদুবাবার জয়।" জয়ী আমি জীবনেও হইনি, কোন ব্যাপারে। প্রতিদিনই শুধু ভয় হয় আমার সব সময় যে, এই বুঝি কোন অনাসৃষ্টির মুখোমুখি হ'তে হবে। কারণ ঈশ্বর ভদ্রলোক, আমার পেছন মারবার জন্য, সততই নজর রাখে কিনা। আট-আনার হিঞ্চে শাক বা চার আনার ধনে পাতা খেতে চাইলে ও, ঈশ্বর বলে সেই ভদ্রলোক—তা'তে পেচ্ছাব করতে মুখিয়ে থাকে, এতটুকুও মিথ্যা তা নয়।

সবাই চলে গেলো একে একে। মন্দিরের বারান্দায় উঠে এসে বসে আছি, মাদুরের উপর কম্বল পেতে। মা এক কাপ কড়া চা এনে, ধরিয়ে দিয়ে বললো—"কী হঁয়েছিল ত্যুর বটে? ভর—লয়?" মাথা নেড়ে বললাম, "না। মাঝে মাঝে আমার অমন হয়—ও' কিছু না!"

মূর্খ মানুষ ওই কালী মন্দিরের সাধুমা। আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না জেনে, দুবরাজপুর নাম কেন হ'লো, সে কথা আর তাকে বলতে চাইনি। শুধু চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগলাম। একটু একটু করে হুইস্কি আর সারাদিন ধরে গেলা, সেই মহুয়ার চোলাইয়ের নেশা, কাটতে লাগলো। মাত্রা বেশী হয়ে যে **'যাত্রাপালা'** আজ দেখালাম, এতটুকু নিরামিষ হলে কী, তা'—দেখতে পেতাম!

ভোরবেলা হঠাৎ বালিশে টান পড়তে, মাথা ঘুরিয়ে দেখি, একটা বিরাট হনুমান, সেটা ধরে টানাটানি করছে। ধড়মড় করে উঠে পড়তে, সে ব্যাটা পালালো ভয়ে। বালিশটা নিয়ে সে ব্যাটা যে, কী করবে সেই জানে! নাকি সে আমাকে জাগিয়ে দিতে এসেছিলো, বেঘোরে মন্দিরের খোলা বারান্দায় ঘুমোচ্ছিলাম বলে!

সূর্য্য উঠি উঠি করছে, সোঁদাল গাছের ফাঁক দিয়ে। হনুমানটা তার ডালে বসে বসে চিবুচ্ছে, তার মিষ্টি মিষ্টি লাঠির মত লম্বা ফলগুলো। সোঁদাল গাছের নাম, তাই ওরা রেখেছে—**'বাঁদর লাঠি'** গাছ। কৃতজ্ঞতায় তাকে প্রণাম করে বসলাম, হাতজোড় করে **জ্যয় বজরঙ্গবলী।**

দাঁত খিঁচিয়ে, সে যেন কিছু একটা বললো। বিছানা-কাঁথা-মাদুর-বালিশ,

একপাশে গুছিয়ে রেখে, কুয়োতলায় চললাম জল নিতে, প্রাতঃকৃত্য সেরে ফেলতে। সকাল সকাল মিঠুও উঠে পড়েছে। সে চড়িয়ে দিয়েছে, চায়ের জল হিটারে। আমার চেয়ে, সে ব্যাটা বেশী চা-খোর মালখোর লয়!

চা খেতে খেতে তাকে বললাম, "আজ চড়কপূজা। আজ আমি বক্রেশ্বর যাবো। অনেক রাত হবে, ফিরতে। রাতে আমার জন্য প্রসাদ রাখিস।" মাথা নেড়ে সে এঁটো চায়ের কাপ দু'টো নিয়ে, নীরবে চলে গেল কুঁয়াতলায়, সেগুলো ধুয়ে ফেলতে। আমি গুছাতে লাগলাম আমার ব্যাগ। বেরিয়ে পড়তে হবে সকাল সকাল। গিরিকা-গিরিজা অপেক্ষা করে থাকবে হয়তো। মিঠুকে বলে বেরিয়ে পড়লাম, মামা-ভাগ্নে পাহাড়ের দিকে, মুসলমান পাড়ার ভিতরের রাস্তা ধরে।

নীল সংক্রান্তির রাত কাটিয়েছে, গিরিকা আর গিরিজা—ওই ন্যাড়ামুড়ো মামা-ভাগ্নে নামের পাহাড়টার মাথায়। ওরা কী জানে, আজ তারিখটা নীল সংক্রান্তি? সব গুহ্য লগ্নই, সব সম্প্রদায়ের কাছে—সমান মূল্যবান আর আদরের। ওরা মূলতঃ বৈষ্ণব হলেও, বাউল—শৈব নয়, যতটুকু আমি বুঝতে পারি।

পাকা রাস্তায় না গিয়ে, মুসলমান পাড়ার ভিতর দিয়ে, সরাসরি পৌঁছে গেলাম পাহাড়টার পেছনে। পেছন দিক দিয়ে পাহাড়ের মাথায়, উঠবার একটা সরু রাস্তা আছে। হাঁচড়-ফাঁচড় করে সেটা বেয়েই, উঠে পড়লাম পাহাড়ের মাথায়। দেখতে পেলাম তিন-মূর্তিকে সেখানে। আমাকে দেখা মাত্র স্বর্গ হাতে পাবার মতো, আনন্দে বিহ্বল হয়ে ছুটে এলো পাগলা গোপাল-সাধু, চিঁড়ে খেতে খেতে।

বছর দু'য়েক আগের দেখা, গোপাল আরও একটু বুড়ো হয়েছে। মাথার চুলে তার রূপোলী পাক ধরেছে। আমার বই *"নর্মদা-তীর্থ হতে"* দ্বিতীয় খণ্ড যাঁরা পড়েছেন, তাঁদের বলছি যে—সেই গোপালই, এই গোপাল। ভাল লাগছে, তাঁকে দু' বছর পরে দেখতে পেয়ে। ঢপাস করে সে আমাকে আর গিরিকা-গিরিজাকে প্রণাম করে ফেললো, বালখিল্য আর পাগলামোতে ভর করে! আমার কাছে গালি খায়, আবার আমাকেই ভগবান মানে সে!

তারপর তার নিজের, পা দু'টো বাড়িয়ে দিয়ে সে বললো, "এটা শিব্যের পা বটেক, প্রণাম কর্‌্যা লে ক্যানে। ত্যুদের মঙ্গল্ হবেক্ গ'। ম্যুর কথাটো শুনছিস্ লাই ক্যানে ত্যুরা?"

তাকে ডাহা-ডাহা ভড়কি মারতে বললাম, "তোমাকে তো ভোরেই প্রণাম করলাম, কালীমার কুঁয়ার ভিত্যর। ওই শ্রীচরণের ছায়া আমি কুঁয়ার জলের ভিত্যর দেখল্যম যে! ও'রকম সিদ্ধ্য শিবের পা, পেন্নাম না করে পারা যায়, তুমিই ভাই বলো! দু'বার পেন্নাম কল্ল্যে, আবার ওই পায়ে হাড় ফুটে গিয়ে, ফের পচবে।"

ভয় পেয়ে সে, পা দু'টো সরিয়ে নিলো। তারপর আমাকে বললো "ম্যুই বাউল দিক্কা লিছি গ'। কায়া-সাদন শিখাঁ লিছি, গুরুর থিঞা গ'। বড়োই কঠিন সাদন্ কিনা! ছোট সাদুবাবা, ত্যু বিশ্বাসটো কল্লি বটে?"

বলেই সে বসে পড়লো, গিরিজার পাশে। ওরা বুঝে ফেলেছে যে, গোপাল আমার চেনা। কিন্তু হাড়-বেহদ্দ পাগলটাকে, কোন মতেই তাড়াতে না পেরে, মনে মনে বিরক্ত হয়েছে ও'রা। ওদের সাধন ভজন চৌপাট হয়ে গেছে, ভোরবেলা থেকে। কোথা থেকে পাগল মহারাজ এসে জুটেছে, সেই ঝুঁজ্কো বেলায়!

কোমরের হাফ-প্যান্টে, শত শত তাপ্পিমারা তার। এসেই ওদের দু'জনকে দেখে সে বলেছে, "আম্যু গুপাল্ বাউল্ আছি গ'। ম্যুর মনে লিছে, ত্যুকে সাদন- সংগিনী বানাই লিব ক্যানে। কুন্ঠি-বদল্ করবার লাগবেক্ বঠে। গুরুর সিরি-চরণে ত্যুর ঠাঁইটো, পাকা কর‍্যাঁ দুব ক্যানে! কায়া-সাদন গুরু ত্যুকে শিখাই দিবেক। ত্যুর ক্যুন চিন্তা লাই! এই কায়া-সাধন হলো, শরীরের কোটর থেকে, সে কালী-কোট্টরীকে টেনে বার করা, তাপ আর তপ দিয়ে -ঘা মারতে মারতে! লিঙ্গের তলায় স্বাদীষ্ঠানে ঘুমায় সে বেটী বটে !"

বেজায় ফ্যাসাদে পড়ে ওরা, আমার অপেক্ষায় আছে। চিড়ে-মুড়ি খানিকটা এনে, তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে, শান্ত করেছে ওরা তখনকার মতো তাকে। ওই বস্তু চিবোতে চিবোতেই, সে এসে আমাকে তার ওই সুন্দর, খবর শুনিয়েছিলো—বাউল হ'বার।

ইশারায় ও'দেব বললাম যে, "পাগল হলেও, গোপাল খুবই ভাল লোক। ভয় পাবার বা তিতি-বিরক্ত হবার, কোন কারণ নাই। আমিই সব ম্যানেজ করে নেবো। এসেই যখন পড়েছে, ও'কে তাড়ানো খুবই মুস্কিল হবে। তার চেয়ে ওর রগড় দেখলে, বরং সীমাহীন বিনিমল-আনন্দ পাবে তোমরা। এখন চুপচাপ থাকো তোমরা।"

গোপালকে আমি বললাম, "গোপালবাবা, তুমি যে বাউল হয়েছ, কই তোমার সেই একতারা, পায়ের জোড়া ঘুঙুর? প্যান্ট পরে কী, বাউল নাচবে নাকি? তাছাড়া, তুমি নাচতে পারো কিনা, সেটাও তো—দেখতে হবে! গিরিকার সাথে, ত্যুমি লাচ্ করতে পারবে তো?"

—— "আম্যু লাচ কত্তে পারি গ'। আমার গুরু-মহাজন, শিখাঁই দিছেক উটা বটে। খালি বুল্যা দিছে "গুপ্যাল, ওন্য লাচ্ করবিক্ লাই। কালী পূজার লাচ্ করবিক্ খালি। ত্যু দ্যাখ্ ক্যানে, কালীপূজার লাচ্টো। উটা লক্ত-খাকি লাচ্ বটে!"

বলেই, গোপাল একটা লাঠি কুড়িয়ে নিয়ে, সেটাকে খড়্গ বানিয়ে নিয়ে; লম্বা লম্বা জিব বের করে নাচতে লাগলো, কোলা-ব্যাঙের মতো। নুড়িতে পা লেগে হড়কে

গিয়ে, চিৎপটাং হয়ে গেলো সে। অতগুলো লোকের সামনে, বেইজ্জতি হলো তার। তাই উঠে পড়ে, রাগে গরগর করতে করতে, বেজায় গালি দিতে লাগলো—নুড়ি পাথরগুলোকে। মুখে কাপড় চেপে হাসছে, গিরিকা আর গিরিজা। জোরে জোরে হাসলে, গোপাল অসম্ভব ক্ষেপে যেতে পারে, সেই ব্যাপারে ভয় পেয়েছে তারা।

সারাদিন বনে-বাদাড়ে পথে-ঘাটে, সে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। কখন যে কী খবর আর খাবার তার জুটে, সে নিজেও জানে না। বাস-রাস্তার ধারের, বৈঁচি কুলের গাছ থেকে, পেড়েছে সে কাঁচা কাঁচা বৈঁচি। পকেটে রেখেছিল ধীরে-সুস্থে খাবে বলে। অনবধানতায় ছড়িয়ে পড়েছে, এখন সে-গুলো। কুড়াতে ব্যস্ত হয়ে উঠলো সে। সাপের মন্ত্রের মত, পাগলকে ঠাণ্ডা করার একটাই মন্ত্র আমি জানি, তা' হলো-- তাকে দাবড়ানি দেওয়া। তাইই করলাম, তার বেজায় পাগলের রাগ কমাতে।

—— "ফের তুই শালা, পাথরকে ল্যাংটা গালি—আর খিস্তি দিচ্ছিস? শালা, পাথর-লুড়ি—শিব-দুগ্গা, রাধা-কীষ্ট আর লক্ষ্মী-লারায়ণ হয়, জানিস্ না? লাচতে জানিস না, বলিস্ উঠোন বাঁকা! কালীর মার খেয়ে, মা-তারা পালিয়েছিল সেই তারাপীঠে, ফের তাকে ডাকবো? সে এলে তোকে কাঁচা কাঁচা খাবে, এমনিতেই তার মুখে, সব সময় রক্ত লেগে থাকে।"

"তোকে এক কামড় খাবে, আর ওই বঁইচিও একমুঠো করে খাবে, নুন-লঙ্কা দিয়ে—চাঁট করে। কাঁচা-কাঁচা, টক-টক বঁইচি পেড়ে এনে—পকেটে রাখা? তোর মতো সাধুর পণ্ডায় ও'গুলো ঢুকবে রে শালা! গ্যুপাল, মরার জন্য তোর—মরণ-পাখা গজিয়েছে পিঁপড়ের মতো। আমি এখন অসম্ভব রেগে আছি। মা-কালী এখনো বঁইচি কুল একটাও দাঁতে কাটেনি, আর তুই কিনা সেগুলো চুরি করে, তোর ছেঁড়া মড়ার প্যান্টের পকেটে রেখেছিস!

মা কালীর বাগান থেকে ওইগুলো পাড়বার সময়, তাকে বলে ও'গুলো পেড়েছিলি?" শ্মশান থেকে ফিরে, বাগান ফাঁকা দেখলে, কা'কে ধরবে শুনি। আমি কিন্তু বলেই দেবো যে— গোপাল বাবা, ওইগুলো ঝেড়ে দিয়েছে— নোলায় তার জল এসেছিলো বলে! আমাকে একদম তুই, দোষ দিতে পারবি না!"

—— "বাগ্যান থিএ্যা লিই নাই গ'। পথের ধারে জঙ্গুলের মধ্যি ছিল্য বটে। পেট্যের জ্বালায় লিছি গ'। খেবার পেছি না গ'—ছুট্যো সাদুবাবা!"

—— "আরে শালা, পথের ধারেই তো, মা কালী বাগান করে রেখেছে। তার বাগান কি, লোক্যের বাগানের মত হবেক? তুই করলি চুরি, আর লজ্জায় মা কালী জিভ কেটে, জিভ বের করে রেখেছে। তোর জন্যই তো, সে আর জিভটোকে, মুখের

ভেতরে ঢুকাতে লারছে। ত্যুই ডাহা ডাহা মরেছিস্ শালা। তোকে কাঁচা খেয়ে ফেলবেক রে— সে বেটী। এখুনো সময় আছে, আগে তুই বাচ্চা-মা-কালীকে পেন্নাম কর!"

বলেই, দেখিয়ে দিলাম গিরিকাকে। ছুটে গিয়ে সে দড়াম করে, পড়লো গিরিকার পায়ে। সমস্ত বৈঁচিগুলো দু'হাত ভরে সে রেখে দিলো, গিরিকার পায়ের কাছে, পূজার নৈবেদ্যর মতো। হাসতে হাসতে তাইই আবার, গিরিকা তুলে দিলো তার হাতে।

একটা সে ফেললো নিজের মুখে, আর একটা গিরিজার মুখে দিয়ে, কপট-বিকট হাসতে লাগলো। মুখ নীচু করে আছে পাগলা-বাঞ্চোৎ গোপাল। হাতের আঁজলায় তার কাঁচা-বুনো বৈঁচি। বড় মায়া হলো, তার হেন দুরবস্থা দেখে। সান্ত্বনা দিতে গিয়ে তাকে চুপিচুপি বললাম ঃ-

"বাচ্চা **'মা-কালী'** আর **'শিব'** দু'জনেই খুবই খুশী হয়েঁছে। ও'গুলো একদম পেসাদ হয়ে গেছে। লে শালা, পকেটে ও'গুলো তাড়াতাড়ি পুরে ফেল্। আর কখুনও বাচ্চা-মা-কালীকে বিরক্ত করবি না। ভাল করে এখুনো নাচতে শিখ্‌লি না, বলিস্ কিনা বাউল হঁয়েছিস!

"তুই বাউল না, বুনো ওল? শালা, তোর চুলকানি বড়ই বেশী, বুঝলি? একদম চুপ করে থাকবি, শালা! চল্ আজ তোর সেই, বক্কোমুনির ঠাঁই যাবো আমরা। তোকে সেই প্যাঁচা-ভূতেরা আর কী ঢিলায়? নাকি, ত্যুই রাগের চোটে—ওদের ঢিলাস্? সেই ব্যাপারটা ভাল করে জানতে হবে!"

মাথা গোঁজ করে সে, জুতো পরছে কারুর দিকে না তাকিয়ে। এক পায়ে একখানা হাওয়াই চটি, কলা-গাছের শুকনো ছাল দিয়ে বেঁধে, অন্য পায়ে পরতে লাগলো এক পাটি বুট-জুতো। রাস্তার ধারে পড়ে থাকে, এমনি কতই এক পাটি জুতো। তারই একটা করে আছে, তার সঞ্চয়ে এখন।

মহামূল্য এই সম্পদ, তার ওই নধর নধর পা দুটোকে রক্ষা করে চলেছে। জোরে জোরে হাঁকাড় মেরে উঠলাম—"ব্যোম ভোলেনাথ্। বুট জুতা আর হাওয়াই জুতার খেল্, দেখে যা শালী—মা কালী। তোর বাপ-চৌদ্দ-পুরুষেও, এমনটা আর দেখতে পাবি না। তোর গোপালকে দেখে যা বেটী। তোর জিভটা ভেতরে সেঁদোলো বটে! নাকি ঠেলে ঢুকিয়ে দিতে হবে?" লাজ্ঞ সামান্ না থাকলে, তোর জিভে হাত-ই আমি দেবো না!"

গোপাল একবার, ট্যারা করে তাকালো গিরিকার দিকে। জিভ বের করা আর তার নাই দেখে, সে দৌড়ে এসে আমাকে দু' হাতে জড়িয়ে ধরে বললো— "সেঁদোয় যেছে গ' সাদুবাবা। উ্য মা কালী, জিবটো ভিত্যরে লিছেক বটে!"

তারপর সে জুতো পরা নিজের পায়ে, নিজেই দু'বার পেন্নাম ঠুকে বললো—'চল্ ক্যানে বক্কেশ্বরের থানে। ত্যুকে লিয়ে যাব বটে সিখানে। ম্যুর কতো শিষ্য সিখান্যে আছে গ' সাদুবাবা। কালী গ'—মা গ'—ত্যু চল্ ক্যানে ম্যুর সেথ্যে'।

বলেই সে চাইলো, গিরিজা-গিরিকার দিকে। ইঙ্গিতে আমি ওদের উঠতে বললাম। উঠে পড়লাম আমরা সবাই। নামতে লাগলাম পাহাড়ের মাথা থেকে, আস্তে আস্তে নিচের দিকে—নাট মন্দিরের দিকে! ওই ও'পারে—পশ্চিম দিকে—আনন্দ কাননে, অঘোরীবাবা শুয়ে শুয়ে, সে ব্যাপারটা দেখলো কিনা জানি না।

তবুও যেন মনে হলো—বলছে, ওই শালী পিঙ্গি, আর দুই শালা পিঙ্গা—'ফিঙ্গা'র মতো কালো কুচকুচে কে সামলাতে পারবি তো? ওরা এতটাই বড় যে—তোর ওই শুকনো বীচি দু'টো কেটেই, ধরিয়ে দেবে—তোরই মূর্খ হাতে!

নিজের মনে বেজে উ[illegible] কথাগুলো [illegible] বড়ই ভয় পেয়ে গেলাম। মনের ভেতরে বসে বসে, কোন শালা যে মাঝে মাঝে কথা বলে— সে ব্যাপারটা ঠাহর করতে আজও পারিনি! জয় কালী, তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। চল্ নিয়ে চল—কোন চুলোয় নিয়ে যাবি। যেখানে নিবি—সেখানেই যাবো আমি।

এখানেই দেখা [illegible] গোপালের [illegible]
গিরিকা-গিরিজার।

নবম অধ্যায় :



ক্যাঁকর্-কোঁকর্ শব্দ করতে করতে, চলেছে একখানা গরুর গাড়ী। সেটাকে হাত তুলে থামাতে গিয়ে, গোপাল শুরু করেছে তার অকৃত্রিম চেঁচামেচি। গাড়োয়ান বলছে সে বক্রেশ্বর যাবে না। গোপাল বলছে যে, তাকে যেতেই হবে বক্রেশ্বরে। আমি দৌড়ে গিয়ে থামালাম তাকে। বললাম—"গোপাল, ছু মন্তরে একটা গাড়ী আমি, লিয়ে আসব? সেটাই আমাদেরকে লিয়ে যাবে? ওকে এখন ছেড়ে দে। তুই শালা, গরুর গাড়ীতে সারাদিন ধরে অত রাস্তা যাবি নাকি?"

সকালের বাস গাড়ী আসার, সময় হয়ে গেছে বুঝে, সে কথাটা তাকে বলেছিলাম। সে ভেবেছে যে, মন্ত্রের দ্বারায় আমি বাসটাকে—নাকে দড়ি দিয়ে টেনে টেনে আনবো। খুব খুশী এখন সে, মোটর গাড়ী চড়তে পারবে বলে। কেউ তো আর তাকে, গাড়ীতে আদর করে চড়ায় না। পকেটের সেই বঁইচিগুলোকে, দু' হাতে মুঠো করে ধরে, সে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইলো, বাস রাস্তার ধারে। যেন প্রকৃত ধ্যানস্থ মহাকাল, হয়ে গেছে সে। কাল বা প্রহর গুণছে বাসগাড়ী আসবার!

সকাল সকাল যায়, ম্যাটাডর গাড়ী ভরে মাছ, শাক্-তরিতরকারী, ফুল আরও কত কি! গাড়ীটাকে হাত দেখালাম দাঁড় করাতে। হুস্ করে সেটা বেরিয়ে গেল, না দাঁড়িয়ে। গোপাল কাঁচা কাঁচা খিস্তি, দিতে লাগলো সেই ড্রাইভারকে। ম্যাটাডরের বেশ কিছুটা পেছনে ছিলো, একটা পুলিশের জিপ গাড়ী। সেটা দাঁড়িয়ে পড়তেই, গোপাল দৌড়াতে শুরু করেছে ভয়ে—এই বুঝি সে ধরা পড়ে যায়!

আমরা হো হো করে হেসে উঠাতে, পুলিশগুলোও হাসতে শুরু করেছে। একজন পুলিশ জানতে চাইলো—আমরা কোথায় যাবো? বললাম, "বক্রেশ্বর যাবার ইচ্ছা আছে।" উঠিয়ে নিলো তারা আমাদেরকে। গোপালকে হেঁকে ডেকে বললাম, "চলে আয়, পুলিশ তোকে ধরবে না। তোর মতো বড়সড় সাধুকে পুলিশেরা ধরে না।"

সন্দেহের দৃষ্টিতে সে চাইতে চাইতে, কাঁপতে কাঁপতে এসে, উঠলো জীপের

পেছনে। তার সাজ-পোষাক, আর ভ্যাবাচাকা অবস্থা দেখে. পুলিশেরা মুখে রুমাল চেপে হাসতে লাগলো। পুলিশের দিকে চেয়ে গোপালের ভয় ভাঙ্গাতে বললাম, "এক নম্বর সাধু-বাউল-মুনি-ঋষি হচ্ছে, এই গোপালবাবা। আপনাদের খুব পুণ্য হবে আজ। বস্তা বস্তা পুণ্য নিয়ে, বাড়ী যেতে পারবেন আপনারা।"

তারপর গোপালের দিকে তাকিয়ে বললাম, "দু' বস্তা পুণ্যি দিয়ে দিস্ গোপাল। একদম ভেজাল দিবি না, খাঁটি পুণ্যিই দিবি। বুঝলি কিনা!" মাথা নেড়ে গেল পাগলা গোপাল। জড়সড় হয়ে সে বসে রইলো, আমার গা ঘেঁষে। পাগলের দাওয়াই পড়েছে—পাগলের পেটে। যারা পেলো না তার করুণা, তারা ব্রাত্য বটে!

এগিয়ে চলেছে গাড়ী, বক্রেশ্বরের পথে। পুলিশ অফিসার রসিক মানুষ। সে সিগারেট বের করে, আমাদের তিন জনকে তিনটা দিতে, বললাম—"আরও একটা দিন মায়ের জন্য।" পুলিশ অফিসার ঘাবড়ে গিয়ে, আরও একটা বের করে বাড়িয়ে ধরলো গিরিকার দিকে। গিরিকা কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ না করে ধরিয়ে ফেললো, সেই সিগারেটটা। তারপর দু'টান মেরে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললো—"কী নাম বটে ত্যুর উ পুলুশ?"

—— "সমর ঘোষ, মা।"

—— "তা, নামটা ত্যুর ভাল বট্যে। গান শুনবি নাকি? আলকাপ্ ত্যুকে শুনাই দিব রে পুলুশ ব্যাটা। খালি তো চোর-চামার লিয়ে থাকিস্, গান শুনিস?"

পুলিশ অফিসার, আমার মুখের দিকে চাইতে, আমি বললাম, "গিরি-মার গলা বড্ড ভাল, অফিসার। একেবারে পাগলা করে দেবে আপনাকে। আমাদের জন্য আপনি যখন এতটা করলেন। ও' না হয় আপনাকে একটা গানই শোনালো!"

পথে ঘাটে দেখা, বাউল-বাউলানীকে কদর না দিলেও, গাড়ীতে উঠিয়ে নেওয়া—মেয়ে বাউলের গানটা যে, শুনতেই হয়। বিশেষ আমার মত কাঁচাপাকা দাড়ির একটা সাধু, যখন তাকে সার্টিফাই করছে! অনিচ্ছা সত্ত্বেও, সে রাজী হয়ে গেলো গান শুনতে। গিরিকাও শুরু করেছে গাইতে আমার লেখা গান।

কদম্বখণ্ডীর ঘাটে, তার চুরি করে লেখার কথা, সে অকপটে আমার কাছে; সেদিন স্বীকার করেছিল। আজও শোনা হয়ে উঠেনি, সমস্ত গানগুলোর সুর ঢালা রূপ। শুরু হলো তার গান ঃ—

"ঝিঙাফুলের বুকের ভিত্যর,
নোলা লাগাই মধু খেছে ফড়িং রে—
মেয়্যার বুকের মধু খেলে,
দুষ্টা ক্যানে হবেক রে—উ সমাজ, দুষ্টা ক্যানে ....

পুরুষ-ম্যেয়ায় হরষ মিটায়,
এক জনেকে আরেক তাতায়,
মেয়্যা লাফায় পুরুষ লাফায়—
কে ধরে কার দোষ রে,
সমাজ খালি চিল্লে মরে
'নজ্জা-নজ্জা' করে রে!"

.... *সোমানন্দ অবধূত*

হাঁ করে শুনছে, পুলিশ অফিসারটি। ড্রাইভার যে কখন, গাড়ী বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়েছে, আমরা কেউই বুঝতে পারিনি। খেয়াল হলো গান বন্ধ হতে। আবার গাড়ী স্টার্ট দিল ড্রাইভার। গোপাল আপন মনে হেলে দুলে গান শুনছিলো। সে যেন ঘুম থেকে উঠেছে—এমনতর তার চোখ মুখের চেহারা।

হুমড়ি খেয়ে পড়লো সে সামনের দিকে, গাড়ীর হঠাৎ জার্কিংয়ে। নিজের পায়েই সে, দু'তিনটা সেলাম ঠুকলো পর পর। এদিক ওদিক ডাইনে বাঁয়ে তাকাতে তাকাতে, সে চেঁচিয়ে উঠলো—"এস্যে যেছিগ' সাদুবাবা—পুলুশবাবা। কালী মা গ', লেব্যে পড় গ'—বক্কোমুনির ঠেঁই এসে যেছি গ'!"

তার চেঁচামেচিতে আমাদের খেয়াল হলো যে, আমরা বক্রেশ্বরের দোর গোড়ায় এসে গেছি। পুলিশ অফিসার খুব খুশী হয়েছে, নুতন গান শুনে। যারপর-নাই আনন্দে নেমে গিয়ে, সে অর্ডার দিলো আমাদের সকলের জন্য, মুড়ি জিলিপি আর তেলে-ভাজার। আমাদের চার জনের হাতে, চারখানা ঠোঙা ধরিয়ে দিয়ে, নিজেরা দুটো ঠোঙা নিয়ে, তারা নমস্কার জানিয়ে চলে গেলো সিউড়ির দিকে।

কার অন্ন কে কা'কে খাওয়ায়, একমাত্র খাওয়ানোর মালিকই তা' বুঝে। গোপাল চোখ বুজে চিবিয়ে চলেছে, মুড়ি জিলিপি আর তেলেভাজা। মাঝে মাঝে চোখের জল মুছে নিচ্ছে সে স্যু স্যু করে। গোগ্রাসে খেতে গিয়ে সে মনে হয়, চিবিয়েছে গোটা একটা লংকা। চোখ মুখ গরম হয়ে লাল হয়ে উঠেছে।

তার দিকে তাকিয়ে রেগে বললাম—"ধীরে ধীরে খেতে পারিসনি শালা? একেবারে হামলে পড়ে খাচ্ছিস? কেউ নিয়ে নেবে নাকি? কমণ্ডলুটা নিয়ে কল থেকে জল টিপে খা গিয়ে। মরে যাবি শালা— তোর হেঁচ্‌কি উঠছে।"

গোপাল দৌড়ালো রাস্তার পাশে, টিউবেলের দিকে কমণ্ডলুটা নিয়ে। আমরা তিনজন, দোকানদারের জলের মগ থেকে জল খেয়ে, চার কাপ চায়ের অর্ডার দিতে গিয়ে জানলাম যে, চায়ের দামটাও—সেই পুলিশ অফিসার দিয়ে গেছে!

—— "চান করেঁ শুদ্ধু হয়েঁ লিলম্ গ'—ছুটো সাদুবাবা। বক্যেশ্বরের জল বড়

পবিত্ত গ'—সগ্যের উঠ্যানে পা-টো রাখলম্, মনে লিছে!''

ছেঁড়া প্যান্টের কিনারা বেয়ে, টপটপ করে পড়ছে জল। টিউবেলের জলে আরাম করে চান করেছে, পাগলা গোপাল। তার দিকে তাকিয়ে বললাম—''খুব হয়েছে। এবার তুই সঙ্গে যাবি বুঝতে পারছি—উঠানে যখন পা রেখেছিস, তবে আর তোকে ঠ্যাকায় কে! এখন চা খেয়ে আমাদেরকে উদ্ধার কর্ শালা।''

চা খেয়ে হাঁটতে লাগলাম, বক্রেশ্বরের মন্দিরের দিকে। গোপাল হঠাৎ দৌড়াতে লাগলো, বাঁ-পাশে পুষ্করিণীর দিকে। ঝাঁপিয়ে পড়লো ঝপাস করে সেই দীঘিতে। উঠে যখন এলো, দেখলাম হাতে তার পাঁচ-ছ'টা রক্তপদ্ম, টাটকা টাটকা। বিনা ফুলে পূজায় হয়তো, তার মন ভরে না।

যে গিরিকা আর গিরিজা, মনে মনে ক্ষেপে ছিল, পাগলা গোপালের উপর, তাদের মুখে দেখলাম, নুতন বৈশাখের প্রভাতের মিষ্টি হাসি, পদ্মের মিষ্টি সুগন্ধে উচ্ছল। গোপাল আমাদের সবার আগে। পায়ে তার দীঘির পাঁক মাখা। গা থেকে ঝরছে জল। সে আজ আমাদের **তীর্থগুরু**।

সেইই মন্ত্র পড়াবে আমাদের, সিংহবাহিনীর মন্দিরে। দেখিয়ে দেবে অষ্টাবক্র ঋষি, কোথায় বসে ধ্যান করতো দুর্গাকে। সকালেই সে গালি খেয়েছে—ধমক খেয়েছে আমার কাছে। এখন মনে মনে অনুতাপ করা ছাড়া, আমার আর তাকে দেবার কিছুই নাই। আমি এখন নির্ধন।

গোপালকে দেখে সবাই সরে গেল। প্রথমতঃ সে যে পাগল, সে কথা সবাই জানে, সে স্থানীয় মানুষ বলে। দ্বিতীয়তঃ তার কোমর পর্য্যন্ত দীঘির কাদা-পাঁক ল্যাপটানো। এই দুই মোক্ষম কারণে, সবাই তাকে এড়িয়ে যেতেই, সুযোগ হয়ে গেল আমাদের। ভিড় ঠ্যালাঠেলি আর, করতে হল না আমাদেরকে।

প্রথম বৈশাখের পুণ্য দিন। সবাই পূজা দিয়ে পুণ্যে কোঁচড় ভরতে চায়। অভাগা কপালে মোচড় মেরে মেরে, আখের মত নিংড়ে নিতে চায় সবাই—পুণ্যের মিঠে মিঠে রস। কিন্তু জীবন তো রসেবশে কখনই থাকে না। মেঘছায়াই তার স্বাভাবিক রূপ। অপরূপা ঈশ্বরই যে অরূপ!

তোৎলা গোপাল বলতে শুরু করেছে—''ওঁ ভুভুবশ্য তৎ সবিতু বয়েনং ভগ্গো দেবস্ত দিমাইঃ, দিয়ো উঁ নো পচো দয়াৎ।'' ***(''ওঁ ভূর্ভুবস্য, তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধিমহি, ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।'') (ভার্গববংশীয় এই বিশ্বনিয়ন্তা বরেণ্য সূর্য্যদেবকে আমরা প্রণাম জানাচ্ছি। তিনি আমাদেরকে তাঁর নামে উদ্বুদ্ধ করুন।*** তিনি আমাদেরকে তাঁর উপাসনায় উদ্বোধিত করুন)।

আমরাও তার সুরে সুর মিলিয়ে বলতে লাগলাম, ওই ব্রহ্ম-গায়ত্রী মন্ত্রটুকু।

মাঝে মাঝে মনে প্রশ্ন জাগে—গোপাল, পাগল বটে তো? নাকি ওটা ওর পাগলের ছদ্মবেশ। কিন্তু সবাই তো গোপালকে, ডাহা পাগল বলে জানে! মাঝে মাঝে তবে সে, অমন করে স্থির হয়ে যায় কেমন করে?

নিশ্চল-নিষ্পলক নিষ্পন্দ তার ক্ষণিক স্থিতি, যোগমার্গের অনেক লক্ষণই তুলে ধরে! তবুও পাগল নাম তার ঘুঁচেনি—প্রকাশিত হয়নি, তার অন্য রূপ, আমাদের কাছেও। আজ গোপাল যেন পাগলত্ব ছুঁড়ে ফেলে, সমাহিত হয়েছে মহামায়া সিংহবাহিনীর সামনে। কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগলো আমার—মনের ভিতরে ভিতরে। গোপাল বলে চলেছে—" ওঁ হিরিং চন্দিকে দেবী, ইআ গচ্চ ইআ গচ্চ।

ইঅ তিস্‌ট, ইঅ তিস্‌ট।
ইঅ সন্নিদেয়ি, ইঅ সন্নিদেয়ি।
ইঅ সন্নিরুদ্যস্ব্য, ইঅ সন্নিরুদ্যস্ব্য।
ইঅ সন্নিতা ভবো—ইঅ সন্নিতা ভবো।
অত্তাধিস্‌টনং কুঁড়ুঁ দেবী, মম পূজাং গিহাণ্‌।"

।। ওঁ ঐং হিরিং কিলিং হিলিং হিরিং কিলিং ন-নমঃ।। (আসল মন্ত্রটা শ্রীশ্রী চণ্ডীতে দেখে নিন। তোৎলা গোপাল ঠিক ঠিক বলতে পারেনি। যেমন বলেছিল তেমনই লিখে দিলাম।)

বলেই সে ছুঁড়ে দিলো, তার হাতের রক্তপদ্মটা দেবীর পায়ে। তার দেখাদেখি আমরাও দিয়ে দিলাম, আমাদের হাতের ফুলগুলো দেবীর পায়ে। তাকিয়ে দেখলাম তার দিকে। বোবা নিথর নিস্পন্দ তার পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই পুঁচকে শরীর। চোখ দিয়ে ঝরছে তার, নীরব অমৃত-অশ্রু। চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে, সমবেত অন্যান্য ভক্তরা, পূজা দেবার অপেক্ষা তাদের।

হতবাক গিরিকার নুপুর, হঠাৎই সবাক হয়ে উঠলো, খমক আর খঞ্জনীর সুরে সুরে। মহাসতীর গর্ভগৃহে, মহাবাউলানীর মুখিয়ে উঠা নুপুর ঝংকার, বিলোল নৃত্য-কলা নামিয়ে এনেছে, এক পরম পবিত্র ক্ষণ, যা' শুধু অনুভবের দরজায় কড়া নাড়ে বার বার; উন্মন আর উদ্ভ্রান্ত করে তুলে।

"ভবানী ভবনে ডালি ভরে নিয়ে
আমরা এসেছি পূজার তরে,
দেখা দেনা মাগো—শংকর-জায়া
বিভূষিত কর্‌ বরাভয়ে বরে;
জনমে জনমে যেন নাই ভুলি—
ও' রাঙা চরণ ডমরু-ত্রিশূলী;
দুখ্‌ আর ব্যথা মুছে দে মা শিবা

আপন কোরে আপন করে—
আমরা এসেছি ডালি ভরে নিয়ে, পূজার তরে!"

.... *সোমানন্দ অবধূত*

ঝর ঝর করে পড়তে লাগলো, পুষ্পাঞ্জলির ফুল। গোপাল, গিরিকা-গিরিজার মাথার উপর দিয়ে, দুর্গার পায়ে—ফুল ছুঁড়ে ফেলছে ভক্তরা। কী যেন এক অজানা বিশ্বাসের, আর ভক্তির ঘোরে, ডুবে উঠেছে ভক্তকুল। সেই বিরাট বিপুল আত্মনিবেদনের পরম পবিত্রক্ষণে।

আমি শুধু সন্দিগ্ধ হয়ে উঠছি, ঈশ্বরী দুর্গার দিকে তাকিয়ে। এতটুকুও ভাবতে বা বিশ্বাস করতে মন চাইছে না যে, সে যদি সদয়া হবে, তবে এত দুঃখব্যথা নিয়ে, যুগে যুগে মানুষ কেঁদে মরে কেন? মানুষের মূর্খতা-লোভ-লালসামাখা, দরদাম কষা ভক্তি কী, তার আসন সত্যিই টলিয়ে দিতে পারে!

গোপালের বেহদ্দ পাগলামীটাকে বুঝি বলে, তাকে সরিয়ে আনতে গিয়ে, বেজায় এক ইলেকট্রিকের শক্ খেলাম। ছিটকে পড়লাম পাঁচ সাত হাত দূরের দেওয়ালে। আজও আমার বিশ্বাস হয় না যে, গোপাল সত্যিই সেদিন বিদ্যুতায়িত হয়েছিল, আত্মনিবেদনের অনাবিল মুহূর্ত্তে।

পেছন ফিরে গোপালই সেদিন কাদা মাখা হাতে, আমাকে জাপটে ধরে, মাটি থেকে তুলেছিল—"ত্যু হেথা ক্যানে গ'—ছুটো সাদুবাবা? শরীট্টোয় যুত্ পেছিস্ না নাকি? মা দুগ্গা ত্যুকে দেখ্যে হাসলো ক্যানে!" আমার চোখের তারায় তারায় চোখ রেখে, দৃঢ় প্রত্যয়ের গভীর এক জিজ্ঞাসায়, বিদ্ধ করলো সে আমাকে।

মা দূর্গা আমাকে দেখে হেসেছে, আর পাগলা গোপাল সেই হাসি, দেখতে পেয়েছে, ছিট্‌কে পড়েও আমি না হেসে পারিনি। কে পাগল? আমি না গোপাল! গিরিজা-গিরিকাও আমাকে, ছিটকে পড়তে দেখেছে। তারাও কারণ খুঁজেছে অভাবিত সেই ঘটনার। তাদের জিজ্ঞাসার একটাই উত্তর আমি দিয়েছি—"ও' কিছু না, তোদের দেখার ভুল।"

থেমে গেছে ওরা। ভেতরে ভেতরে থামতে কিন্তু, পারিনি আমি। আজও খুঁজে বেড়াই, সেদিনের সেই পরম ক্ষণের কার্য্য-কারণ। বুকের ভেতরটায় শুধু মোচড় মারা ব্যথার পদ সঞ্চারের শব্দ পাই! ককিয়ে উঠি নিজের মধ্যে, গোপালকে আবিষ্কার করতে গিয়ে। হায়রে, সে উত্তর যে বড় নিষ্ঠুর—নিরুত্তর!

জাপটে ধরে তুলতে গিয়ে, আমার গোটা গায়ে কাদা লেপেছে গোপাল। পাগল-

ছাগল মানুষ, কী আর বলি ও'কে। বক্রেশ্বর শিবের মাথায় পূজা চড়িয়ে, বেরিয়ে এলাম সেখান থেকে, উষ্ণ প্রস্রবণের ধারে। নীচে নেমে কাদা ধুয়ে ফেললাম, গেরুয়ার থেকে। গোপালকেও বললাম, গায়ের পায়ের কাদা ধুয়ে নিতে। সুবোধ বালকের মত সে তাই করলো। বেশ কিছুক্ষণ সেখানে বসে, সবাই বিড়ি খেয়ে উঠে পড়ে, পা বাড়ালাম অঘোরীবাবার সমাধির দিকে।

বক্রেশ্বরের এই মহাপুরুষ, এক কিম্বদন্তীর নায়ক। লোকে তাকে বলতো চলন্ত শিব। মড়ার মাথার গলিত ঘিলু, মাটির খুরীতে ধরে নিয়ে, সে নাকি খেতো গরম ভাত আর পান্তা ভাতের সাথে। জানি না, কতটা সত্যি সে কাহিনী। তবুও বিশ্বাস করতে হয়, তার সেই খাদ্যাভাসের ঘটনাকে।

কারণ অঘোরীবাবাকে না দেখলেও, আমি এই দু'চোখ দিয়ে দেখেছি, অন্যান্য অঘোরীদের মড়া খেতে। তাদের পাল্লায় পড়ে, আমাকেও যৎকিঞ্চিৎ মুখে তুলতে হয়েছে মড়ার মাংস, পিশাচ—সাধনার পাঠগুলোতে। শাস্ত্রে এই মড়ার মাংসকে বলে মহামাংস। মহাকালীর অরুচি রোগ হলে, গোটা গোটা মড়া, প্রতি দিন তাকে উৎসর্গ করতে হয়, রাতের বেলায় ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে মহাশ্মশানে।

এই নাকি দস্তুর—এ' লাইনের। ফল কি হয়েছে জানি না। তবে মাঝে মাঝে যখন এই শরীরটা ফেলে রেখে, বেরিয়ে পড়ি অজানার সন্ধানে, তখন আশেপাশের লোকেরা বলে—আমি নাকি মূর্চ্ছা গিয়ে, গোঁ গোঁ শব্দ করি। গুঢ় এই কারণের ভেতর, কী গুড় যে মাখানো আছে, শুঁড় ঢুকালে হাতীর মত মনের গর্ত্তে, তবেই তার সন্ধান মেলে। এলেবেলে চিন্তা আর চেষ্টায়, তেষ্টা মেটে না, কেষ্টাও ধরা দেয় না।

সুযোগ সন্ধানীরা বলে 'বাঁদরামো' কী 'ভীমরতি'—লোক ঠকানোর ছলাকলা। তাদের আমার এটুকু বলা যে, জানতে গেলে জ্যান্ত এই শরীরটাকে উৎসর্গ করতে হয়। না হলে কোন কিছুই সম্ভব নয়। সব কাজেই এটার প্রয়োজন—এই শরীরই সৃষ্টির ফুল ফোটায়। আবার এটাই মহাকাল হয়ে ধ্বংস করে—আগুন জ্বালায়—আগুন নেভায়ও!

চাষ করতে, মাটি কাটতে, মারপিট করতে কী সন্তান উৎপাদন করতেও দরকার, এই শরীরের। কালী কী কেষ্টকে ধরতেও এই শরীরটা লাগে। পদ্ধতিটা একটু আলাদা আলাদা। উপকরণও তাই আলাদা হবেই। ঝাল-ঝোল-ঘন্ট কী ডাল তো, একই বস্তু দিয়ে রান্না হয় না!

মড়ার পিসি কালীকে ডাকতে গেলে, মড়াকেই লাগে। অন্য কেউ পিসি বলে ডাকলে, কালী থোড়াই সেদিকে তাকাবে? মড়াকে দিয়ে ডাকার নাম তাই, শাস্ত্রে

বলে—শবসাধনা (মড়া নিয়ে সাধনা)। আর মড়ার মাংস মালের সাথে, টুপুস করে চ্যাং-মাছের মত গিলে ফেললে—শরীরটাকে ছেড়ে দিয়ে খানিকটা ইংল্যান্ড, রাশিয়া বা আমেরিকায় ঘুরে আসা যায়, বিনা পয়সায় দু' মিনিটে, পাশপোর্ট ভিসা কার্ড করাতে হয় না ঘুস দিয়ে। এই বিদ্যের নাম আর চেহারা হলো—প্রাকাম্য!

প্রাচীন অশ্বত্থের গোড়া ঘিরে, বাঁধানো বেদী। গাছের গোড়ার চার পাশে গাছে, হেলান দিয়ে রাখা আছে, হাতের পায়ের হাড় শতশত বছর ধরে। যে জানে সে নামিয়ে আনতে পারে ও'তে, বিদেহী আত্মাদের। তখন শুরু হয় মজার মজার খেলা। বেশ জম্পেশ করে বসে গিরিকা বললো, "বাবা, ঋষি অষ্টাবক্র কেন এখানে এসেছিল, বলবে সে কথা? মহাভারতের সেই কাহিনী আজ শুনবো, মহাঋষি অঘোরীবাবার সমাধির পাশে বসে। এত রোদে এখন যাবই বা কোথায়? গল্পে গল্পে বিকেল হলে, তখন আবার চলতে শুরু করবো।"

কুড়ানো কন্যার আবদার, রাখতেই হবে। মনে মনে ছেঁকে নিলাম বহুদিন আগে পড়া ঘটনাকে। উঠিয়ে নিলাম সে কাহিনী মহাভারতের জীর্ণ প্রাচীন পৃষ্ঠা থেকে। রূপ দিতে হবে তার, আজকের মননে আর আলোকে।

আলোর পিয়াসী এই কহোড় পুত্র, খুঁজতে এসেছিল এই বক্রেশ্বরে, বিষ্ণু-চক্রছিন্ন সতী ঈশানীর মনকে। বহু যুগের যন্ত্রণার পাঁক হাঁটকে, সে কুড়াতে পেরেছিল, দুর্গার শিলায়িত মনকে। তারপর একদিন রওনা দিয়েছিল কামাখ্যার পথে। আয় আজ তোরা, শোন সে কাহিনী।

মহাভারতের **বনপর্ব** আর **অনুশাসন** পর্ব থেকে, বেছে বেছে শোনালাম তাদের সব কাহিনী। কেনইবা সেই ঋষি বক্র এখানে এসে, ওই বক্রেশ্বর শিব আর ঈশানীকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সবাই খুশী হলেও, খুশী হয়নি পাগলা গোপাল। আপেল-আঙ্গুর যার পছন্দ নয়—সে তো খুঁজবে কচু কি ঘেঁচু! শুয়োরে যেমন কচু চেনে, গোপাল ভাঁড় যেমন শালুক চেনে, গোপাল তেমনি চিনে নিয়েছে—রঘুপতি রামকে। সে কথা সে চায় শুনতে আমার কাছে!

মাথার উপরে ঝুলে আছে, কুশী ভর্ত্তি আমের ডাল। আমের দানাগুলো একটু একটু করে বড় হচ্ছে। উপরে তাকাতেই জিভে জল এলো। এ' সময় ঘরে থাকলে, গিন্নী বানাতো আমের চাটনি। ওই আমের কুশীগুলোকে শিলে থেঁতো করে, কটকটে কাঁচা লংকা আর নুন, কাঁচা সরসের তেল দিয়ে মেখে পাতে দিতো। তাইই টাখ্না মেরে, মেরে দিতাম, থালাভর্ত্তি ভাত। সেতো আর হ'লো না!

মনের ইচ্ছা মনেই মরে গেলো। সরে গেল অন্য খাতে সেই চিন্তাটা, গোপালের কেরামতীতে। সে বলে বসলো—আম্ম্য আম-কথা শুনবো বটে! ত্যু মুক্যে আম-কথা

শুনাই গে ক্যানে সাড়ুবাবা! ই ম্যুর পেরাণটায় উ কথা ছুটছ্যাক্ গ'।

আমের কথা আবার কী হতে পারে! আম—আমই। তার আবার কথা কী? শালা, আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়লাম তো! গিরিকা একবার মুখের পানে তাকালো আমার। গোপালকে সে দেখে নিল ট্যারা চোখে। তারপর মুখে কাপড় চাপা দিয়ে বসে রইল, কোনকিছু না বলে। মাথায় কোন কিছু ঢুকছে না আমার। ফ্যাল ফ্যাল করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বুঝতে চেষ্টা করলাম—সে কী বলতে চায়!

—— দশলথ পুত্ত আম্ গো! তার কথা ত্যু বল্ ক্যানে! ত্যুর কতা ভাল হছেঞ গ'। ত্যু মনিস্যিটো ভাল বলিস্ বটে—সিনামার পারা লাগে গ'। সিউরির সিনামা হলে ম্যুকে দেখাইঞ ছিল গ', সি ম্যুর শিষ্য ননীচোরা। সি-ও ভাল মনিস্যি বটেক। মউয়া খেয়্যাঁ দেক্ছি গ' সিদিন।

এবারে ভাঙ্গল ভ্রান্তি। সিউড়ির সিনেমা-হলে সে যে রামায়ণের ফিল্ম দেখেছিল, তাতে তার আশ মিটেনি। তাই সে শুনতে চায় **"রাম-কথা"**, আম-কথা নয়! বুঝতে ভুল করেছি আমরাই! গিরিকা-গিরিজারও ভুল ভেঙ্গেছে। সোৎসাহে তারাও জাপটে ধরলো আমাকে। বলতে হবে ওদেরকে রাম-কথা।

নতুন করে বলতে হবে, নতুন ভাবনায়। তাই বললাম—তোরা তো জানিস সব। যেটা তোরা জানিস না, সেটাই তবে তোদের বলি আজ। বাল্মিকীর তপোবনে সীতার সেই নির্বাসন আর লব-কুশের কথা। আমি আমার মত করে বলছি। দেখ্তো, আমার কথা তোদের সেই সিউড়ির সিনেমা হলে নিয়ে গিয়ে, ফেলতে পারে কিনা!

সামনে এসে দাঁড়ালো এক দেহাতী লোক। মুখ থেকে আনন্দে যেন তার, আলো ছিটকে বেরুচ্ছে। কেন যে সেই আলো, ব্যাপারটায় আলো না ফেললে, মালুম হবে না। কাঁধে তার দশাশই এক মাটির কলসী। হয়তো টিউবওয়েল থেকে, জল ভরে নিয়ে বাড়ী ফিরছে। হা-ঈশ্বর! সে এনেছে কলসী ভর্ত্তি মহুয়া, সাধুদেরকে বেচবে বলে।

চার-চারটে মূর্ত্তিমান, আজব সাধুকে একসাথে দেখে, মুখে তার উজ্জ্বল আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে। তার ওই মালের সদ্গতির জন্য, আমাদের মত মালকে, তার খুবই দরকার! আর তা' সে পেয়েও গেছে, বক্রেশ্বরের বারান্দার গোড়ায়। একী চাট্টিখানি ভাগ্য! হাতের চেটোয় ঘাম মুছে, সে বলল ঃ-

—— পাঁচ ট্যাকা সের ল্যুব গ'। মহামান্সোর ভিয়েন দিছি গ'। ভাল লাগবেক্ বটে। সাগ্গ থিক্যা ভগবান্ চড়চড় কোরাঞ লাম্বেক বটে। এক ঘটি কর‍্যাঞ লাও ক্যানে। খাও ক্যানে সরবৎটো! সাধনে ব্যসে যাও ক্যানে।

বুঝিনি তার কথা অত তলিয়ে। অনেকক্ষণ গল্প করার দরুন, গলাটাও শুকিয়ে উঠেছে। অপ্রত্যাশিত এই লোকটার উপস্থিতিকে মনে হ'লো—-গঙ্গা যেন ঘরের দুয়ারে

দাঁড়িয়ে। না চাইতেই সে হাজির। পকেট হাতড়ে দেখলাম, বেশ কিছু টাকা সেখানে, খসর খসর করছে। বললাম—দু' ঘটি করেই দাও। আট ঘটি হবে তো? কম পড়বে না তো? দেখ, নেশাটা যেন চটকে দিও না বাপ!"

—— হব্যেক বটে। মিছা কতা লয়-গো লাগর! দিশা মিটব্যাক, তিসা মিট্ব্যাক, লেশা জামব্যাক্—জবর সাদন হব্যেক। পেট্যের ভিত্যের গেলি, দশহাত ম্যেলব্যে গ' দশ্ভুজার পারা।"

মাল বিক্রী করতে গেলে, দোকানদারেরা অমন কত কথাই কয়। ঢক ঢক করে, মেরে দিলাম দু' ঘটি করে। গিরিকা-গিরিজা আর গুপালও খেলো। চল্লিশ টাকা তাকে দিয়ে, বিদেয় করতে গিয়ে শুধালাম— মহামান্সোর ভিয়েন মেরেছো বললে। তা' সে বস্তুটি কী বাপ? জটামাংসী ঘাসের মূল, নাকি অন্য কিছু? বস্তুটা বড়ই দামী আর দুষ্প্রাপ্যও বটে। বলেই ফ্যাল না ভাই, সেটা কি বস্তু? আমি কি আর তোমার ব্যবসার ক্ষতি করবো?

চোখ পিটপিট করে সে বললে— সাদু হঞ্ছি, মহামান্সো বুঝ লাই ক্যানে? সাধন ভজনে পাকে পরকারে লাগ্যে গ'। উ হোল্য গিয়া— মড়ার ঘিলু আর লক্ত, মেয়্যা মান্সের মাসিক, পুরুষ মান্সের বিজ্য, তালগুড়, বাবলার ছাল, লবং, আর ছিটেক ফেঁটাক নবন গ'। অষ্টধাতুর উপাদান কি না! সাধুবাবাদের ইস্পেশাল মউয়া কিনা!

ধীর পায়ে শিরা উপশিরা বেয়ে, তখন ছুটছে দুরন্ত নেশা। উপাদানের বহর শুনে, যুত করে জুতিয়ে তার মুখটা, ভেঙ্গে দিতে ইচ্ছে হ'লো। কাছে নাই কোন চিমটে কি ত্রিশূল। খালি কমণ্ডলুটাই আছে। সেটা ছুঁড়তে মন চাইলো না। পড়ে থাকা একটা অশ্বত্থ ডাল নিয়ে, ত্রিশূলের মত উঁচিয়ে তেড়ে গেলাম, মারতে তাকে। সাধুবাবা ক্ষেপে উঠছে দেখে কলসী ফেলে, কাঁছা খুলে সে দৌড়ালো প্রাণপণে। পেটের ভিতর যা' ঢুকে গেছে, তা' নিয়ে মাথা ব্যথা আমার নাই। নাই সম্ভবতঃ সাথী ওদেরও। টলছে গোপাল সাধু। নাচতে চাইছে যেন, তার ছোটখাটো পা দু'টো। রাম আর আম, দুটোই মনে হচ্ছে কেউ চটকাচ্ছে; তার পেটের ভেতর। হঠাৎ খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। পাশে বসে ঝিমোচ্ছে গিরিকা-গিরিজা। খপাৎ করে সে, টান মারলো গিরিজার হাত ধরে।

—— ত্যু লব্ হ' ক্যানে? ম্যু কুশ্ হছি গ'। সীত্যা মার পা-টো, জাঁপটে ধরবার লাগব্যাক। বাল্মিকী—ঈষিবাবা, ত্যু হঞ্যা যা ক্যানে সাদুবাবা। আম্যায়ণ গান হবেক ইখানে বক্রেশ্বরে। **কুথাকে গেলিরে শালো-রা, দেখেঞ যা ক্যানে যাত্তারা (যাত্রা)।**

চৈত্রের শেষের দিনগুলোতে, উঁকি মারে বৈশাখ। শেষ ড্রপসীন পড়লেই, উদয় হবে বৈশাখের। সাথে তার বৈরাগিনী বিশাখা, খমক-ঘুঙুর বাজিয়ে, তাল দেবে সে ঘূর্ণি হাওয়ায়। কড়কড় মড়মড় করে, নীল আকাশটাকে চিবুতে চিবুতে, শীৎকারে ফেটে পড়বে সে, লকলকে বিদ্যুতের জিহ্বা বের করে।

দারুণ দহন আর উদ্দাম রমন, দুটোই প্রকৃতিকে রাক্ষুসী বানায়। ঠা ঠা রোদ্দুরের এই আধা মরুভূমি বীরভূমের আকাশপানে তাকিয়ে, গোপাল যে— "কুখাকে গেলি রে শালো-রা"! বলে কা'কে হাঁক দিলো, সেইই তা' জানে।

মাঝে মাঝে ভাবি— এ' সেই, পাগলা গোপাল বটে? এর মাঝে লুকিয়ে নেই তো—মহাকালের ওপারের কেউ? সমীহও করি তাকে, গালি দিইও তাকে। সেও তেমনি ভালবাসে আমায়। শুয়ে পড়লো সে গিরিকার পায়ের উপর। নেশায় টইটম্বুর গিরিকাও, জাপটে ধরেছে বুকে গোপালকে, সন্তানহীনার অপ্রমেয় বাৎসল্যে।

সেই দৃশ্যের কালাতীত আকুতি, সঞ্চারিত হচ্ছে আমাতে আর গিরিজাতে। ভুলে গেলাম আমরা, আমাদের পরিচয়। নাটকের চরিত্র হয়ে উঠলাম—আমরা ধীরে ধীরে, খর বৈশাখের নিষ্কলুষ রৌদ্র-ছায়ায! নাটকের ডায়ালগ 'থ্রো' করবার পোজ নিয়ে, মূর্খ (?) সে আরম্ভ করলো— .....



গোপালের, গুরুগম্ভীর
অথচ তোৎলা-কথা,
সকলের কাছে শ্রুতি
মধুর হবে না বলে—
আমাদের কথ্য ভাষায়
লিখে দিলাম। বিচারের
ভার ছেড়ে দিলাম,
আপনাদের উপর।



<u>*প্রথম অধ্যায়*</u> :

রাম তাঁর নাম

দখিনা বাতাস, কৃষ্ণচূড়া আর বকুলকে আলতো করে নাড়িয়ে দিয়ে, ফিস্ ফিসিয়ে বললো, "ওই আসছে সে, জাগো-ও-ও, কাঁসর ঘণ্টা বাজাও-ও-ও।" অলস আবেশের ঘোর থেকে উঠে, কৃষ্ণচূড়া চোখ দলতে দলতে বলে—"কে আসছে? দখিনা যে বলে গেল—সে আসছে!"

বকুল ব্যাকুল হয়ে বললো, "আমিও তো শুনলাম, সে আসছে! আমার কোরকে এত মধুই বা কেন? উন্মন করা আমারই গন্ধভার, আমাকে যে পাগল করছে, অত সুগন্ধ তো আমার আগে ছিল না!"

ডানা ঝাপটে সে বিধবা ক্রৌঞ্চী বললো—"সে আসছে, আমার আর তবে কোন দুঃখ নাই, আমি তাঁর দেখা পাবোই। জানো সখা কৃষ্ণচূড়া, জানো সই বকুল—সে আসছে! বেণুবন-বেতসবীথি মাথা দুলিয়ে, শরীর হেলিয়ে বললো, "আমরাও তো শুনেছি সে সংবাদ—সে আসছে।"

কোয়েলিয়া বললো, " কে আসছে লা? খসম্ নাকি? মরে যাই! ও' ময়ূরী বল্‌না ক্যেনে? মাগী, তোর দেমাক্ সইতে পারি না—বলনা কে আসছে! ময়ূরীর ঠোঁটের থেকে, ঠোঁট সরিয়ে ময়ূর বললো,—সে আসছে! মেলে দিই না তবে আমার পেখম?"

চাতক	ঃ	"বলোনা, কে আসছে?" পরিচয়টাই বা কী তাদের?"
সপ্তপর্ণী	ঃ	"বলছি না, সে আসছে! দেখছো না, ভ্রমরী গান গাইছে গুনগুন্! ভ্রমরেরা বিবাগী, কেন না ভ্রমরী বুঝে ফেলেছে, "ওরও চেয়ে মনোহর আছে অন্য জনে! কেনই বা হবে লালায়িতা ওরা, ভ্রমর-গুঞ্জনে!" গুন্‌গুন কী অন্য কেউ গাইতে পারে না? গুঞ্জন গুনীজন বুঝে—সে কী তাইই?"
কদম্ব	ঃ	"কিন্তু কে সে? কেমন দেখতে তাকে, কী তার নাম? মাতৃপিতৃ পরিচয়? বলো বলোনা ভাই!"
যুথী	ঃ	"সে আসছে, সেটাইতো বড়ো। পরিচয়ে হবে কি কিছু লাভ?"
মল্লিকা	ঃ	"সে আসছে—সে-তো মিথ্যা নয়—সে যে পুণ্যময়, মহাভাগ!"

করবী ঃ "মহা কী অ-মহা, ভাগ আছে কী ভাগ নেই; ওই নিয়ে কেন মাথা ঘামাই? সে আসছে এ'টা সার-কথা। নাই কিচ্ছু করার আমার। কেউ যদি পাও কোন ব্যথা, শুনে এই মাত্রাহীন রূঢ় রূঢ় কথা—ব্যবহার! সে এলে, পাবে শুভ্রোজ্বল হাসি!"

চৈত্রের মেঘ ঃ সে আসে। আসে, ওই আসে—
ঘনায় মধ্যাহ্নকাল, আগামী বোশেখ
লিখবে না কোন কথা তাঁর,
নাই অভিষেক সত্যকার।
কেন মরি, পশ্চাতে ছুটে অযথার?"

সাধু বললো ঃ "পৃথিবী জড়িয়ে তার রাতুল চরণ—
মরে-যেতে চায়, তাই হয়েছে উন্মন।
কাল-বোশেখের মেঘ মেলে জটাভার,
'এখনো এলো না' বলে করে হাহাকার;
শষ্পকুমারী রেখে যাবে মৃদু চুম্বন—
ধন্য হবে—মুক্ত হবে, তাই উচাটন;
কদম্ব-কেয়ার কুঞ্জ মঞ্জীর বাজিয়ে—
আরতির পূর্ণ ডালা, রেখেছে সাজিয়ে!

চেয়ে দেখো নভো-পানে, ওরা ওই আসে—
প্রকৃতি খুলেছে বুক উল্লাসে উল্লাসে,
তার কাছে অবারিত সমস্ত সংশয়,
আসে বিশ্বপিতা। তাঁ'তে আছে বরাভয়;
নাই শুধু সংশয়ের সীমাহীন বেড়া—
সব চরাচর করে অপূর্ব মহড়া!"

.........সোমানন্দ অবধূত

তমসা ঃ "হিল্লোলে হিল্লোলে আমি ধুয়ে দেবো, ওঁদের চরণ যুগল। আমি বুকে বয়ে বেড়াবো ওঁদের ছায়া, ধ্বংসের দিন পর্য্যন্ত। এ' আমার সান্ত্বনা হবে—"আমি দেখেছি ওঁদের—ধুয়ে দিয়েছি ওদের রাঙা চরণ-যুথ! সেই পুণ্যস্পর্শ-লোভে, আমি যে তাকিয়ে আছি!"

পক্ককেশ অশীতিপর পরমতপা মহাঋষি; বাম হাতে কণ্ডুয়ণ করে নিলেন তাঁর শ্বেতশ্মশ্রুভার। অবাক্ সে ডাগর ডাগর চোখের, দুই কুমারের মাথায় হাত রেখে বললেন—একদিন তমসা উত্তাল হলো। যুথী-মল্লিকা-করবী, কদম্ব-কেতকী-সপ্তপর্ণী, ঢেলে দিলো অকৃপণ শ্বেতশুভ্র হাসি, কৃষ্ণচূড়া রাঙিয়ে দিল চরণযুথ—বকুল ব্যাকুল হয়ে, ভরে দিল সুঘ্রাণে সমস্ত ধরণী!

তাঁর পদার্পণ হলো সেই ঋষি গৃহে। **গৌতমী, ঋষি জায়া** মেলে দিলো—সেই শতবর্ষ পূর্বের নিবিড় কালো চোখ! সমস্ত কুঞ্চিত তার কেশভার দিয়ে, মুছে দিল সে চরণযুথ—অশ্রু-প্রক্ষালিত করে, বহু যুগ পরে। প্রণতা সে ঋষিজায়া, তার **প্রস্তরীভুতা অবস্থাকে** বিদায় দিলো। কেয়ূরে-কঙ্কণে, নুপুরে-মঞ্জীরে, বেজে উঠলো শিঞ্জনী-কিঙ্কিণী।

বৃক্ষ শাখায় আপন কুলায় হ'তে নিম্নে তাকিয়ে, সে ক্রৌঞ্চী দেখলো নয়নাভিরাম এক দৃশ্য। প্রণতা গৌতমী দুই মহাবীরের পদসেবা করে—নিজেকে মেলে দিয়েছে নৃত্যের মাতাল ছন্দে। উড়ে আসতে পারছে না সে ক্রৌঞ্চী নীড় ছেড়ে, আবার না এসেও উপায় নাই তার। তা'কে যে আশীর্বাদ আদায় করে নিতে হবে, তাঁর কাছ থেকে। ডুক্‌রে কেঁদে উঠলো সে ক্রৌঞ্চী চরম অসহায়া হয়ে।

এক দিকে সন্তানেরা, এখনও যারা উড়তে শেখেনি—অন্য দিকে সে মহামানব, যাঁর শর্ত্তশূন্য আশীর্বাদ নিতে হবে তাকে, সন্তানের কল্যাণ কামনায়। পিতৃহীন শাবককুলের দিকে অসহায় হয়ে তাকিয়ে, সে বলে উঠলো—"হে বিশ্বপিতা, এদের পিতা নাই, তুমি তো বিশ্বপিতা, পিতা আমারও। তোমার এ' অসহায় দৌহিত্র আর দৌহিত্রীদের মংগল করো প্রভু।"

সে আর্ত্তি এক অসহায়া, অক্ষম জননীর। বিশ্বপিতার মনের তারে, তা যেন তুললো মৃদু কম্পন। বিগলিত অশ্রুভারাক্রান্তা, সে ক্রৌঞ্চীর ব্যথা যেন বুঝে ফেলেছেন, সে মহা ধনুর্ধর—মহান পিতা, মহাশক্তিমান! ছায়া ফেললেন তাই আপন কায়ার, অপাপবিদ্ধ ক্রৌঞ্চ শাবকদের চোখে।

চঞ্চুতে চঞ্চু মিলিয়ে, উদ্গারিত ভোজ্য গিলিয়ে দিতে দিতে, অবাক চক্ষুর জোড়ায় জোড়ায়, সে দেখতে পেলো শুধু **একজোড়া রক্তাভ পা। শরায়িত ধনু আর বরাভয় মুদ্রায়, এক অলক্তসিঞ্চিত হস্ত-তালু**। বার বার করে সে ক্রৌঞ্চী মিলিয়ে নিতে লাগলো—সন্তানের চোখের তারায় উজিয়ে ওঠা ছবি, আর নীচে দণ্ডায়মান সে

অমর্ত্ত্য মানবের জলজ্যান্ত রূপ। মিলে যাচ্ছে—হাঁ, মিলে যাচ্ছে যে সবই! কাঁদতে লাগলো সে অসহ্য সুখের যন্ত্রণায়!

১ম শাবক ঃ "আমি উড়ে গিয়ে, দেখে আসবো মা, সে কেমন দেখতে? কেমন তার হৃদয়?"

২য় শাবক ঃ "চল্ ভাই, বলি—আমাদের বাবা কোথায়? তোমার বাবা আছে, আমাদের কেন নাই? তুমিই কী আমার বাবাকে মেরেছো?"

৩য়া শাবকী ঃ "ভাই, ও'কথা বললে সে বুঝি উত্তর দেবে? সে তো মহাশক্তিমান! বরং আমি যাই, বলে আসি আমার বাবাকে পাঠিয়ে দাও আমাদের কাছে। মা-তো প্রতিদিন কাঁদে! আর যদি না পাঠাও, তবে তোমার বউও কাঁদবে, বাচ্চারাও কাঁদবে!"

ক্রৌঞ্চী ঃ "ছিঃ ছিঃ অমন কথা বলে না, সে যে বিশ্বপিতা, পিতা আমাদেরও। কষ্টতো শুধু আমাদের নয়—কষ্ট তাঁরই, কাঁদতে দাও তাঁকে। শক্তিমান বুক চাপড়ে কাঁদে না। সে কাঁদে আড়ালে আবডালে—লোকচক্ষুর অন্তরালে। তোমাদের বাবাকে সে সত্যিই হয়তো একদিন এনে দিতে পারবে!"

অত্যন্ত প্রত্যয়ের সুরে ক্রৌঞ্চীর মনের কথা, পড়ে নিলেন জগৎ-পিতা। কাঁদলেন চৈত্রের চিতাভস্ম উড়িয়ে, মেঘেদের সাথে সাথে, গৈরিক একাকী বোশেখের নর্ত্তনকে কেন্দ্র করে; আকাশে বাতাসে বাজছে—"আমি পিতা বিশ্বজগতের"!

ক্রৌঞ্চী কন্যা ঃ আমায় বাবা তোথায়? (আমার বাবা কোথায়?), দাও বাবাতে, মা তাঁদে (দাও বাবাকে, মা কাঁদে)। বাবা তই? আমায় বাবা তই? (বাবা কোথায়? আমার বাবা কই?) ভাই তল্, ধব্বো অকে, বাবা তোথায়? (ভাই চল্, ধরবো ওকে, বাবা কোথায়?)

বিশ্বপিতার হৃদয়ে আঘাত করেছে, সে ক্রুদ্ধা ক্রৌঞ্চীকন্যার নির্ভেজাল কান্না। তার রাগ, তার ফুঁসে ওঠাকে সম্মান দিতে, বিশ্বপিতা বিশ্বমাতা হয়ে, দু' বাহু বাড়িয়ে বলে দিলো—"মাগো, বাবা-তো সকলের, সব সময় থাকে না। বাবাকে তুমি অবশ্যই ভালবাসবে! মাগো, বাবা যেমন চাই, ছেলেওতো তেমন চাই! তোমার মায়ের চোখে দেখো না, ভোমার বাবাই উথলে উঠছে! আর আমিতো তোমার ছেলে। তুমি আমাকে দু'হাত দিয়ে জাপটে ধরে, চুম্বন দেবে না মা?"

অঙ্কুরোদমিত দুই ডানা ঝাপটে, সেই মহামানবকে তার কচি কচি বুকে ধরে, সে ক্রৌঞ্চী কন্যা বললো, "বয়্মাসী কয়বি না, কোকা। (বদ্মাসী করবি না, খোকা!) , মা তাঞ্চে— মা কাঁদছে!"

বিশ্বপিতার চোখেও জল। ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত দৌহিত্রীর, সে আদেশ তাকে পালন করতেই হবে। এনে দিতে হবে তার বাবাকে। যদি তাই হয়, তবে সে বিশ্বপিতাকে হ'তে হবে এক ক্রৌঞ্চ। রূপ বদল করে, শ্বশুরের জামাইতে উত্তরণ? কন্যার পদপ্রান্তে লুটে বললো, "মাগো, এ' কী কঠিন ব্যবস্থায় তুমি ফেললে মহামায়া; মা—আ—আ—আ—সামলাও তোমার কন্যাকে—আমি যে বড় অসহায়! ওর বাবাকে আমি ফিরিয়ে দিতে পারবো না, মহাকালের অধীন আমি। তবুও বলি মাগো—যদি সত্যিই তোমার কন্যা বলে, ওর বাবাকেই দরকার, তবে মাগো, বলো ওই মহারুদ্রইতো পারে তা' করতে। তাকে ধরতে বলো মা!"

ক্রৌঞ্চী বুঝাতে লাগলো আপন কন্যাকে। যা হয় না, কেন যে সে তা' চায়, তার উত্তর কী হবে—সেটা জানা নাই তার। বাবাকে চাই তার। বোবা দৃষ্টি মেলে নীচের দিকে তাকিয়ে থাকে সে নীড় থেকে। উড়ে এল একপাল পতঙ্গ নীড়ের কাছে, ওদের ঠুকরে ঠুকরে খেতে খেতে, ভুলে গেল ওরা পিতা হারানোর কথা, আর পিতা না থাকার ব্যথা। ক্রৌঞ্চী শুধু একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো, ডানা দিয়ে আড়াল করে শাবকদেরকে।"

লব বলে উঠলো, "তারপর কি হলো মাতামহ? ওদের বাবাকে কী ফিরিয়ে দিত পেরেছিল সে লোকটা? ওদের মা কী তখনও কাঁদতো?

—— না, ফিরিয়ে দিতে পারেনি সে ধনুর্ধর—ওই ক্রৌঞ্চ শাবকদের পিতাকে। সে অসহায়। মৃত্যুর অধীন সবাই, ক্রৌঞ্চও ওই একই পথের পথিক। তা'কে তো ফিরিয়ে আনা যায় না। তবুও রাজা হ'য়ে, প্রজার ব্যথা যে বুঝতে হয়। কেন তার রাজত্বে অমন অন্যায় হবে! রাজার দণ্ড কেন রক্ষা করতে পারেনি, অসহায় প্রজাকে—সে প্রশ্ন বার বার বিব্রত করেছে রাজাকে! শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলেন সে রাজা। বুঝে উঠতে পারেন না,। কী তাঁর কর্তব্য!

কুশ প্রশ্ন করে, "তবে তো, রাজা ভাল লোক! তাত, রাজার তো ভুল ছিল না!"

বোবা চাউনি চারিদিকে মেলে দিয়ে, ঋষি বললেন—"**রাজাকে হ'তে হয় সজাগ, অতন্দ্র, অনলস। চোখ দিয়ে সবাই দেখে, রাজা দেখে কান দিয়ে। আর তাই চরম সত্যটা, তার নজর এড়িয়ে যায়। ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে যে বা যা', তাকে বাঁচানো যায় না। বৎস, শুনছো যখন, শুনে যাও তাঁর কথা। রাজা সে, তবুও অসহায় সে। বুঝেও অবুঝ। আর সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী হয়েও, সে দেখতে পায়-তার সীমানার বেড়া। বড় নিরুপায় সে। বীর যখন কাঁদে, সে কান্না জগৎ শুনে না। অন্য কেউ কাঁদলে—সে যন্ত্রণাকে, বড় করে দেখতে পায়—এই মূর্খ জগৎ।**"

কোন্ অতীতে হারিয়ে গেছেন ঋষি। এমনি করে তিনিও সারা জীবন, মানুষের প্রাণ নিয়ে; রক্তের হোরি খেলায় মেতে উঠতেন। মরতো নিরাপরাধ মানুষ। হয়ে যেতো সর্বহারা তারা। সাজানো সংসারকে শ্মশান বানাতে, তাঁর এতটুকু দ্বিধা হতো না। বুকের ভেতর গুমরে উঠে, সেদিনের কথাগুলো—বোবা কান্না ধাক্কা মারে, বুকের পাঁজরের মধ্যে। ক্রৌঞ্চী কন্যার মতো কত কন্যা, কত স্ত্রী কত পুত্র অসহায় ভাবে আজও বলে উঠে—"ফিরিয়ে দাও ওকে—ফিরিয়ে দাও-ও-ও, না হ'লে তুমিও কাঁদবে আমাদের মত।"

বিন্দু বিন্দু জমে উঠে অশ্রু, ঋষির শীর্ণ চোখে। প্রলম্বিত রেখায় গণ্ডবাহিত হয়ে, চুম্বন করে পৃথিবীর মাটি। অবাক বিস্ময়ে লব আর কুশ দেখে, ঋষিও কাঁদছেন আপন মনে। এক অসহ্য বেদনা কুরে কুরে খায়, তাঁকে প্রতিটি নিমেষে।

—— "তাত, আপনার চোখে জল! আপনি কী, ক্রৌঞ্চ শিশুদের ব্যথায় দীর্ণ। ক্রৌঞ্চবধূর ব্যথা, আপনাকে এতটা উতলা করে!"

—— "বৎস, পিতৃহারা ক্রৌঞ্চশাবক আর ক্রৌঞ্চবধূকে যে, আমার আপন সন্তানের মত দেখতে হয়, দেখিও। ওদের ব্যথা বুকে বাজে, ওদের উল্লাসে আমারও বুক ভরে যায়। বৎস, আরও বড় হও, এখন বুঝবে না সব কথ। তবুও বলবো সব অবসর সময়ে। এখন সন্ধ্যা সমাগতা। দেখো, জগৎ পিতা অস্তমিত হচ্ছেন। এসো তমসাতীর্থের অঞ্জলি দিয়ে, প্রণাম করি তাঁকে। বিদায় জানাই তাঁকে।" আমার সাথে সাথে তোমরাও তাঁর চরণ বন্দনা করো।

পাশে এসে দাঁড়ালেন সীতা জনক দুহিতা। পশ্চিমাভিমুখী চার মুখ। আট হাতে চার অঞ্জলিতে পবিত্র তমসা-সলিল।

"ত্বং হি জগজ্জনকঃ।
জগতমিদম্ পরিবর্ত্তন্তে
তয়েঙ্গিতে। ত্বমাপ্নোষেস্মাকম্
প্রণামম্, দদাসেশীর্বাদম্ নঃ—
তবেচ্ছাভিঘাতানি প্রবহন্তি
প্রাণরূপেন। সপ্রাণেতি
অতঃ ভবাম বয়ম্।"

..........সোমানন্দ অবধূত

অনুবাদ ঃ (তোমার ইঙ্গিতে চলমান এ জগৎ, হে জগৎপিতা—তুমি আমাদের প্রণাম নাও। তোমার আশীর্বাদ আমরা ভিক্ষা করি। তোমার ইচ্ছাভিঘাত, বায়ু হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে আমাদের শরীরে, তাই বেঁচে আছি আমরা)।

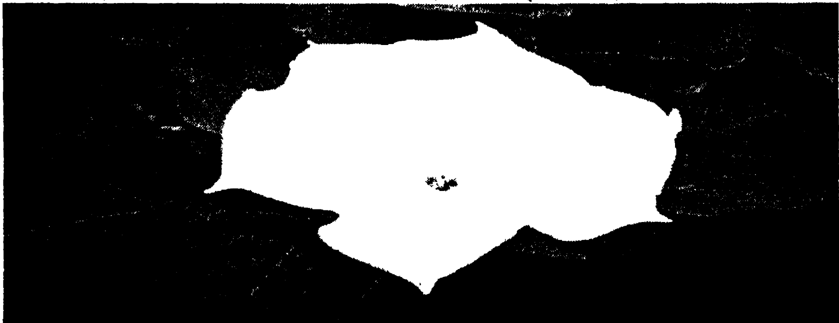
অঞ্জলি দিতে ভুলে গেল দুই কিশোর। বিভ্রান্ত হলো, অস্তগামী সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে। অঞ্জলিভরা জল ঢেলে দিল দুই কিশোর, ঋষির আর সীতার পায়ে। ঋষি আর জনক দুহিতা সীতা, অবাক চোখে তাকিয়ে দেখেন, বিহ্বল দুই কিশোরের চার চোখে —জড়িয়ে রয়েছে জমাট বিস্ময়।

মৃদু ভর্ৎসনা করলেন ঋষি তাদের। "কোন শুভ কর্মে লিপ্ত হয়ে, অমন করে চঞ্চল হতে নাই। কাজে চাই নিষ্ঠা। উত্তরণ তবেই তো আসে, পরিয়ে দিতে জয়ের উত্তরীয়। আজ হ'তে শপথ করো—অচঞ্চল হবে তোমরা, লক্ষ্যে—কর্মে আর বিদ্যাভ্যাসে। পরম পিতার সন্তান তোমরা। দিন দিন পরিলক্ষিত হচ্ছে তাঁর পরম পবিত্র ছায়া, তোমাদের মধ্যে।

দিন দিন বিন্দু বিন্দু অবহেলা, তোমাদেরকে মূর্খে পরিণত করবে, করে তুলবে অলস—কর্মবিমুখ। অবনমিত হবে তাঁর উঁচু মাথা। তা হবে লজ্জার। কোন এককের লজ্জা, লজ্জা নয় বৎস। সম্রাটের লজ্জা, সমগ্র ধরিত্রীর লজ্জা। প্রজার প্রীতি আর প্রণাম পাবে না। আড়ালে আবডালে পাবে উপহাস, আর অহৈতুকী ভয়াক্রান্ত মুখের সারি। কেন না—মূর্খ আর অকর্মাকে সবাই ভয় পায়।"

— আমাদের ক্ষমা করো, তাত। আমরা নিষ্ঠাহীন নই। কিন্তু— কিন্তু যাঁকে আমরা দেখলাম, ওই অস্তগামী ভগবান সূর্য্যের বুকে, দীপ্ত দৃপ্তভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকতে, কাঁধে ধনুর্বাণ নিয়ে; তিনি কে তাতঃ? পরম মমতায় তিনি তো আমাদেরকে ডাকলেন। বললেন, **"তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে, জগতের সুমহতী লীলায়িতা প্রজ্ঞা। মনুষ্যরূপী মহাতপা মহাঋষি বাল্মিকী, আর জগন্মাতা সীতা। আমাকে অঞ্জলি ভরে পবিত্র তমসাতীর্থ দিয়ে, প্রণাম করার প্রয়োজন নাই। বৎস, ওঁদের চরণ ধুইয়ে দাও, প্রণাম করো ওঁদেরকে। তবেই সম্পূর্ণ হবে, তোমাদের সন্ধ্যারতি।"**

ঘনায়মান বিস্ময়ে, তাকিয়ে থাকতে থাকতে—সে চার চোখের দিকে, মহাঋষি আর জনক-কন্যা দেখেন; টলটল করছে অশ্রুবিন্দু। আনত দুই শিশুর মুখ। অশ্রু বিন্দুর মুকুরে—ছলকে উঠছে সে ছবি, ধনুর্বাণ করধৃত—রঘুপতি রাম।



রাম তাঁর নাম

নত মুখ শিশুদের মৃদু তিরস্কার করে, মনোবেদনায় ভুগছেন মহাতপা ঋষি। যতই মৃদু হোক, শিশুমনে তার স্পর্শ হয় গভীর। সমস্ত জীবনটাকে দেখেছেন যিনি, ঘাত প্রতিঘাতের অর্থ বুঁঝেন যিনি, তাঁর হয়তো অন্য কোন পথ—বেছে নেওয়ার দরকার ছিল, যা' তিনি করেননি। ভুল যদি **তিনিই করতে পারেন**, তবে ওই কিশোরেরা **কেন করবে** না!

এমত চিন্তা তাঁকে, পীড়ন করতে লাগলো। নতমুখী সীতা, সন্তানের বালখিল্যতায় লজ্জিতা। মহাঋষির উষ্মার কারণ, তাঁর শিশুরা। বিশাল বনস্পতির মত যিনি, ছায়া দিয়ে রেখেছেন—সেই পিতৃরূপম (father like) মানুষটাকে, বিব্রত লাগছে—এ' রূপ, জনক দুহিতা কখনো দেখেননি বা অনুভবও করেননি। তাই নতমুখী সীতা বললেন :-

—— "তাত, ওদের ক্ষমা করুন! ওরা শিশু, অপরিপক্ক ওদের মন, আর জুগুপ্সা। আপনার অন্তরে ব্যথা দিয়ে থাকবে ওরা, সে তো আমিও পূর্ব হ'তে বুঝতে পারিনি। ওদের হয়ে, আমি ক্ষমা চাইছি—তাত। ত্রিকালজ্ঞ বহুদর্শী আপনি, ওদের নিজগুণে ক্ষমা করুন, তাত।"

ছলছল চোখে সীতার শিরঃচুম্বন করে, ঋষি বললেন, "মা, দুঃখ কী ব্যথা আমি পাইনি এতটুকুও, ওদের ব্যবহারে কী অর্বাচীন কার্য্যকারণে। শিশু ওরা, অনভিজ্ঞ ওরা। হাজারো প্রশ্ন উজিয়ে থাকবেই, ওদের মুখে। চোখে ওদের জানবার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা। সে উত্তর, সে ক্ষুধা মেটাতে তো, আমাকে-তোমাকেই হবে। আমার লজ্জা আর আমার কষ্ট অন্য। মাগো, আমিই বা কেন ভুল বুঝলাম। কেন আমি ওদের দেখাকে, মর্য্যাদা দিলাম না? দোষী ওরা নয়, আমিই দোষী। ধিক্ আমাকে! অকারণে ওই শিশুদেরকে আমি তিরস্কার করেছি।"

মুখ তুলে প্রশ্ন বিজড়িত চোখে তাকিয়ে আছেন সীতা। বুঝতে পারছেন না — ঋষি কী বলতে চাইছেন। নীরব চাউনি যেন সরব হতে চাইছে। ঋষি বললেন :-

—— "মা, ওই দুই তোমার আত্মজ, অবাক চোখে কা'কে দেখেছে, সেতো তুমি দেখেছ মা! অবাক হওয়াটা শিশুদের নিয়ম। অনেক কম-দেখা চোখ, অনেক অনেক বেশী বেশী দেখতে চাইবেই। আমরা যারা এই বাস্তবের মুখোমুখি হয়েছি, জন্মের পর থেকে এতগুলো বছর, মাগো—এই আমাদেরকেই বুঝে নিতে হয়, সে

ব্যাপারগুলো! আর বুঝিনি বলেই শিশুদের মনোজগতের মূল্য দিইনি বলেই— তিরস্কার করেছি ওদের; সেটাই চরম লজ্জার।

ওরা দেখেছে ওদের পিতাকে, তুমি দেখেছ তোমার স্বামীকে, ওই সূর্য্যের স্বর্ণ-থালায়। যে পিতাকে ওরা—কোনদিনও দেখলো না, যে স্বামীকে তুমি আজও একান্ত করে পেলে না, হঠাৎ তাঁকে দেখে কেউ যদি অবাক হয়ে; তার কাজ ভুলে যায়, তবে কী সে নিন্দার্হ হবে? এই বিচার শক্তি আমি ভুলে গেলে, সেটাতো ক্ষমার নয়।''

''তবে কেন মিছেমিছে ওদের আমি দোষ দিয়েছি—কর্ত্তব্যের গাফিলতির জন্য! মাগো, দুঃখ আমার সেটাই। দোষী ওরা নয়, দোষী আমি। ব্যথা তাই যে—আমি কেন আজও সরল মনে, এই পৃথিবীর সব ঘটনাকে মেনে নিতে পারিনি! দোষী তুমিও নও। তোমার ব্যথা আমি বুঝি। শেষ কথা শুধু সময়ই বলতে পারে।''

বুকে জাপটে ধরলেন ঋষি; লব-কুশকে। বিহ্বল দুই শিশু, মাতামহের বুকে মুখ লুকিয়ে, উত্তাপ নিতে রইলো। তমসার ও'পারে ঘনাচ্ছে অন্ধকার। ধীরে ধীরে বেজে উঠছে, কাঁসর-ঘণ্টা সন্ধ্যারতির, ঋষিদের পর্ণকুটীরে কুটীরে। উচ্চ-গ্রামে উচ্চারিত হচ্ছে বেদমন্ত্র। সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে, সীতা বসলেন মহামুনির পদপ্রান্তে। মৌনতা আজ যেন ঘুচে গেছে, হৃদয় হয়েছে অনর্গল। দুই শিশুকে দু'পাশে বসিয়ে ঋষি বাল্মীকি বললেন :-

—বৎস, এ' জীবনে বহু কিছু দেখেছি আমি। বহু কিছু করেছিও, বাঁচতে আর বাঁচাতে গিয়ে। যুদ্ধ, পরিশ্রম, সংসার প্রতিপালন—সব কিছু করতে গিয়ে, আমি যা করেছি—আজ বুঝতে পেরেছি, তার সবটুকু ভুল। আমি শুনাবো সে সব কাহিনী। আর সেই হবে তোমাদের শিক্ষা প্রতিদিনের। শিখিয়ে দেবো কেমন করে ধনুর্বাণ ধরতে হয়, তরবারি কৃপাণ চালাতে হয় কেমন করে। রাজা হতে হবে, বীর হতে হবে তোমাদের। ভারতের রাজ্যভার একদিন, তোমাদেরই বইতে হবে। আর তার জন্য প্রয়োজন, সবিশেষ শিক্ষা। ধৈর্য্য, ত্যাগ আর তিতিক্ষা—এই তিন উপাদানে গড়তে হবে তোমাদের এই জীবনটাকে।

কুশ ঃ ''রাজার পুত্র না হ'লে, কেমন করে রাজা হবো—তাত। সৈন্য সামন্ত থাকবে, হাতি-ঘোড়া থাকবে, অর্থ-সম্পদ থাকবে—তবে তো রাজা হ'তে পারবো? কিছু নাই, বনের ফল খাই আমরা, থাকি পর্ণকুটীরে তোমার তপোবনে। রাজার অট্টালিকা নাই—কেমন হবে সে রাজা সাজা? হাস্যকর উদ্ভট হবে সে প্রচেষ্টা। বালখিল্যতা হবে না কি তা' তাত?''

লব ঃ ''তাতকে আবার উষ্মার মধ্যে কেন নিয়ে যাচ্ছ দাদা? ওঁর কথা শুনি আমরা বরং। **রাজাতো জন্মায় না মাতৃগর্ভ থেকে, জন্মায়**

এক শিশু। ক্ষমতা-ক্ষমা-বোধ-বুদ্ধি, দীপ্ত-দৃপ্ত-চেতনার স্ফুরণ ঘটলে, রাজলক্ষ্মীই তাকে বরণ করে নেয় 'রাজা' বলে। সেদিনের পাঠে তো আপনি—এই কথা বলেছিলেন না, তাতঃ?

—বৎস, তোমরা উভয়েই ঠিক। যুক্তির দিক থেকে, কেউই অবহেলার নও তোমরা। শুধু প্রশ্নকে নিয়ে নাড়াচাড়া করলে, সক্রিয় কোন কিছুই তৈরী হয় না। শুষ্ক আলোচনায় পর্যবসিত হয় তা'। আবার প্রশ্নই নিয়ে যায় এগিয়ে, যুগে যুগে উত্তরের খোঁজে। এমনি করে গড়িয়ে চলেছে, জগৎ সংসারের চক্রাবলী।

যে শিশু আজ সাপ বাঘ সিংহ দেখে ভয় পায়, সেইই একদিন অভ্রংলিহ ক্ষমতায় ওদেরই মাথাগুলো কেটে আনে। দেওয়ালে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখে সেই মাথাগুলোকে বীরত্বের স্মারক করে। সময়ই এক সময় বেছে নেয় সেই শিশুকে রাজা রূপে। আজকের দুর্বল ওই দু'হাত একদিন সবল হবে, আর ওই সবল হাতে বল যোগাতে, এগিয়ে আসবে লক্ষ লক্ষ হাত অবনত মস্তকে। সেভাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে।

কুশ যা' বলছে, সে কথাই বললাম আমি। লব যা' বলেছ, সেও সর্বৈব সত্য। অলস ভীরু কখনো রাজা হতে পারে না। সে মানবে না পদে পদে বন্ধন। নিষেধের হাজারো গণ্ডী, সে পেরিয়ে যাবে আপন বীর্য্যে। তবুও নিষেধের প্রতি থাকবে তার শ্রদ্ধা। কারণ নিষেধই, ভাল কী মন্দকে চিনিয়ে দেয়। কোথায় থামতে হবে, কতটা এগিয়ে যেতে হবে, নিষেধই বলে দেয় তা' কানে কানে। তাই নিষেধকে যেমন এড়িয়ে যেতে হয়, পরম শ্রদ্ধায় তাকে মানতেও হয় প্রয়োজনে।

শিশুই একদিন রাজা হয়। রাজা, শিশু হয়েই জন্মায় মাতৃগর্ভ থেকে। বৎস, আমি বোধ হয়—তোমাদেরকে বুঝাতে পেরেছি। আজ থেকে যা কিছু শুনবে, অনুধ্যান করবে তার—সাহায্য করবো আমি আর মা সীতা। এ' ভাবেই হোক শুরু, তোমাদের প্রতিদিনের পাঠ্যাভ্যাস।"

—— "তাত, প্রতিদিন ভূর্জপত্রে আপনি নির্জনে কী লিখে চলেন, আমাদের শুনতে খুব ইচ্ছা করে। ইচ্ছা করে পড়ে দেখি ও'গুলো। আপনার আর মায়ের অনুমতি ছাড়া তো, দেখতে বা পড়তে পারি না! আপনি আমাদের শুনাবেন সে গোপন কথা?"

—— বৎস, অতি উত্তম তোমাদের ইচ্ছা। আজ থেকে তবে—শুরু হোক সে কাহিনী। আমার সারা জীবন আমি, যা' শুনেছি-দেখেছি-করেছি—তার সব বিবরণ আমি লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছি, তোমাদের মত কোটি কোটি শিশু তা' একদিন পড়বে, জানবে এই ভারতবর্ষকে। আজ যে কাহিনী তোমাদের আমি শোনাবো, তা' হলো এক রাজার কাহিনী। কোন সাধারণ রাজা তিনি ছিলেন না!

দেবতাদের রাজা ইন্দ্রকে, সাত দিন বেঁধে রেখে দিয়েছিলেন তিনি, তাঁকে প্রচণ্ড এক যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে। বৎস, কেউ যদি কোন অধিকার, বিনা বাধায় ভোগ করে বহুকাল ধরে, আর তার সেই অধিকারে অন্য কেউ যদি, আপন ক্ষমতায় কী যোগ্যতায় ভাগ বসাতে চায়; স্বভাবতঃই ওই অধিকার ভোগী রুষ্ট হয়ে উঠে—তার স্বার্থে ঘা লাগার জন্য। সে কিন্তু বিচার করে না, যোগ্যতার। তার চেয়ে অন্য কেউ, বেশী যোগ্য হোক, এটা সে কোন মতেই চায় না। অধিকতর যোগ্যকে নির্বিবাদে আসন ছেড়ে দিতে, বিরাট একটা বুকের পাটা লাগে!

রাজা দিলীপের শ্রেষ্ঠত্বকে, মেনে নেন নি দেবরাজ ইন্দ্র। স্বর্গে এলে সর্ব প্রকার সুখ সুবিধার, অংশ নেবেন রাজা দিলীপ। তর্ক বিতর্কের অঢেল অবসর থাকবে সেখানে। দ্বন্দ্বের বীজ প্রোথিত হবে। তাই রাজা দিলীপের সব প্রচেষ্টায় বাধা দেবার চেষ্টা করলেন ইন্দ্র।

তাঁর অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়াগুলোকে চুরি করলেন তিনি। দেবতাদের রাজার যা উচিৎ কাজ নয়, তিনি তাই করে বসলেন। রাজার কাজ তস্করতা নয়, তস্করদের শাসন করা। শৌর্য্যে আর বীর্য্যে জিতে নিতে হয় সব কিছু তাঁকে। রাজা দিলীপের পুত্র ছিলেন রঘু। পিতার অশ্বের পরিচর্য্যা আর তার সুনিবিড় নিরাপত্তার দায়িত্ব ছিল, সেই রাজপুত্র রঘুর উপর। হাজার হাজার অশ্বের মধ্যে একটাকেও না পেয়ে, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন রঘু। সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত রাজকুমার কালান্তকের মত ফুঁসে উঠলেন।

বুঝে নিলেন, কে করেছেন এই কুকীর্ত্তি। হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে, ঝাঁপিয়ে পড়লেন রঘু ইন্দ্রের উপর। পরাজিত ও বন্দী হলেন নির্লজ্জ দেবরাজ। মহান রাজা দিলীপ মহানুভব ছিলেন। ভয়ের সঞ্চার হলো দেবতাদের মধ্যে। কেউ কেউ ভাবলো, তাকেও ধরে নিয়ে যাওয়া হতে পারে। তারা দৌড়ালো প্রজাপিতা ব্রহ্মার কাছে। চতুর ব্রহ্মা, দিলীপকে তোষণের পথ নিলেন। ব্রহ্মা সাধুর বেশে উপস্থিত হয়ে বললেন, "তোমার পুত্র রঘু অতুলনীয় বীর। এই বালক বয়সে, তার ক্ষমতা আমরা দেখেছি। সে নাম উজ্জ্বল করবে তোমার বংশের। তার নাম অনুসারেই, তোমার বংশের নাম হবে রঘুবংশ। ইন্দ্রের অনেক শিক্ষাই হয়েছে, এবার ওকে তোমরা ছেড়ে দাও।" তোমাদের মঙ্গল হোক রাজা।

যে মহানুভবতা দেবরাজ ইন্দ্র দেখাতে পারেন নি, সেই মহানুভবতা দেখিয়ে দিলেন, রাজা দিলীপ আর রঘু। ছেড়ে দিলেন দেবরাজ ইন্দ্রকে। চাটুকারিতায় ভুলে গেলেন ওঁরা। **রাজা যদি চাটুকারের বশ হয়— শনি সেখানে সুযোগ খুঁজে ঢুকবার। যে শোণিত স্রোতঃধারা জন্ম থেকে প্রজন্মে, প্রবাহিত হয় মানুষের শিরায় উপশিরায়, সেখানেই প্রতি অণু পরামাণুতে ঘুমিয়ে থাকে মহানুভবতা,.দয়া-মায়া-ক্ষমা, তস্করতা-মিথ্যাচার-দস্যুবৃত্তি। কালের কুটিল গতিতে তা' প্রকাশ পায়।**

বৎস, মহানুভবতার 'দুর্বলতা'র, সন্ধান জানে দেবতারা। তাই সেখানেই কণ্ডুয়ন করেছিলেন চতুর দেবতারা। জগৎ আর জীবনকে বুঝে নাও বৎস। সগোত্রের লোকেরা কখনও, একে অপরের দোষ দেখে না। ইন্দ্রকে ওঁরা বললেন না কিছুই। শুধু রাজা দিলীপকে উসকে দিয়েই, ইন্দ্রকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেলেন ওরা।

জীবনের এ' দিকটাও তোমাদেরকে পড়তে হবে, এই সমাজের পাতা উল্টে উল্টে। সমাজও একটা বই জানবে। ক্ষমা চাইলেই ক্ষমা পাওয়া যায় না। ক্ষমতাবান হলেই যে, ক্ষমা করতে হবে, তারও কোন সদর্থ হয় না। যে পাত্র ক্ষমা প্রার্থী হবে, দেখতে হবে সে ক্ষমার মর্য্যাদা দিতে জানে কিনা! না হলে ক্ষমা দেখানোটা হয়ে উঠে দুর্বলতার নামান্তর। জীবনের পথে চলতে গিয়ে, এমনিই বহু ঘটনার সম্মুখীন হতে হবে তোমাদের। জানবে, তুমিও ভুল করতে পারো।

বিচার করে জ্ঞানের আলোয় বুঝে নেবে সব কিছু। না হলে নিজেকেও তোমরা ক্ষমা করতে পারবে না। যে ক্ষমা অন্যকে দেখানো যায়, সে ক্ষমা নিজেকে দেখানোর মত, বুকের পাটা থাকতে হবে। রাত্রি গভীর হচ্ছে। শরীর ক্লান্ত তোমাদের। যা এখন শুনলে, অনুক্ষণ তার মনন করো বৎস। মননে মনের মুকুরে ভেসে উঠবে অনেক ছবি, চিনে নিতে হবে তোমাদেরকেই সঠিকটাকে। অনলস অভ্যাসে সব কিছুই সম্ভব হয়, এটা সত্য জেনো।

রাজাকে দানী হতে হয়, না হলে প্রজা মরে। যথাপাত্রে দান করতে হয়। উপযুক্ত পাত্র ছাড়া, কিম্বা সত্যিকারের প্রয়োজন ব্যতীত, দান রূপ নেয় এক গর্হিত কর্মের। দান তখন দান থাকে না, হয় দানব—যেন তা' মূর্খতার চলন্ত পিণ্ড। আরও ক্রুর দানব তৈরী করে তা'। এমনিই ঘটেছিল এক ঘটনা, বারান্তরে তোমরা শুনবে সে কাহিনী। যাও মার কাছে। তিনিও ক্লান্ত, শুভমস্তু। এসো প্রণাম করি সেই বিশ্ববিধাতাকে. যার ইংগিতে চলছে এই সমস্ত জীব জগৎ।"

প্রণামে নত হলেন সকলে। মহাঋষি বাল্মিকী আর সীতাও, প্রণাম করলেন যথারীতি। প্রণামের সমস্ত আঙ্গিক মেনে, প্রণাম করতে যেতেই, সময় লাগলো আরও অনেক বেশী। লব আর কুশ 'উড়ো-খই-গোবিন্দায় নমঃ' করে, প্রণাম করে দাঁড়িয়ে পড়লো; ওঁদের আগে। মহাঋষি আর সীতা প্রশ্ন করলেন :-

—— "এ' ভাবে তো প্রণাম করা যায় না! প্রণাম যদি করতেই হয়, তবে সর্বান্তঃ করণে—সেটা করা উচিৎ। দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দীর্ণ হয়ে নয়! কেন না, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মনটাকে দ্বিধা আর ত্রিধা বিভক্ত করে—আশু কোন প্রশ্নের সহজ সাবলীল মীমাংসা করে না। যদি তাইই হয়, তবে বলো পুত্র, কী সে প্রশ্ন, যা' তোমাদের বিরক্ত আর বিব্রত করেছে প্রণাম করতে? মিথ্যা প্রবঞ্চনা নয়—সত্যিই সঠিক উত্তর দেবো তোমাদেরকে।"

—— "একই প্রশ্ন আবারও বাজতে লাগলো, আমাদের মনে। যাঁকে আমরা জানলাম না, দেখলাম না, কী করে তাকে প্রণাম আর শ্রদ্ধা জানাবো! তাই,—প্রণাম করতে হয়, তাই করলাম। মাথা নোয়াতে হয়, তাই নোয়ালাম। হাতের কাছে আমরা পেয়েছি আপনাদের, দেখি আপনাদের, স্নেহ-ভালবাসা-অন্ন-আশ্রয়-শিক্ষা, পাই আপনাদের। ধীরে ধীরে নিজের প্রত্যয়ে বুঝতে পেরেছি, আপনারা আছেন; যা' প্রয়োজন তা' আসবে আপনাদের কাছ থেকে। এমনি করে গড়ে উঠেছে, আমাদের নিবিড় বন্ধন।"

"এই জগৎ সংসারের প্রভু যিনি, তাঁকে তো দেখতে পাই না, বুঝতে পারি না, শ্রদ্ধা-প্রণাম তাই গভীর হয় না। আপনারাই তো বলেছেন, 'বুদ্ধির আলোকে সব কিছুরই বিচার করবে, বুঝে নেবে!' তাই বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে গিয়ে, পদে পদে শৈথিল্য, মনের গভীরে বাসা বাঁধে, অবিশ্বাস তাচ্ছিল্যকে উসকে দেয়। এখানে আমরা হয়ে যাই—অর্বাচীন আপনাদের কাছে।"

মহাঋষি বাল্মিকী নতমুখ কিশোরদের মাথায়, আদরের হাত রেখে বললেন—ঠিকই তো বলেছি আমরা। জীবনের যা' পথ, সত্য যা' কিছু, তাকে জ্ঞানের আলোতেই যুক্তির আলোতেই বুঝতে হবে। প্রশ্নের উপরে জ্ঞানসূর্য্যের মতো, আলো ফেলে দেখবে, তার আসল রূপ বেরিয়ে আসছে। শ্রদ্ধা কেন করবো—এ' প্রশ্ন যদি জাগে, তবে তো এ' প্রশ্নও জাগা উচিৎ, অশ্রদ্ধাই বা করবো কেন? তা' না হলে শ্রদ্ধেয় যা, তা' হবে অশ্রদ্ধায়, অবিশ্বাসে পংকিল।

এমনি করে পুঙ্খাণুপুঙ্খ ভাবে ঈশ্বরকে বুঝতে বুঝতে, তার রূপ-রস-গন্ধ, সব কিছুরই সন্ধান মেলে। তুমি আমি বুঝতে পারিনি, তাব মানে কী এই যে, তাঁকে অশ্রদ্ধা করতে হবে? আজ তোমরা যতটুকু আমাদের বুঝেছ, আর আমরাও তোমাদের বুঝেছি, এই সান্নিধ্যের সামনে কোন আড়াল থাকলে; বুঝতে পারতে না আমাদের।

তোমাদের মনে হয়—হচ্ছেও, যে ঈশ্বর বলে কেউ নাই। হ'তেই পারে এ' ভাবনা। এ' পথে প্রথম হাঁটুরেরা হোঁচট খায়, ধাক্কা খায়। অথচ সত্য হলো, সত্যিই ঈশ্বর আছেন। তাঁকে অনুভব করতে হয়, দেখাও মেলে তাঁর। তোমাদের আমাদের মত তিনিও হাসেন কাঁদেন, খান-ঘুমোন সব কিছুই করেন। সেটা আমি আর মা-সীতা জানি. শুধু জানো না তোমরা। তাই অবিশ্বাস আর অশ্রদ্ধা পেয়ে বসেছে তোমাদের।

কিন্তু দেখো, মাথা নত হয় আমাদের যেখানে—তাঁর প্রতি বিশ্বাস আর শ্রদ্ধায়, সেখানেই—এ' প্রশ্ন কেন উঠে তোমাদের মনে? কেন মনে হয় :-

"কোথা সে ঈশ্বর? বন্ধু, কী তার স্বরূপ?
লোকে কয় অরূপ সে, ফের্ অপরূপ।

দু'চাখের আগে, তা'কে দেখিনি কখনো,
কালো কিম্বা গোরা, কিম্বা সোজা কী বাঁকানো,
ক্রুর-ছল্-অকপট, কপটী সে জন,
বন্ধু-অবন্ধু কিম্বা—সে আরক্ত নয়ন?
শুনি নাকী ধাতা হয়ে হয় অনিকেত,
'কাল' হয়ে ধ্বংস করে—কাঁদে অবিরত,

জগতের দুঃখ কী ব্যথায়! বিষম সে
জন। সমস্ত জগৎ যা'তে পরকাশে,
থাকে সে আশ্রয় করে' সকলের মন?
তা'কে নাকি পেতে পারো করিলে চিন্তন—
কেন-না 'চিন্তামণি' হয় তারই নাম।
মূর্খ তো, বুঝি না মোরা, তাই বিধি বাম!!"

...... সোমানন্দ অবধূত।

"বৎস, অনেক অর্বাচীন প্রশ্ন, আকুল ব্যাকুল করবে তোমাদেরকে। আর সেটা তা' করলো বলে, তুমি কী প্রাচীন-প্রাচীনাদের কথা, আর তাদের পরম অনুভবের মূল্য দেবে না? 'প্রাচীন' এই কথাটার মধ্যেই তো—লুকিয়ে আছে, পুরাকালের ঋষি আর মহাঋষিদের কথা। প্রকৃষ্টভাবে অচিন জগৎটাকে, ওঁরা বুঝে ফেলেছেন! তাই ওঁরা প্রাচীন। ওঁদের দেখা-বুঝার মূল্য তোমরা কেন দেবে না? ওরা কী মিথ্যাবাদী, তোমাদের কাছে? তবেতো আমি কী সীতা-মাও মিথ্যাবাদী?

যে বিশ্বাসে মেনে নাও আমাদেরকে, সে বিশ্বাসে কেন মানো না, মহাজ্ঞানী মহাজনদের? কারণ কী এই যে, আমাদের মত ওঁরা তোমাদের সাথে কথা বলেন না বলে? তাঁদের কথা শুনতে গেলে, আপন করে তাঁদের পেতে গেলে, তাঁদের সেই বৃত্তে তো তোমাদের যেতেই হবে!

আপন বৃত্তের বাইরে, ওঁরা হাঁটেন না কখনও। অর্বাচীনদের মত, স্ফুলিঙ্গের মত, ওঁদের পাখায় কখনও বালখিল্যতা 'ক্ষণকালের ছন্দ' জাগায় না। আর তাই 'উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল'—এরূপ আনন্দও তাঁরা আস্বাদন করেন না!"

মহাঋষি নারদের কথা তোমাদের বলছি। তাঁর সব কথা—সব অনুভব লিপিবদ্ধ করেছেন মহাতপা ঋষি। বলো বৎস, অবিশ্বাস করবে তাঁকে? অবিশ্বাস করা বড় সহজ—বিশ্বাস করা বড় কঠিন। কেননা **"জ্ঞান গাঢ় হইতে গাঢ়তর অন্ধকারে**

লইয়া যায়!" অস্বীকার-অসমীহ-অবিশ্বাস করতে কোন কষ্ট নাই—কিন্তু বিশ্বাস করতে গেলে, নিজেকে বড্ড রিক্ত করে ফেলতে হয়, অপেক্ষা করতে হয়, সেই রিক্ততা পূরণের জন্য। আর মহাজ্ঞানীরাই সে ফাঁকটা বুজিয়ে দিতে পারেন। স্বয়ং নারায়ণের 'পার্শ্বচর' আর ব্রহ্মর্ষি, হলেন নারদ। এসো আমরা দেখি সেই বিশ্বপিতা নারায়ণের ব্যাপারে তিনি কী বলছেন ঃ

সর্বদেবময়ো বিষ্ণুঃস্মরতামার্ত্তিনাশনঃ।
স ভক্তবৎসলো দেবো ভক্ত্যা তুষ্যতি নান্যথা।।৫০।।
অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে বা স্তুতেহপি চ।
বিমুক্তপাতক সোহপি পরমং পদমশ্নুতে।।৫১।।
সংসার ঘোরকান্তারঃ দাবাগ্নিমধুসূদনঃ।
স্মৃতানাং সর্ব পাপানি নাশয়ত্যাশু সত্তমাঃ।।৫২।।
তদর্পকমিদং পুণ্য পুরানম্ শ্রাব্যমুত্তমম্।
শ্রবনাৎ পঠনাদ্বাপি সর্বপাপ বিনাশকৃৎ।।৫৩।।

............নারদীয় পুরাণম (মহামুনি ব্যাস)/১ম অধ্যায়

সরলার্থ ঃ— (সব দেবতার সমাহার যে বিষ্ণু, তিনি কামনার ক্লেদকে সরিয়ে দেন, বা কামপীড়া বিনাশক। সেই বিষ্ণু প্রীত হ'ন শুধু ভক্তির দ্বারা, তিনি ভক্তকে ভালবাসেন—ভক্তবৎসল। অন্য কোন রাস্তা সুগম নয়, তাঁকে পেতে। অভক্তি অবিশ্বাস আর অরুচি নিয়েও যদি তাঁর নাম করো, তবে তাঁর ওই পরমপদ পেতে, কী মুক্তি পেতে কোন কষ্ট হয় না। মধুসূদন বা স্বয়ং নারায়ণ কী বিষ্ণু, সংসারের ঘোরতর অগ্নিশিখার মত যন্ত্রণারও, প্রশমন করতে পারেন নিমেষে। তাঁকে পেতে গেলে, তাঁর কাহিনী শুনতে হয় আর পড়তে হয়। সমস্ত পাপ দূরে পালায়। (শুধু তাঁ'তে শর্ত্তহীন বিশ্বাস কী অবিশ্বাস চাই, সেখানে তিনি বড্ড কঠোর।)..........(আমার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ)

—— "তোমাদের মাতামহ-মাতামহী, পিতামহ-পিতামহী—ওঁদেরকে তোমরা দেখনি। **পাওনি ওঁদের সান্নিধ্য আর স্নেহ। আজ যদি আমি, কী মা বলেন— ওঁরা এই এই ছিলেন, তবে কী অবিশ্বাস করবে তোমরা? নাকি এ' প্রশ্ন তোমাদের মনে উঠবে যে, ওঁরা আদৌ কোন কালে ছিলেন না? তর্কের অভিপ্রায়ে যদি ধরেই নিই যে, ওঁরা ছিলেন না, ওঁদের কাহিনী কপোল-কল্পনা, তবে মায়ের অস্তিত্ব আসে কী করে? আজ তোমরা দুই ভাই আমার কাছে বসে, শুনছো অনেক কথা, কিন্তু কী করে এলে তোমরা? অবশ্যই এসেছো মায়ের গর্ভ থেকে। আমি, কী মাও—তাই।**

জন্মের ভিত্তিভূমি হ'ল গর্ভগৃহ, জীবের সৃষ্টির এক রসায়নাগার। সেখানে দু'জনের প্রয়োজন—জনক আর জননীর, তবেই রূপ পায় বিশ্ব চরাচর। আর সে

সৃষ্টির রসায়ন, তোমরা জানো না বলে, উপহাস অবিশ্বাস করবে? বৎস, তা' শুধু বালখিল্যতা হবে। সবকিছু হতে সময় লাগে—কোন কিছুই আকাশ ফুঁড়ে হয় না। সময়ই শেষ কথা বলে। তোমাদের অপেক্ষা করতে হবে, অনেকটা সময়। ধীরে ধীরে প্রকাশ পাবে সব। আজ যে ফুলটাকে দেখছো, সেটা লুকিয়ে ছিল কাণ্ডের ভিতর।

সময় তাকে ডাক দিয়েছে, লোকচক্ষুর সামনে বেরিয়ে আসতে। তাই ওই ফুল একদিন কলির রূপ নিয়ে, উঁকি দিয়েছে পর্ব হতে পর্বান্তরে। ওগুলো একদিন ঝরে পড়বে—আবার উঁকি দেবে আর এক বিস্ময়, তার নাম ফল। অতি ক্ষুদ্র সেটা লুকিয়ে ছিল ওই কোরকেরই ভেতর, সময় তাকে প্রকাশ করছে, ধীরে ধীরে নানারূপে, নানা স্বাদে-গন্ধে। পেটের ক্ষুধা মিটায় ফল, আর ফুল মিটায় মনের ক্ষুধা!"

—— "তাত, কে আমাদের মাতামহ-মাতামহী, পিতামহ—পিতামহী, আর পিতাই বা কে? আমরা তাঁদের দেখতে পাইনি কেন? কেন তাঁরা আসেন না? বনেই বা কেন আছি আমরা—কেন নয় লোকালয়ে?"

—— "বৎস, অনেক উত্তর আমার দেবার থাকলেও, অধিকারী নই বলেই—সে উত্তর দেবো না আমি। প্রত্যেকের বলার, বুঝার, উত্তর দেওয়া কী নেওয়ার—সীমারেখা আছে। তাকে অতিক্রম করতে নাই। আমি যতটুকু জানি, সে অধিকার মায়েরই আছে—তিনিই প্রয়োজন-বোধে উত্তর দেবেন—যতটুকু তোমাদের পাওয়া দরকার, ঠিক ততটুকুই। তার বেশী এতটুকুও নয়!"

চারখানা চোখে ভেসে উঠে, প্রশ্নের আর জানার বিস্ময়ভরা আকুতি। চরম প্রশান্ত মুখ, বিগলিত করুণায় আর্দ্র হলেও, কাঠিন্য বজায় রেখেই সীতা বললেন— **"এখনওতো হয়নি সময়, সে সকল জানবার? কোন কিছুকে জানতে গেলে, প্রশ্নকে ধরে ছুটতে হয় উজানে—গোড়ার দিকে, মূলের দিকে! আর তা' খুঁজে নিতে হয় নিজেকেই। আমরা জ্যেষ্ঠেরা শুধু, ইংগিত দিতে পারি। তোমরা অতি ক্ষুদ্র এখন, বুঝবে না সব কিছু—তাই অপেক্ষা করতে হবে সময়ের জন্য।**

উজানে কী ভাঁটিতে যে দিকেই যাওনা কেন, গোড়ায় কী প্রান্তরেখায় না গেলে, কোন কিছুরই সন্ধান মেলে না। তোমাদের মতো অনুসন্ধিৎসা, সব শিশুরই মধ্যে থাকে। সব বুঝতে গেলে, যৌবন-প্রৌঢ়ত্ব-বার্দ্ধক্যের দিনগুলোর জন্য, অপেক্ষা করতে হবে। পদে পদে অভিজ্ঞ হ'তে হ'তে, এগিয়ে যাবো আমরা সবাই মৃত্যুর দিকে। সেও হবে অন্য রকম এক নিবিড় অভিজ্ঞতা!

তোমাদের পিতা কে? সে কথা বলতে পারি একমাত্র আমি। আমি জানি বলেই, এখনই তা' বলে ফেলতে হবে, এমন কথা কোথাও কেউ লিখে যাননি। সূর্য্য-চন্দ্র উঠে আর অস্ত যায়, কিন্তু বৎস—আমি যদি বলি, 'এখনই উঠো, কী অস্ত যাও', তবে কি তা' সম্ভব হবে? নাকি সূর্য্য-চন্দ্র আমার কথা শুনে ডুববে আর উঠবে? তোমাদেরও

সেই একই ব্যাপার, জানবো বললেই জানা যায় না। এখন জানলে, যে প্রশ্নগুলো তোমাদের মনে নিরন্তর জাগবে, তার নাম তরল ভাবালুতা, প্রজ্ঞার আলো দিয়ে তা' বিধৌত নয়। শুধু আবছা আবছা এক কল্পগল্প মাত্র।"

"যে নদী বয়ে চলেছে, উজিয়ে গেলে দেখতে পাবে তার উৎসভূমি। আর ভাঁটিতে গেলে পাবে তার সঙ্গমভূমি। হাঁটতে হবে উভয়দিকেই। কষ্ট দুঃখ পোয়াতে পোয়াতে—জগৎটাকে বুঝতে বুঝতে, এগিয়ে যেতে হবে—ভরে উঠবে অভিজ্ঞতার ঝুলি। আর সেই অভিজ্ঞতার আলোকে, বুঝতে পারবে সঠিক আর বেঠিককে।

এখন সবটাই তোমাদের কাছে মনে হবে সঠিক অথবা বেঠিক। তাই অপেক্ষার প্রয়োজন আছে। মাতা-পিতাকে জানবার অধিকার, সব পুত্র কন্যারই আছে, আর মাই-ই তা' জানিয়ে দেন সন্তানদের। আমিও জানাবো তোমাদের, কিন্তু এখনই নয়! এসো, আমি তোমাদের ঘুম পাড়িয়ে দিই।"

কোলে শুয়ে উস্‌খুস্ করতে লাগলো কুশ আর লব। বালকের শত জিজ্ঞাসার উত্তর, তাদের মনঃপুত না হ'লে ফুঁসতে থাকে। ওরা মনে করে, কোথাও যেন ফাঁকিমারা কথা বলছে বড়রা। সীতা বুঝতে পারেন সব কিছু, কিন্তু এখনই ওদের পিতৃপরিচয় দেওয়া যাবে না। সেটা হবে হিতে বিপরীত। মহাঋষি বাল্মিকী যখন, সকলের ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন, তখন আগ-বাড়িয়ে এসব কথা বলার অর্থ—**বিশ্বাসঃ নৈব কর্ত্তব্যম্ স্ত্রীষু রাজুকুলেসু চ।**"

মনের মধ্যে অশান্তি ধূমায়িত হচ্ছে তাঁরও। বড্ড অসহায় মনে হয় তাঁর নিজেকে। জন্মের পর থেকে তিনি জেনেছেন, তিনি মৈথিলী বটেন, তবে রাজর্ষি জনকের পালিতা কন্যা। তিনিতো নিজেও জানেন না, কে তাঁর জন্মদাতা, কেইবা জন্মদাত্রী! সে ব্যথা যদি তিনি অনুভব করেন, তবে এ' দুই শিশু কেন করবে না। দুই যমজ শিশু কুশ আর লব সমান বয়সী। ধৈর্য্যে আর তিতিক্ষায়, কুশকে সংযত হ'তে দেখলেও, লবকে তা হ'তে দেখা যায় না। সেইই ফুঁসে উঠে বেশী।

তপোবনের যে বাঘ, সিংহ, শৃগাল হিংসা ভুলে, বেড়ালের মত নিরীহ জীবন যাপন করে, অকারণে তাদের ঝুঁটি ধরে টানতে টানতে সে বিরক্ত করে। মনের কন্দরে এক সীমাহীন উচ্ছৃঙ্খল বালখিল্যতা, তাকে পেয়ে বসেছে। শাসন মানে না, ইচ্ছাকৃত অপমানে জর্জরিত করে গুরুজনদের। ক্ষমাশীল ঋষিরা, ঋষি বালিকা-বালকেরা, প্রিয় সম্ভাষণে তার দৌরাত্ম্য কিছুটা কমালেও, অন্তর্লীন এক অতৃপ্তি যেন, তাকে মরীচিকার মত দৌড় করায়। শান্ত হ'তে শেখেনি সে!

সীতা বুঝতে পারেন না—এর পরিসমাপ্তি কোথায়! বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, বালখিল্যতা কমে আসে, প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হয় সকলে। কিন্তু এ' শিশু লব তো—সব

শাসনের বাইরে যেতে উন্মুখ। ক্রমে ক্রমে এ' যে, দুঃ-শাসন হয়ে উঠছে।

উষা সমাগতা। সমস্ত দিক-চক্রবাল্ জুড়ে ধ্বনিত আর প্রতিধ্বনিত হচ্ছে একটাই চেতাবণী—ভোর ভয়োঃ। কী তার মানে? ওর মানেটা হচ্ছে—রাত শেষ হয়ে এলো—জগৎ পিতা সাঁত ঘোড়ার রথ চালিয়ে, আসছে উপহার দিতে কিরণমালা। তাঁকে প্রণাম করে স্বাগত জানাও। জাগেনি লব, আলস্য—উপেক্ষা আর ঘৃণা তাকে ঘিরে ধরেছে! মহাঋষি বাল্মিকী, ঋষি ভরদ্বাজ, ত্রিলোকজননী সীতা আর কুশ প্রণাম জানালেন, জগৎ পিতা দিবাকরকে।

লব কেন যে এলো না, শুনলেন মন দিয়ে সীতার কথা তিনি। বললেন—বৎসে, চিন্তা কোরো না। কুশ একদিন আপন কক্ষপথে, নিয়ে আসতে পারবে সহোদর লবকে। ক্ষণিক বিশৃঙ্খলতা, চিরকালীন অবস্থানকে নির্দেশ করে না। নতমুখ কেন মাগো, ধরিত্রীর কন্যা তুমি, সর্বংসহা না তোমাকেই হতে হবে। ওর ভার আমি তো নিয়েছি, তবে এত শংকা কেন তোমার? আমার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ো না। আমিই একদিন নিয়ে যাবো, ওদেরকে ওদের জন্মদাতার সামনে, ওদের পরিচয় খুলে ধরবো রাজার সামনে।

মা, রাজরক্ত বইছে ওদের শিরায় উপশিরায়। জন্মসূত্রে মন-মর্জিও পেয়েছে রাজার। শত শাসনেও কখনও কখনও তা' ফুঁসে উঠে, সেটা খুবই স্বাভাবিক। কুশ তুমি মাকে নিয়ে যাও। কিছু প্রাতঃরাশ খেয়ে চলে এসো। আজ আমি তোমাকে শোনাবো এক আজব কাহিনী। লবকে ঘুম ভাঙ্গিয়ে বিরক্ত কোরো না। যখন তার সময় হবে, তখন সে উঠবে।"

কুশকে সাথে নিয়ে, চলে গেলেন সীতা। মনে বড় প্রশান্তি আজ তাঁর। বুকের উপর থেকে যেন, জগদ্দল পাথরটা কেউ সরিয়ে দিয়েছে। কুশের কোঁচড়ে ভরে দিয়েছেন কিছু বনজ ফল, পাত্রে কিছু দুধ। আর গতকালের তৈরী করা, মাত্র দুটি শর-তীর তাকে দেওয়া হয়েছে, লক্ষ্যভেদ করার জন্য। দু'টো আছে লবের জন্য—সেও শিখবে লক্ষ্যভেদ করা। শয্যা ত্যাগ করে সে উঠে দেখালো—দাদা কুশ তৈরী হচ্ছে মহাঋষির কাছে পাঠ নিতে যাবার জন্য। গৃহস্থলীর কাজে ব্যাপৃত মা। কেউ আজ তাকে ডাকেনি, জাগায়নি।

বড় অদ্ভুত লাগছে তার। প্রতিদিনের মত আজ কেন, তার দিনটা শুরু হলো না? তমসার জলে হাত মুখ ধুয়ে আসতে গিয়ে, সে দেখতে পেলো, কেউ আর তাকে ডেকে কথা বলছে না। সে যেন অচেনা হয়ে গেছে সকলের কাছে। সবাই পাঠাভ্যাসে রত। শশক শাবকেরা, হরিণ শিশুরা আজ তার পেছন পেছন গেল না। দূরে দূরে অবহেলা ভরে, হাই তুললো মাত্র। নীরবে মায়ের সামনে দাঁড়ালো সে। মনের ভেতরে কাজ করছে তার অপরাধবোধ।

—— "তুমি কিছু বলবে লব?"

—— "আমাকে আজকে ডাকোনি কেন মা?"

—— "তুমিতো চাও না যে, আমরা তোমাকে বিরক্ত করি। তাই তোমার ভোরের ঘুম ভাঙ্গিয়ে, তোমাকে বিরক্ত করতে আমরা চাইনি। আমাদের প্রাতঃকৃত যা' কিছু, সেটা একটা নিয়ম মেনে চলে। আমরা, ভাল না লাগলেও নিয়মের দাস। সকালে উঠে সূর্য্য প্রণাম করি, তমসায় অবগাহন করে। সব ঋষি বালকেরা, ঋষি-মহাঋষিরা, ঋষি মাতারা, ঋষি কন্যারা তাই করেন, সকালে কী সন্ধ্যায়। এখন ওরা পাঠাভ্যাসে রত, এটাও ওদের নিয়ম করে করতে হয়—তাই ওরা করছে।"

"তোমার যদি অন্য রকম করতে ইচ্ছা করে, তবে তা' তুমি করতে পারো। আমার ডাকা বা না ডাকা, বলা বা না বলায়—তোমার কী আসে যায়? স্বাধীন হ'তে চাইলে, আমিই প্রথম স্বাগত জানাবো, তোমার সে ইচ্ছাকে। স্বাধীন হতে গেলে, কিছু কিছু নিয়মের পরাধীন হতে হয়, তবেই স্বাধীনতার পরিপূর্ণতা আসে। সূর্য্য-চন্দ্রও স্বাধীন, তাঁদের ইচ্ছাকে কেউ প্রতিহত করে না। তবুও তাঁরা অনেক নিয়মের অধীন। সকালে সন্ধ্যায় উঠতে আর ডুবতে হয় তাঁদেরও। তোমার ইচ্ছাও আমাদের দ্বারা প্রতিহত হোক, তাও চাই না। তাই, তাত তোমাকে বিরক্ত করতে নিষেধ করেছেন। আর কিছু বলবে লব? এটা জানবে—স্বাধীনতা, উচ্ছৃঙ্খলতা নয়!

মাথা নীচু করে উঠোনে দাঁড়িয়ে, পা দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে সে ভাবতে লাগলো, এখন কী তার করা উচিৎ। কোন কিছুই তার করা উচিৎ কী উচিৎ না, ঠিক করতে পারলো না সে। শশক শাবকদের পেছনে ধাওয়া করে, সে ধরতে পারলো না একটাকেও। হরিণ শিশুরা দৌড়ে বনের ভেতর পালালো, তার নাগালের বাইরে। এতদিন ওরাই তাকে সংগ দিতো। ঋষি বালকেরা পাঠ থেকে নিরস্ত হয়ে, সঙ্গ দিল না আজ তাকে। সবাই তাকে কেন অমন করে, ত্যাগ করেছে? উদভ্রান্তের মত সে আবার এসে, দাঁড়ালো মায়ের সামনে।

—— বলো, আর কিছু বলবে? সংসার অনেক কাজ থাকে, সেগুলো দেখতে হয় আমাকেই। এটা ঋষির আশ্রম, সব নিয়ম কানুন মানতে হয় আমাকে, তপোবনের নিশ্চিদ্র শান্তি বজায় রাখতে। বলো তোমার আর কী প্রয়োজন? তুমি কি এখন কিছু খাবে? অথবা অন্য কিছু কী করতে চাও!

—— না, কিছু খাবো না আমি। আমি যাচ্ছি মাতামহের কাছে পাঠ নিতে। দাও আমার ধনুক আর শর-তীরগুলো। ভূর্জপত্রে লেখা পাঠগুলো। দাদাতো অনেকক্ষণ চলে গেছে—আমারই যা' দেরী হয়ে গেল।

বিমর্ষ মনে এগিয়ে চললো লব, মহাঋষি বাল্মীকির কুটীরে। প্রাঙ্গণ অতিক্রম

করেই, সে দেখতে পেল, দাদা কুশ বেরিয়ে আসছে, সে ঋষির কুটীর থেকে। সে দিনের মত তার পাঠ শেষ। হৃষ্টমনে তাকে বেরুতে দেখে, খানিকটা যেন দমিত হয়ে পড়লো লব। মহাঋষি বাল্মিকী প্রত্যুৎগমন করতে এসে—লবকে দেখে বললেন, "বৎস, এখন প্রায় দ্বিপ্রহর হ'তে চলেছে। আহ্নিক করার সময় এখন। সময় আর জোয়ার কারুর জন্য অপেক্ষা করে না। সে চলে যাবে চিরকালের মত। তাই তাকে যাওয়ার আগে প্রণাম জানাতে হয়—গুরু পরম্পরায় আমরা তা শিখেছি।

তো বৎস, যে পাঠ নিতে তুমি আজকে এখন এসেছ, সেটা কালকেও নিতে পারো। যে লক্ষ্যভেদ করবার জন্য ওই ধনুক আর শর-তীর তোমার কাঁধে নিয়ে এসেছো, সেটা আগামী কালও তুমি অনুশীলন করতে পারো। শুধু, আজ যা করতে পারতে, অপেক্ষা করতে হবে আগামী কালের জন্য। তুমি আর আমি কেউই জানি না, সে সকালটা কেমন মূর্ত্তি নিয়ে আসবে—বার্ত্তাই বা কী হবে তার!

অধোমুখ লব কোন প্রত্যুত্তর না দিয়ে, অনুগমন করলো কুশের। কুশের কাছে সে জেনে নিল—কী কী পাঠ আজ সে পেয়েছে, মাতামহ বাল্মীকির কাছ থেকে। তারপর কুটীরে ফিরে, দু'জনে আবার আহারে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। সীতা পরিবেশন করলেন ফলমূল অন্ন আর দুধ।

—— লব আমার নাম কেন রাখলে, দাদাই বা কুশ হলো কেন? অন্য কোন নাম তুমি আমাদের রাখতে পারলে না? সব ঋষি বালক বালিকারা, নাম নিয়ে উপহাস করে আমাদের! ওদের কত সুন্দর সুন্দর নাম। ঘাসের নামে কি মানুষের নাম হয়?

—— কুশ, তোমাকেও কী লব-র মত, উপহাসের পাত্র হ'তে হয়, ঋষি বালক বালিকাদের কাছে? তোমার কী কখনও মনে হয়েছে, ঘাসের নাম তোমার নাম? এতে কী তোমার সম্মান নষ্ট হয়েছে বলে তুমি মনে কর?

—— না তো মা, আমি এ'সব প্রশ্নের সম্মুখীন হইনি। কেউই আমাকে উপহাসও করেনি। ভাই লবকে কেন ওরা উপহাস করে, সে ব্যাপারে খোঁজ নিতে পারি মাত্র। বন্ধুরা অমন একটু ক্ষ্যাপায়, মনে রাখতে নাই ও' সব। আর ভাই লব, তুমিওতো বিরক্ত কর, নিরীহ শশক আর হরিণ শাবকদের!

—সমস্ত ঋষি বালক-বালিকার যা' কাজ, সে কাজও যে তোমাদের হওয়া উচিৎ, তাকি তুমি মনে করো? তুমি কী এও মনে করো যে, মুনি ঋষিরা যা' করেন তা' বাতুলতা মাত্র? অর্থহীন এক নিষ্কর্মার ক্ষ্যাপামী?

—— না, মা। আমার তা' মনে হয় না। বিশেষতঃ যখন তোমাকে আর মাতামহকে দেখি। মাতুল ভরদ্বাজকে তো আমার, বড়ই আপনজন বলে মনে হয়। তোমাদের স্নেহচ্ছায়াকে, আমার মনে হয়—স্বর্গের চেয়েও অধিকতর সুস্বাদু আর

মূল্যবান। যদিও স্বর্গের সংজ্ঞা আমার জানা নাই!

—— আর লব, তোমার কী মনে হয়?

নতমুখ লব, কোন উত্তর দিতে পারলো না। সীতা বললেন, ''সব কিছু প্রশ্ন রাখা উচিৎ আশ্রম পিতার কাছে। কেন তোমাদের নাম হ'ল—লব-কুশ? কেন সবাই কাজ করে যথা সময়ে, কেন লব ও'গুলো ভালবাসে না—এ' সব কিছুর সদুত্তর নিশ্চয়ই, তাঁর কাছে আছে। আশা করি, তিনি সে সব তোমাদের বুঝিয়ে বলবেন। কুশের আহ্নিক করার, সম্ভবতঃ সময় হয়েছে। লব করবে কিনা, সেটা সেই ভেবে দেখবে। আমার কাজ আছে। আমি চললাম।''

সন্ধ্যা সমাগতা। অস্তোন্মুখ রবি পশ্চিমাকাশে। লবের চোখে লেগে আছে দিবানিদ্রার মৃদু স্পর্শ। আয়েসী মানুষের যা' হয়, তেমনই সে গিয়ে বসলো মহাঋষি বাল্মীকির সামনে। ঋষিদের সর্বংসহ হ'তে হয় পৃথিবীর মত। চুপচাপ দেখে, শুধু বুঝে নিলেন তিনি। বললেন না কিছুই মুখে ফুটে। শুধু এটুকু বুঝলেন, কুশ আর লবে ফারাক—আকাশ আর পাতাল!

—— কাকে প্রণাম করছেন, আমি জানি না। বিশ্বাস আমার এতটুকুও নাই। শুধু জানতে দিন যে, যাঁকে প্রণাম করছেন আপনারা— ওটা ভড়ং, নাকি সত্যিকারের প্রণাম! লোকটা কে জানতে পারি?

—— লোকটাকে জানতে, অত তোমার আগ্রহ কেন? তোমার মত যাঁরা স্বীয় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত নয়, যারা অন্য অপরের ক্ষমতার দাস মাত্র, যারা জন্মদাতা পিতা ছাড়া, অপরকেও পিতার সম্মান দেয়, যারা তোমাব মতে কুকুরেরও অধম, যাদের জন্মের ঠিক নাই—তারা কী করলো বা কী করলো না, সেটা জেনে তোমার কী লাভ? আর সে কথা যদি বুঝতে চাও তবে তো, আমার মত এক নপুংসকের কাছে, তোমাকে হাত জড়ো করে দাঁড়াতে হবে!

তুমি যেই হওনা কেন. দেবর্ষি নারদের চেয়েও তো তুমি বড় নও! শুধু এটা জেনে নাও যে, উনি মিথ্যা বলেননি। আর তুমি যা' বুঝেছ, তা' যদি তাঁর থেকে অনেক উঁচুমানেরও হয়, তবুও আমরা অন্ততঃ মানবো না সেটা। কেন না, অজানা বাঁদরের কিছুটা ক্ষমা আছে—বোধবুদ্ধি সম্পন্ন বাঁদরকে আমরা ক্ষমা করি না। তুমি নর, কী বা—নর, সে প্রশ্নে না গিয়ে, শুধু এ'টুকু বলবো যে, তুমি সবটা ঠিক জানো না। আরও অনেক কথা আছে, যা' তোমাকে জানতে হবে। স্বয়ং নারদ বলেছেন ঃ—

"দিবি স্থিতাং ময়ূখাগ্রৈর্দোতয়ন্তং দিশে দশঃ।

বসুধামন্তরীক্ষং চ ব্যাপ্তবন্তং মরীচিভিঃ"।।৫।।

(দূর আকাশপথে যাঁর গতি, যিনি এই সমস্ত চরাচরের দশ দিক, আলোয়

আলোয় ভরে দেন, (তিনি সূর্য্য)।

"ঋষিনাম অগ্নিহোত্রেষু যজ্ঞে বেদেষু সংস্থিতম্।

অক্ষরং পরমম্ গুহ্যং মোক্ষদ্বারং সুবোত্তমম্"।।

(যিনি ঋষিদের অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানে, যজ্ঞে আর বেদে হাজির থাকেন সব সময়, মোক্ষ বা মুক্তি বলে আমরা যা' বুঝি, তা'তেও তিনি থাকেন গোপনীয়ভাবে, সমস্ত দেবতারা যাঁর স্তুতি করেন, (আমরা প্রণাম করছি তাঁকে—সেই সবিতাকে)।

"ত্বং ব্রহ্মা, ত্বং মহাদেব, ত্বং বিষ্ণুশ্চ ত্বং প্রজাপতি।

বায়ুরাকাশমাপশ্চ পৃথিবী-গিরি-সাগরাঃ"।।

(তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই মহাদেব, তুমিই বিষ্ণু আর প্রজাপিতা; তুমি বায়ু-আকাশ-জল—পৃথিবী পর্বৎ আর সাগর স্বরূপ। (তোমাকে আমরা প্রণাম করি)।

.... বৃহ নারদীয় পূরাণ

প্রণাম শেষ করে ঋষি বাল্মীকি বললেন, "আর কিছু তোমার প্রশ্ন আছে লব? সংকোচ কোর না। রূঢ়তা পরিত্যাগ করে, সমাহিত হয়ে প্রশ্ন করলে, উত্তরও হয় সাবলীল। উত্তর কথাটার মানে হ'ল আবিষ্কার। প্রশ্ন মনের মধ্যে উদিত না হলে, উত্তরের আবিষ্কার হয় না। তাই প্রশ্ন অজ্ঞতা থেকে সজ্ঞতায়, অর্থ্যাৎ জ্ঞানে উত্তরণ ঘটায়। প্রশ্নকে তাই স্বাগত জানাতে হয়। শুধু সংযত চিত্তে শুনতে হয়, অথবা পরম শ্রদ্ধায় তাকে খুঁজতে হয়।

জানবার আগে, 'সব জেনে ফেলেছি'—এ' মনোভাব, প্রগাঢ় মূর্খতাকে আমন্ত্রণ জানায়, আলোকবৃত্ত থেকে দূরে অন্ধকারে নিয়ে যায়, একটু একটু করে। সত্য থেকে এমনি করে, মানুষ দূরে চলে যায়। মূর্খতাই মরীচিকার মত টানে, মরীচির মত আলো ছড়ায় না বৎস। লক্ষ্য করে দেখেছ নিশ্চয়ই যে, তোমার সতীর্থ ঋষি বালক-বালিকারা তোমাকে পরিত্যাগ করেছে।

সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত, জানতে—অবজ্ঞা করতে নয়। কী নেবে, কী নেবে না—সেটার বিচার পরেও করতে পারবে। আগে তো জেনে নাও। সবকিছু জেনে, তবে না—অপ্রয়োজনীয়কে বাদ দেওয়া হয়!

—— "তাত, আপনি কি আপন প্রজ্ঞায় সত্য বলে, বুঝতে পেরেছেন যে, সূর্য্যই সত্য? আর কিছুই সত্য নয়! অথবা সত্য-অসত্য মিলে, এমন একটা পরিস্থিতি তৈরী করে, যা' সত্যকেও সাময়িক হলেও চমকে দেয়?

—— "হাঁ বৎস। ওঁর চেয়ে সত্য অন্য কিছু আছে বলে, আমি অন্ততঃ জানি

না। আজ আমি যা' বলছি, একদিন তুমিও তা' বুঝতে পারবে। **ঈশ্বর অনেক সত্যের সমাহার। বলা যেতে পারে এক বিরাট সত্যের, ক্ষুদ্রাংশ হ'ল ওই মার্ত্তণ্ড। সূর্য্য সত্য বলে, মা কালী কী দুর্গা কী শিব মিথ্যা হয়ে যান না। তাঁরাও সত্যের অংশ মাত্র। নানা নামে, নাম করণ করা হয়েছে মাত্র। এ জংগলের নাম তপোবন, কেউ বলে বন। আসলে এটা জঙ্গলও বটে, তপোবনও বটে, আবার বনও বটে। সত্য হলো—গাছপালা সমাকীর্ণ এক ভুখণ্ড, যেখনে নিরিবিলিতে, সাধু ঋষিরা তপস্যা করেন।** সত্যের স্বরূপটা, অমি সম্ভবতঃ তোমাদের বুঝাতে পেরেছি, লবকুশ?

আজ আমি তোমাদের বলবো এক চোরের বা ডাকাতের কাহিনী, যা' শুনে তোমরা স্তম্ভিত হয়ে যাবে। মানুষ এতটাও নৃশংস হ'তে পারে? আজ তোমাদের কচি কচি মন, নিষ্পাপ বুদ্ধি—তবুও পুত্র বলি, আরও যত বড় হবে, যতই তোমাদের জ্ঞান পরিপক্ক হবে, বুঝতে পারবে—দু'চোখের দেখাটাও ভুল হতে পারে, হতেও পারে মিথ্যায় পর্য্যবসিত—অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে—দিমাগ দিয়ে বুঝতে হয় তা'। তর্ক-হুজ্জোৎ দিয়ে শুধু, মূর্খকেই ভোলানো যায় কিছুকাল। সবটা সময় তা' হয় না—হতে পারে না। কারণ—মূর্খ সবাই নয়, সব সময়।

আর গায়ের জোরে যদি মনে করো যে, তোমার বশে থাকবে পৃথিবীটা, তবে এটা জেনো যে, যে শরীর বা অহংকার নিয়ে এতটাই তোমার রমরমা, সেটাই একদিন তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। সময় আর কাল তাকে খেয়ে নেবে! উপদেশের ঝাঁপি বন্ধ করে বরং বলি, সেই ডাকাতটার কথা। শুধু উপদেশ, বিরক্তিই উৎপাদন করে। সরস কিছু ঘটনা বলি—শুনতে ভাল লাগবে তোমাদের। সীতা মায়েরও ভাল লাগবে। সন্ধ্যেবেলায় আমার অনেক কিছু কাজ থাকলেও, একটা বড় কাজতো হবে—সেটা তোমাদের গল্প শুনানো! এটা একটা সত্যি কাহিনী। কল্পনা নাই যাতে এতটুকুও!

এক যে ছিল ঋষি তার নাম ছিল চ্যবন। ভৃগু বংশে জন্ম তার। তার বউ ছিল একজন। নাম তার সুকন্যা। সে ছিল আবার রাজার বেটী। রাজা শর্যাতি তার বাপের নাম। মহাপূণ্যা নদী নর্মদা তটেই তার রাজত্ব ছিল। ওই সাতপুরা আর বিন্ধ্যাপর্বত জুড়ে তার রাজ্য ছিল। রাজাতো তার রাজ্যের, যেখানে খুশী বেড়াতেই পারে। আদরের মেয়ে সুকন্যাকে নিয়ে, সেই রাজা শর্যাতি এলেন একদিন বেড়াতে ওই ঋষ্যমুক পর্বতে।

বাচ্চা মেয়ে, এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করতে করতে, হঠাৎ দেখতে পেল কয়েকটা উইঢিবি। সেই উইঢিবির ভেতরে জ্বলছে যেন দু'টো জোনাকীর আলো। একটা শুকনো গাছের ডাল নিয়ে, সুকন্যা সজোরে খোঁচা মারলো, সেই আলো-জ্বলা ফোঁকরে। হুড়মুড়িয়ে ভেঙ্গে গেল সেই উইঢিবি। সেটার ভেতর থেকে উঠে দাঁড়ালো. একজন হাড়সার মৃতপ্রায় ঋষি—নাম তার চ্যবন। **ক্ষেপে গিয়ে বললো, "এই আঘাত আর বিরক্ত করার একমাত্র ওষুধ হচ্ছে—তোমাকে, আমাকে বিয়ে করতে হবে। আর আমার স্ত্রী হয়ে, সেবাকাজের মধ্য দিয়ে, তুমি তোমার পাপের আর অপরাধের ঋণ**

পরিশোধ করবে।"

রাজা শর্যাতি দৌড়ে এসে, একটা মিটমাট করবার চেষ্টা করেও, বিফল হলো। বাধ্য হলো এক রাগী মৃতপ্রায় সন্ন্যাসীর হাতে, তুলে দিতে আপন প্রিয় কন্যাকে। বিয়ে হয়ে গেল তাদের। কিন্তু শ্মশানের পথে পা বাড়ানো ওই ঋষি তো, সংসারের সব কাজ ঠিক মতো করতে পারতো না। তাই দুই চিকিৎসককে দেখিয়ে, শরীরটা সারানো হলো তার। সুকন্যার গর্ভে এলো এক সন্তান। সে সন্তান একদিন এই পৃথিবীর আলো দেখলো। নাম তার রত্নাকর।

বড্ড ভালবেসে ওই নাম রেখেছিল, তার বাবা মা। রত্ন তো সে হ'লই না, অরত্ন হ'তে লাগলো দিনে দিনে। যতই বড় হ'তে লাগলো—ততই তার সুপ্ত চেহারাটা, উপ্ত হ'তে লাগলো একে একে। অযত্ন দেখা দিল পড়াশুনায়। ঋষির সন্তান—ধৈর্য্য-স্থৈর্য্য-শিক্ষা-দীক্ষায় নম্র হবে—এ'টাই তো সবাই আশা করে! সে হ'লো ঠিক তার উল্টো।

পৃথিবীর যা' কিছু গর্হিত কাজ, সে করে বেড়াতে লাগলো, বয়স বাড়ার সাথে সাথে। একটু একটু করে অপরাধ, আর নৃশংস হ'তে হ'তে, সে এক সময় হয়ে গেল পাক্কা একটা ডাকু। সবাই তাকে ভয় করতো। সারা অমরকণ্টক থেকে শুরু করে ওই ওঁকারেশ্বর পর্য্যন্ত—পর্বতের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে সে, করে যেত ডাকুগিরি—ডাকাতি। কেন করতো সে তা'? ডাকু হলেও—একমাত্র সন্তান ওই ডাকাত, এটা মেনে চলতো যে—বৃদ্ধ মা-বাবাকে, স্ত্রীকে অন্ততঃ রুটি তরকারীর—ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আর সে তা' করতো ও সব সময়।

কী রকম নৃশংস ছিল ডাকু রত্নাকর? একটু সে কথাও শুনে নাও! গহন অরণ্যে সে থাকতো লুকিয়ে, টিকটিকি-গিরগিটি-হনুমান-বানর অথবা তক্ষকের মত। গাছের ডগায় চড়ে চড়ে সে নজর রাখতো, প্রতিটি মানুষের চলা ফেরায়। বাইরের কেউ হলে, সে পড়তো ঝাঁপিয়ে তার উপর। গায়ের জোর আর কুঠারের জোর, সব মিলিয়ে সে কেল্লা মাৎ করতো। বড্ড অহংকার ছিল, তার ওই ব্যাপারে। স্বয়ং নারায়ণও বুঝতে পারছেন না যে, কেন এমনটা ঘটছে।

একদিন পাঠালেন তিনি নারদকে, ব্যাপারটা জেনে আসতে। নারদ মুনি গান গাইতে গাইতে, চলেছেন বনপথে। হঠাৎ তার গতিরোধ হতেই, লক্ষ্য করলেন তিনি যে—তিন চার জন মানুষ ঝুলছে গাছ থেকে। তাদের মাথাটা নীচের দিকে—পা দুটো উপরের দিকে বাদুড়ের মত। সেই পায়ে দড়িবাঁধা দু'দিকে দু'গাছে। মাথাগুলোকে কেটে নেওয়া হয়েছে। কাঁধের উপরে তাঁর ঠ্যাকানো রয়েছে, শাণিত পরশু বা টাঙ্গী। ঘাড়টা তাঁর ছেঁটে দিতে উদ্যত ডাকু রত্নাকর। ঋষি নারদ বললেন :-

—— বৎস, আমি তো ঈশ্বরের নামগান করি। অর্থ সঞ্চয় আমি করি না। আর তাছাড়া সেটাও নিষেধ আছে আমাদের। আমাকে মেরে-ধরে তো, তুমি কিছু পাবে না বাবা। উপদেশ দেবার যোগ্যতা আর অধিকার আমার নাই। তবুও বলি, যদি মনে কিছু না কর, তোমার এ'সকল কাজ, শুধু তোমাকে পাপেই ডুবাচ্ছে। এই নরহত্যার মত জঘন্যতম পাপ থেকে; তুমি মুক্তি পাবে কবে আর কী করে?

যাঁদের জন্য তুমি এসব করছো, বৎস—তাঁরা কী তোমার এই কাজকে সমর্থন করেন? আর যদি করেনও বা, তবে কী তাঁরা তোমার এই পাপের অংশ নেবেন? মনে তো হয়, তাঁরা সবাই ওই দায় নিতে চাইবেন না। ওটা তোমারই একান্ত নিজস্ব। সুখের পয়সা সবাই ভাগ করে, দুঃখের যন্ত্রণার অংশীদার কেউ হয় না, এমন কী মা-বাবা-স্ত্রীও হন না!

—— আমাকে ভুল বুঝাবার চেষ্টা করো না ঋষি! সূর্য্যোদয় থেকে আমি সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত, শুধু নরমেধ যজ্ঞ করি। কেড়ে নিই তাদের শেষ কপর্দকটুকুও। শরীরের কাপড়টুকুও আমি তাদের রাখি না। আর সেটা যোগান দিই আমার মা-বাবাকে, আমার স্ত্রীকে। আমি রাখিনি তাঁদের কোন অনটন। রাজার হালে আমি রেখেছি তাদের। তবে কেন তারা আমার, এই কাজের পাপকে ভাগ করে নেবে না?

তুমি ভুল করছো, ঋষি—আমার সংসারের মানুষগুলো, ও'রকম নয়ই! তোমার মিষ্টি কথায় আমাকে তুমি, কখনই ভুলাতে পারবে না! মৃত্যু তোমার হবেই—সঙ্গে কিছুই তোমার নাই বলে। আমাকে কোন কিছু নজরানা না দিয়ে, এই বনভূমি কেউই পার হতে পারে না।

—— ঠিক আছে বৎস। মারতেই যদি চাও—তবে একটু বাদেই তো তুমি, আমাকে মারতে পারো। আগে বাড়ী তো যাও। যাঁদের জন্য এইসব অপকর্ম তুমি করো—জিজ্ঞেস করো যে—সত্যিই তাঁরা এই পাপ কাজের অংশ নেবেন! এক কাজ তুমি করতে পারো, তুমি আমাকে দড়ি দিয়ে, বেঁধে দিয়ে যেতে পারো। আমি কথা দিচ্ছি দড়ি বা লতার প্যাঁচ খুলে পালাবো না। বাঁধো আমাকে ওই লতার প্যাঁচে, এই হরিতকী গাছের সাথে। আমি অপেক্ষা করবো, তোমার ফিরে আসবার জন্য। যাও বৎস, ওঁদের জিজ্ঞেস করে এসো। আমার মরার আগে, অন্ততঃ এটা জানি যে, ওঁরা ঠিক!

রত্নাকরের কেমন যেন মনে হতে লাগলো। পরীক্ষা করবার জন্য সে ঋষি নারদকে বাঁধলো, গুলঞ্চলতা দিয়ে হরিতকী গাছের সাথে। আর বলে গেল, "পালালে, তুমি যেখানেই থাকো না কেন, ধরে এনে তোমাকে—কুচি কুচি করে কাটবো আমি। তাই বলছি—তুমি পালিও না। বাঁচতে যতটা সময় দরকার, তোমাকে তাই দিলাম—ততটুকু সময় আমাকে তুমি দাও!"

—আমি এমনি ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবো এখানে। অপেক্ষা করবো, তোমার ফেরার সময়ের জন্য। তুমি এ' ব্যাপারে নিশ্চিত হ'তে পারো। তুমি শুধু নিশ্চিন্ত হও যে, ওঁরা তোমার এই পাপকর্মের, সর্বতোভাবে অংশীদার হবেন, যাঁদের জন্য তুমি উদয়াস্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করো, আর মৃত মানুষদের নির্বিশেষ অভিশাপ কুড়াও।

কাঁধে কুঠারটা ফেলে, বাড়ীর দিকে চলে গেল, সেই ডাকাত রত্নাকর। মনের মধ্যে তার গুমরাতে লাগলো, হাজারো কথার ভিড়। উঠোনে পা দিতেই, তার গর্ভধারিনী রাজা শর্যাতির কন্যা সুকন্যা বললেন—''আজ খালি হাত কেন পুত্র? আজকাল কী তুমি তোমার, পরম কাজে অবহেলা করছো? আমি আর তোমার বাবা, এখন অশীতিপর বৃদ্ধ। তোমার কায়িক শ্রমের আয়ে, আমাদের প্রতিদিনের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়। আজ কী আমরা, উপোষ করে থাকবো?''

তাঁর স্ত্রী বললেন, ''লজ্জা করে না তোমার? যদি খেতে পরতে দিতে না পারবে, তবে কেন বিয়ে করেছিলে? শুধু কী ফুর্তি লুটবার জন্য? ছিঃ, স্বামী—ছিঃ, তুমি যেন আজকাল মরে গেছ! সবল দেহটা কেন মৃতপ্রায়?

——- ''তোমরা সকলে এটুকু বলো যে, আমার পাপের ভাগ তোমরা নেবে! আমি তো তোমাদের জন্যই, এই সব অপকর্ম করে বেড়াই! যদি তোমরা আমার কাজের ফলাফলের অংশ না নাও, তবে আমি কেন এসব করছি—তা'হলে? আর পাঁচটা সাধু ঋষির মত, এই সংসার ছেড়ে, আমি তো বাণপ্রস্থ অবলম্বন করতে পারি! আমার মনের দিকটা, বড়ো নাড়া খেয়েছে আজ। আমাকে জানতে হবে, তোমরা আমার পাপ আর পুর্ণ্যের অংশীদার কিনা।''

ঋষি আর সুকন্যা বললেন ঃ ''যদি কিছু সত্যিই জানতে চাও, তবে তোমাকে ধৈর্য্য ধরে শুনতে হবে অনেক কথা। আর সে কথা তোমার, আর এই বিশ্বের সমস্ত চরাচরের কাছে, পাগলের প্রলাপ বলে মনে হবে। কেন তা' তোমরা সে ভাবে নেবে—কেন তার যাথার্থ তোমরা বিচার করবে না; সে দায় তোমাদের! প্রশ্ন করেছ, উত্তর অবশ্যই পাবে তুমি, কারণ—সুধীজন অবশ্যই আশা বা প্রত্যাশা করেন, কোন এক সদুত্তরের। আর তাই তুমিও পাবে সদুত্তর। তোমার বিচারে যদি কদুত্তর হয়, আমাদের কথাগুলো—তবে পিতামাতা হয়েও, ক্ষমা চেয়ে নেবো আমরা, সে উত্তর উচ্চারণ করবার আগে।

কেন না, চোরা (শঠ্) না শুনে ধর্মের কাহিনী, এই রকম একটা কথা যে—আবাল্য আমরা শুনে আসছি। যদি সেটা বলা আমাদের অপরাধ হয়—যদি তোমাকে তাই বলে, এতটুকুও কোন ভাবেই অনিচ্ছাকৃত বিরক্ত করি, তবে পূর্বাহ্নেই এই 'ক্ষমা' চাওয়া। কারণ কী জানো? **উলঙ্গ সত্যকে মেনে নেবার মত, 'বুকের পাটা' থাকা দরকার, আর 'বাপের-ব্যাটা' হওয়া দরকার।**

এই দুই বিশেষণের কোনটাই, আমরা তোমার ঘাড়ে চড়িয়ে দিতে চাই না। সে বিচারের, এবং গ্রহণ বা বর্জ্জনের দায় তোমার। তবুও একথা বলতে হবে আমাদেরকে যে, তোমার উত্তরের প্রয়াস আমাদের থাকা চাই। সন্তান হিসাবে সে অধিকার, তুমি অর্জন করেছ জন্মসূত্রে। আর উত্তর দেবার বাধ্য-বাধকতা বর্ত্তেছে আমাদের উপর, জন্ম দেবার পরবর্ত্তী সূত্রে। সে অমোঘ দায় আমাদের।

বৎস, কয়েক লহমা সময় কী তুমি, এই বৃদ্ধদের ভিক্ষা দিতে পারো? তবেই আমরা তোমার উত্তব দিতে পারি! **জগতে শাস্ত্রানুসারে, পিতার চেয়ে মাতা বড়ো, স্থানিক আর মর্য্যাদায়। ত্যাগে আর অপরিসীম তিতিক্ষায়। এমনকি পিতার কাছেও তাঁর স্ত্রী প্রণম্যা—কেননা, তিনি জন্ম দেন তাকেই নুতনতর রূপে। তাই স্ত্রীর গর্ভাধানের (রমনের) চরম আর পরম মুহূর্ত্তে বলতে হয়—"ময়ি প্রসীদ জগজ্জননী"—মাগো, আমার উপরে তুমি প্রসন্না হও—আমাকে, আমার বিগত আর আগামী চতুর্দশ পুরুষকে, রূপ পরিগ্রহ করতে দাও, তোমার সন্তানের মত। তোমার স্তন্যে আর স্নেহে বেড়ে উঠতে দাও আমাকে।"**

তাই, হে বৎস—**মা-বাবা এক জায়গায় থাকলে, প্রণাম আগে মাকেই করতে হয়, পিতার স্থান তাঁর পরে।** যে প্রশ্ন তুমি করেছ আমাদেরকে, আর বধূমাতাকে তার একটাই উত্তর তুমি পেতে পারো—তার অধিক উত্তর হয় না। কেননা সত্য তো একটাই। আর আমাদের তিনজনের মধ্যে প্রথম সত্য যদি কেউ থেকে থাকেন, তিনি হলেন তোমার আর আমার জন্মদাত্রী, মহারাজ শর্যাতির আদরের দুলালী, এই সুকন্যা—যাঁর গর্ভ থেকে নিষ্ক্রান্ত, হে শক্তিমান তুমি। কয়েক লহমা তুমি ভিক্ষা দাও আমাদের।

তোমার হাতে আছে কুঠার-কৃপান। আমাদের হাতে আছে জপমালা। বড়ই অশক্ত আমরা তোমার শক্তির কাছে। পিতা হয়েও, তাই কালের কুটিল গতিতে, এই শক্তিমান চারটে হাত, যা' তোমাকে পালন করেছে আবাল্যকাল, ক্ষুধার অন্ন জুগিয়েছে—রোগ শয্যায় জাগর রাত্রি যাপন করেছে; সেই চারটে হাত আজ আগাম বরাভয় চায়, তোমার কাছে—কেননা তুমি মদগর্বী।

ওই কুঠারের আঘাতে, আমাদেরও প্রাণ নিতে পারো! তোমার ওই হিমালয়ের মত সু-উচ্চ অহংকারকে, তা' ধাক্কা মারতে পারে। অপঘাতে মৃত্যুর চেয়ে, আগেভাগে তাই ক্ষমা চাওয়া বরং, শ্রেয় বলে আমি মনে করি। তোমার সময় নষ্ট করতে চাই না আমি। তোমার মা-ই উত্তর দেবেন, আমাদের হয়ে।"

বিভ্রান্ত রত্নাকর পরিপূর্ণ পাগলের মত, আছড়ে পড়লো তাঁর জন্মদাত্রীর **পদপ্রান্তে।** পিতার চেহারা আজ যা' **প্রকাশ** পেল, সেটা তো অকল্পনীয়। **মায়ের পদপ্রান্তে তবে,** পিতা তথা বিগত আর **পরবর্ত্তী চৌদ্দটা পুরুষ! একী কথা সে শুনলো?**

ঠিক শুনেছে তো? ভুল কোথাও হয়নি তো? চোখের সামনে বদলে যেতে লাগলো, তার প্রতিদিনের দেখা অভ্যস্ত পৃথিবীটা।

বৎস, লবকুশ—মহা মদগর্বী, মহা শক্তিমানও কাঁপতে লাগলো থরথর করে। না, কোন শত্রুর সামনে পড়ে নয়, শুধু ওই কথাগুলো শুনে! ঝরঝর করে কাঁদতে কাঁদতে সে, ছুঁড়ে ফেলে দিলো তার হাতের কুঠার। আভূমি প্রণতঃ হয়ে শুধু উত্তরটা চাইলো মায়ের কাছে—দাবীর রূপে নয়—ভিক্ষার আর ওই বিধ্বস্ত ভিক্ষুকের মত! **'মহাশক্তিমান' আর 'মূর্ত্তিমান আতঙ্ক', আজ নিজেই সে আতঙ্কগ্রস্ত।**

রাহু যেন সাপের মত, একটু একটু করে তাকে গিলছে, মাথার দিক থেকে ল্যাজের দিকে। সে যে কী যন্ত্রণা, তা' শুধু উপলব্ধ হতে পারে—যদি তেমনি শক্তিমান কোনদিন তোমরা হও। পরাজয়ের অকল্পনীয় গ্লানি, মহা শক্তিমানের মহাশক্তিকেও শুষে নেয় নিমেষে। অথচ লবকুশ, তোমরা আমার প্রিয় দৌহিত্রেরা, এটা কী কখনও অনুভব করতে পারো যে—অমনই কত মানুষ কেঁদেছে তার পায়ে পড়ে, শুধু প্রাণটুকু ভিক্ষা করে! না, কেঁদে উঠেনি ওই রত্নাকরের প্রাণ, কেঁপে উঠেনি তার কুঠাররূপী কৃপাণ—ধড় থেকে মাথাটাকে কারুর আলাদা করে দিতে।

মাথা হারিয়ে শরীরটা ধড়ফড় করে, কয়েক নিমেষ উল্লম্ফন করেছে মাত্র। আর ওই চ্যবন-সুকন্যার পুত্র রত্নাকর, শুধু অট্টহাস্যে ফেটে পড়েছে সে সময়, শুধু ওই লাশ দেখে, আর কুঠারের ফলা থেকে টুপিয়ে পড়া রক্ত দেখে। সেই ক্রুর আত্মতৃপ্তি, আজ তিলতিল করে রূপ নিয়েছে—আত্ম বিশ্লেষণের! যে যে মায়েরা, মেয়েরা কেঁদেছে আপন জনকে হারিয়ে, তাদের সেই কান্না, মূর্ত্তিমন্ত উপহাস হয়ে, আজ তাকেই বিদ্রূপ করেছে। আর বিদেহ সেই আত্মাবা খলখলিয়ে, প্রেতের হাসি হাসছে আজ তাকে ঘিরে—**"মৃত্যু উপহার মাত্র। পরিবর্ত্তনের অগ্রদূত। আর তা' তোমার কাছে এখন নির্মম প্রহার—হে রত্নাকর!"**

যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠতে উঠতে, বোবা হয়ে গেছে সে মহাদস্যু। শুধু বোবা চোখে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে, পায়ে ধরে পড়ে আছে সে। বরফের মত ঠান্ডা চোখে চাইলো সেই, শর্যাতি তনয়া সুকন্যা। উঠিয়ে নিল না সে পুত্রকে, মূর্খের স্নেহে। ক্ষমা করলো না, সে আত্মজকে।

—— "বৎস, ম্রিয়মান কেন? মৃত্যুই যখন শেষ কথা, তখনতো তুমি অবশ্যই ধন্যবাদ পাবে! কেন না তুমিই সময়ের আগে—মানে ওই **'অসময়ে'** উপহার দিয়েছ তা' বনপথের পথিকদের। যাদের বহু বছর পরে মরার কথ ছিল, যাদের টানতে হতো আমৃত্যু এই পৃথিবীর ঘানি, ঘ্যান ঘ্যানানির ওই জীবন থেকে, তুমিই না তাদের মুক্তি ত্বরান্বিত করেছ। আহা রে বাছা আমার, তুমি কতই না বন্ধুর কাজ করেছ। বাঃ সুন্দর—কী বলো তুমি—রত্নাকর?"

"আরে, ওঠো—ওঠো, হাতের টাঙ্গিটায় ধার দাও, করো বার বার করে শাণিত ওটা। অনেক ঘাড় ছাঁটতে হবে তোমাকে, অনেক পয়সা আয় করতে হবে তোমাকে—সংসারের এই চারটে প্রাণীকে, প্রতিপালন করতে হবে তোমাকে। তুমি যদি এতটাই মুষড়ে পড়ো, তবে সংসার চলবে কেমন করে! আর তুমি ছাড়া তো আমাদের অন্য কেউ নাই! যে অন্ততঃ তোমাকে কিছুটা, সাহায্য করতে পারবে!

বধূমাতাকে বলে দেখবো আমরা, তিনি যদি কিছুটা সাহায্য—তোমাকে করতে পারেন। তোমার স্ত্রী তো তোমার অর্ধাঙ্গিনী। অন্ততঃ হিন্দু শাস্ত্র তো তাই বলে। তবে তিনিই বা আধাআধি, ওই কাজটার ভাগ কেন নিচ্ছেন না? তাঁর এই অলসতা তো, কোনমতে ঠিক বলে বলা যাবে না। যখন তুমি মানুষ খুন করবে, তখন অন্ততঃ তাঁর উচিৎ, হাত-পা শক্ত করে ধরে থাকা। অথবা তাঁরও একটা কুঠার-কৃপাণ কী ত্রিশূল হাতে থাকা দরকার!

যেমন কিনা যখন সেই শিকার, প্রাণ ভয়ে দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করবে—তখন ধরো, তোমার টাঙ্গির আঘাত খেলো প্রথম। তারপর সে দৌড়ালো চেঁচাতে চেঁচাতে। সেই সময় যদি বধূমাতা, তাঁর ত্রিশূলটা তার বুকে কী পিঠে বিঁধিয়ে দেয়, তবেই না শিকার করাটা, আটঘাট বেঁধে করা হবে! তোমার কষ্টটাও কম হবে। স্বীকার কী করো তুমি একথা? নাকি—শিকেয় তুলে রেখে দিতে চাও—বুড়ো ভামীর ভীমরতি বলে! ভয়ানক লাগছে নাকি, আমার কথাগুলো?"

"কী জানো বৎস, আমরা তো বাণপ্রস্থে বনচারী। তবুও শতাধিক বর্ষজীবী এই আমাদের যে, আজও ওই এতটুকু জোয়ার-বাজরার রুটির জন্য, তোমার উপর নির্ভর করতে হয়। দেখ কেমন লালায়িত আমরা। প্রতিটি কাজের কোন না কোন, কারণ থাকে। আর যারা তা বুঝে না, তারা তো অবশ্যই মূর্খ বা অজ্ঞ হবে—ঠিক কিনা! তুমি কারুর গলায়, কুঠারের কোপ লাগিয়ে দিয়ে, যদি বলো যে '**প্রকৃতি করায় কর্ম কী দোষ আমার**'? তবে কী সেটা মানতে হবে আমাদের?"

"তবে কিনা বৎস, আমরা সারাজীবন—অন্য একটা ছবি দেখেছি। আর সে ছবিটা কী জানো—ঝাল যে খায়, সেটা একমাত্র সেইই বুঝে—সেই ঝালের যন্ত্রণাটা। যুদ্ধক্ষেত্রে যে যায়, সেইই সৈনিক বলে আখ্যা পায়। যুদ্ধে যদি রক্ত ঝরে, তাহ'লে রক্ত ঝরে সেই সৈনিকের। তার মা-বাবার রক্ত ঝরে না। কিম্বা বলতে আমাদের এটুকুও দ্বিধা নাই যে—রক্তঝরাটার যন্ত্রণা '**ঘরবালা**' ওরা, অনুভব করে না। মৃত্যুকে শুধু বরণ করে সৈনিক, তার **ঘরবালা-লোগ্** নয়।"

"একথা মনে হয়, আর স্পষ্ট করে বলবার দরকার নেই যে, যা' তুমি করেছ—করছো কিম্বা করবে অদূর ভবিষ্যে, তার অংশীদার হবো আমরা? আমরা যখন তোমার মুখে অন্ন-স্তন্য, বা তোমাকে নিরাপত্তা দিয়েছিলাম, তোমার শৈশবে কী

কৈশোরে, তখন কী আমরা তোমাকে বলেছিলাম যে, তুমি আমাদের সেই কষ্টের অংশীদার হবে? বলিনিতো তা' কোন দিন! তুমিই বেছে নিয়েছ এই পথ—আমাদেরকে প্রতি দিবস-রাত্রির ক্ষুধার অন্ন জোগাতে।

সেখানে যে পরিশ্রম হবে, যে ঘাম তোমাকে ফেলতে হবে, পাপ করবে কী পুণ্য করবে—সে ব্যাপার তোমার। তার তো অংশীদার আমবা হবো না, হতেও পারি না। কেন না, কর্ম বা অকর্ম যে সম্পাদন করে, ফল একমাত্র সেইই ভোগ করে। তোমার কাজের ফল, তুমি ভোগ করবে, আমরা নয়। বধূমাতাও নন।

পতির পুণ্যে সতীর পুণ্যলাভ হয়, কিন্তু পতির পাপ কখনই সতীকে স্পর্শ করতে পারে না। এটাই শাস্ত্রবিহিত বাক্য, মুনি-ঋষিদের অনুভূত এক দর্শন। তাই, পুত্র রত্নাকর—বৃথা তুমি জানতে চাইছো যে, আমরা তোমার ওই কাজের অংশীদার হবো কিনা। না, তা সম্ভব নয়!"

ধনুকের ছিলার মত লাফ দিয়ে উঠে, কুঠারটা ছুঁড়ে ফেলে, সে ছুটলো জঙ্গলের মধ্যে সেই হরিতকী গাছের তলায়, যেখানে সে এক ঋষিকে লতায় আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে এসেছিল; সেই গাছের সাথে। দরবিগলিত অশ্রুকে সামাল দিতে দিতে সে পায়ে পড়লো সেই ঋষির—'**যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর**। হে ঋষি, আজ আমার চোখ—আপনিই খুলে দিয়েছেন। বলে দিন আমাকে, কেমন করে আমি মুক্তি পাবো, আমার এই নরহত্যার পাপ থেকে—চুরি ডাকাতির পাপ থেকে?"

বৎস লবকুশ, ধাক্কা না খেলে, কেউই বুঝে না—তার মূলীভূত যন্ত্রণা। আগ বাড়িয়ে নিরাময়ও, খুঁজে না কেউ। সেই দস্যু তাই খুঁজতে লাগলো, নিরাময়ের পথ। পড়ে রইলো পেছনে, তার মা-বাবা-স্ত্রী-সংসার। ভুলে যেতে চাইলো সব। কিন্তু ভুলে যাওয়া কী এতই সহজ? কিছু একটাকে ভুলতে গেলে, আঁকড়ে ধরতে হয় অন্য কিছুকে। তবেই ভুলে যাওয়া সহজ হয়!

কারণ যাকে ভুলতে চাওয়া, তার জায়গা যে দখল করবে নুতন কিছু, ব্যস্ত থাকতে হবে তাকে নিয়ে—সময় দিতে হবে সেটাতে! আর মানুষ তাই করেও। মানুষ যা হারায়, তার এক '**পরিবর্ত্ত**' কিম্বা '**অথবা**'কে নিয়ে সে ব্যস্ত থাকে। ভুলে যায় আগের কথা। বাঁধন খুলে দিলো সে নিজের হাতে। করুণাঘন চোখে সেই ঋষি চাইলেন, রত্নাকরের দিকে। বললেন অতি ধীর কণ্ঠে :-

——— বৎস, যদি মুক্তি চাও, মুক্ত যিনি করতে পারেন সব পাপ থেকে, তুমি ডাকো তাঁকে। অবশ্যই তিনি সাড়া দেবেন তোমার আর্ত্ত ডাকে। এই নামটা তুমি শুধু জপ করো। বলে দিলেন সেই ঋষি একটা নামমন্ত্র। দস্যুর দীর্ঘকাল অনভ্যস্ত জিভ, উচ্চারণ করতে পারলো না তা'। উল্টো করে জপ করতে লাগলো সেই নামমন্ত্র।

প্রকৃতির এমনই লীলা যে, সোজা হয়ে গেল সেটা উল্টো চলার গতিতে। দস্যু বনে গেল ঋষি, দস্যিপনা ছেড়ে। একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হলো তার সেই নাম-জপ। শ্বাসে-প্রশ্বাসে উচ্চারিত হতে লাগলো তা'।

—— তাত, সে ঋষির নাম কী, আর কীইবা সে মন্ত্র? বড় আনন্দ পেলাম আমরা এই কাহিনী শুনে। প্রতিদিন এমনি করে আমরা, শুনতে প্রত্যাশী সেই গল্পগাথা।

—সে ঋষির নাম সময় হলে জানতে পারবে। জানতে সেটাও পারবে—সে মন্ত্রবাণী কী ছিল! তোমাদের প্রত্যাশা মতো, আমি শুনাবার চেষ্টা করবো সে সব কাহিনী, যা' আমি নিজে জানি আর বুঝি। কল্পলোকের দুয়ার খুলে, আমি কখনই উপহার দেবো না—তোমাদের কোন গল্পগাথা। চরম আর পরম সত্য যা'—সেটাই জানবে আমার কাছ থেকে তোমরা। মা-তো থাকবেন তোমাদের সাথে। ভুল বললে, তিনিই প্রতিবাদে মুখর হবেন। কেন না, মাও জানেন সব কিছু। মিতভাষিণী তিনি, তাই শুনে নিও আমার কাছ থেকে।

ভোরের কুয়াশা ভেদ করে, নবারুণের আলো—দিক্ চক্রবালের সমস্ত প্রাণীকূলের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। বেদমন্ত্র ধ্বনিত হচ্ছে ঋষিদের পর্ণকুটীরে। এসো আমরা বুঝে নিতে চেষ্টা করি ঐ বেদমন্ত্রের অন্তর্নিহিত অর্থগুলি ঃ—

(১) শুনছো তুমি, দেবতাদের মেয়ে উষা, আমাদেরকে ধনরত্ন দাও! তোমার তো অন্য নাম বিভাবরী! ও' মেয়ে, আমাদেরকে দুটো খেতে দে মা! দু'টো খেতে দিলে, প্রভাতের মত না আমাদের মুখে আলোর দীপ্তি আসে—পেট ভরা বলে! (২) উষা, বেটী, তোর অনেক ঘোড়া আছে, গরু-মোষ আছে। তোর মিষ্টি মিষ্টি কথায় মন ভরে, কিন্তু পেটতো ভরে না; কিছু ক্ষমতা, আর টাকা পয়সা কিছু দে, মা। আমরা না তোর সন্তান। (৩) বহুকাল থেকে তোর পেছন পেছন আসে সকাল, আজও এসেছে। টাকা পয়সা আয় উপায়ের জন্য, যেমন মানুষ অকূলেও নাও ভাসিয়ে দেয়, সাজিয়ে গুছিয়ে সে নাও-টা; সেতো হয় তোরই ইঙ্গিতে! (৪) উষা মা, পণ্ডিতেরা দানধ্যান করে ওই সকালেই। মহাঋষি কণ্বের পুত্রের মত ঋষিও, তোকে ডাকে ওই সক্কাল বেলায়! (৫) বুঝলি মা উষা, পাকা গিন্নীমার মত সকলকেই তো তুই দেখিস, ঠ্যালা মেরে জাগাস। ঠ্যাং-ও'লা—পাখাও'লা জীবরা তোরই তো কথা শুনে! (৬) চেষ্টা চরিত্র করে সব কাজে এমন লোককে না তুমি কাজের দায়িত্ব দাও? ভিখারিরাও ভিক্ষে করতে বেরোয় তোমার ডাকে। রাতের শিশির ছিটিয়ে দিয়ে সমস্ত চরাচরে—তুমি চলে যাও—সবকিছু শীতল করে। তোমার ডাক শুনে পাখীরাও আর থাকতে পারে না তাদের বাসায়। (৭) সূর্য্য যেখান থেকে উঁকি দেয়, সেখান থেকেই তোমার শতরথের একটা দল মানুষকে জাগাতে আসে, ডাক দিতে আসে! (৮) সমস্ত প্রাণী তোকে প্রণাম জানাচ্ছে মা। আলোকময়ী তুই—ধনবতী তুই, সগ্গের মেয়ে তুই—তোকে দেখে ঈর্ষাতো

করবেই, তোকে শোষণ করবার প্রয়াসও ওদের থাকতে পারে। দে, হটিয়ে দে! (৯) ওরে ও সপ্নের মেয়ে, একটু আহ্লাদে লুটোপুটি কর মা। দিন চলে যাচ্ছে অর্থ দে, সম্পদ দে। বড্ড অন্ধকার, আলো ছড়িয়ে দে বেটী! (১০) দেখো তুমি নেত্রীর স্থান অধিকার করে আছো। দেখো, এই যে আমাদের অন্ধকারের বিরুদ্ধে লড়াই, সেটা না তোমার উৎসাহেই! সু-উচ্চ রথে চড়ে তুমি এসো মাগো—বিভাবরী, ধনধান্যে আমাদেরকে ভরে দাও, আমাদের ডাককে ফিরিয়ে দিও না মা! (১১) মাগো, এই আমরা, যতকিছু খাদ্যগ্রহণ করি, তার সবগুলোই তো তোমাকে আমরা দিচ্ছি তুমি তা' নাও। আর শুভকার্য্য করা অহিংস ঋষিদেরকে যজ্ঞে ডাকো! (১২) মা ঊষা, সপ্নের ওই দেবতাগুলোকে একটু পান-ভোজন করতে ডাক মা। গোয়ালভরা গোরু-ঘোড়া-মোষ দে, অর্থে ধনে ভরিয়ে দে মা। ক্ষমতাও দে, যাতে করে ক্ষুধার অন্ন স্বস্তিতে ভোগ করতে পারি। (১৩) এই যে এই তুমি ঊষা, শত্রুর দমনের জন্য তুমি আমাদের বরণীয়া। সুন্দর রূপ দাও আমাদের, ভোগে আসে এরকম সম্পদ তুমি আমাদেরকে দাও। (১৪) দেখো, আগেকার মুনি-ঋষিরা তোমাকে পূজা করেছেন আর দু'মুঠো অন্নের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন। তো তুমি সে সব কথা জেনে, তুষ্ট হও মা আমাদের উপর! (১৫) আলোকের ওই চাবি দিয়ে, তুমি আকাশের দরজা খুলে দিয়েছ। তবেতো তুমি আমাদের শান্তি-স্বস্তি-অর্থ সম্পদ সবকিছুই ব্যবস্থা করতে পারবে! (১৬) ঊষাময়ী মাগো—নানাবিধ সম্পদ তুমি আমাদেরকে দাও। গাভী দাও, সম্মান দাও, শত্রু নাশ করো। তুমিতো ক্রিয়াময়ী—তুমি দান করো আমাদেরকে অন্ন!

.............ঋগ্বেদ/৪৮ সূক্ত/১ম মণ্ডল/মন্ত্র ১-১৬ (স্বচ্ছন্দ অনুবাদ)

ঊষার সন্তান হিসাবে পরিগণিত বালার্ক, রাত্রির শয্যা থেকে আড়মোড়া ভেঙ্গে জেগে উঠেছে। পাঠাভ্যাসে নিয়োজিত ঋষি-বালক-বালিকারা! পরিশুদ্ধ দেহমন গুরু সান্নিধ্যে উপবেশন করেছে তারা।

"ঊষো ভদ্রেভিরা গহি দিবাশ্চিদ্রোচনাদধি।
বহন্ত্বরুণপ্সব উপ ত্বা সোমিনো গৃহম।১।
সুপেশসম্ সুখং রথং যমাধ্যস্থা ঊষত্বম্।
তেনা সুশ্রবসম্ জনং প্রাবাদ্য দুহিতর্দিব।২।
বয়শ্চিত্তে পতাত্রিনো দ্বিপচ্চতুষ্পদর্জুনি।
ঊষঃ প্রারগ্নৃতুরনু দিবোহন্তেভ্যস্পরি।৩।
বুচ্ছন্তী হি রশ্মিভির্বিশ্বমাভাসি রোচনম্।
তাং ত্বামুষর্বসুযবো গীর্ভিঃ কন্বা অহূষত।।৪।।

...........(ঋগ্বেদ/১ম মণ্ডল/সূক্ত-৪৯/মন্ত্র ১-৪)

আমার অনুবাদ ঃ—(১) শুনতে পাচ্ছো তুমি ঊষা, আলো ঝলমল আকাশের থেকে তুমি নেমে এসো ওই মেঘেদের চূড়ায় পা রেখে। তোমাকে সোমপান করাতে পারবে এমন যজমানের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবো আমি। (২) তোমার রথটা খুবই সুন্দর—সেটা চড়েই তুমি এসো, তোমাকে ঘৃতান্ন দেবে যজমানেরা! (৩) ফর্সা ফর্সা শরীর নিয়ে, তুমি যখন আসবে আমাদের এখানে, তোমাকে এক পলক দেখেই, দু-পেয়ে, চার-পেয়ে, পাখাও'লা জীবেরা নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে, এই পৃথিবীর বুকে। (৪) আমিতো ঋষি কণ্বপুত্র, নাম আমার প্রষ্কণ্ব ঋষি—বলি কী, তুমি এলে, আলো আসবে—অন্ধকার আর থাকবে না। তাই তুমি এসো মা।

..........(ঋগ্বেদ/১ম মণ্ডল/সূক্ত-৪৯/মন্ত্র ১-৪)

"কস্ত উষঃ কধপ্রিয়ে ভুজে মর্ত্যো অমর্ত্যে।
কং নক্ষত্রে বিভাবরী।২০।
বরং হি তে অমন্মহ্যান্তদা পরাকাৎ।
অশ্বে ন চিত্রে অরুষি ।২১।
ত্বং ত্যোভিরা গাহি বাজেভির্দুহিতর্দিবঃ।
অস্মে রয়িং নি ধারয়।২২।

...........(ঋগ্বেদ/১ম মণ্ডল/সূক্ত-৩০/মন্ত্র ২০-২২)

বাংলা মানে ঃ—[(২০) বড্ড আদর খেতে ভাল লাগে তোমার। বলতে পারো কা'কে তোমার পছন্দ হয়? কার উপর বিশেষ প্রভাব ফেলতে তোমার মন উস্‌খুস্‌ করে? (২১) বড্ড ছটফটে তুমি, চারদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াও। এই কাছে আসো-তো, আবার দূরে পালাও। (২২) সগ্গ থেকে নেমে আয় মা ঊষা। আমার সময় ক্ষুধার অন্ন আর ধন রত্ন আনিস্‌ মা।]

আজকে পৃথিবীটাকে যেন নতুন লাগছে কুশের। দাদা সে লবের। ভাইকে ছেড়ে একাকী উঠছে না তার পা, ঋষি বাল্মীকির দিকে এগিয়ে যেতে। তাই সমবেত ঋঙ্‌মন্ত্রে সমস্ত ঋষি আর ঋষি-বালক-বালিকারা যখন প্রণাম জানাচ্ছে লোকমাতা ঊষাকে, তখন তারও হাত উঠে গেল প্রণামের ভঙ্গিতে। আর তাই দেখে, লবেরও জড়ো করা দুই হাত বিহুল হয়ে উঠে গেল, কোন প্রশ্নকে না খুঁচিয়ে। তারপর পা বাড়ালো দুই ভাই, মহাঋষি বাল্মীকির কুটীরের পানে। দুয়ার প্রান্তে দণ্ডায়মান ঋষি স্বাগত জানালেন তাদের।

—— "সুস্বাগতম্‌ বৎস কুশীলব! দূর থেকে দেখলাম, তোমরা স্বাগত প্রণাম জানাচ্ছো জননী ঊষাকে। শুভ হোক, তোমাদের প্রতিটি প্রত্যুষ, এমনি করে। নিত্য নব পবম অনুভবে, পরিপূর্ণ হোক তোমাদের অন্তর। এই কামনা আর প্রার্থনা করি জগৎ পিতার কাছে। এসো, তৃণাসনে উপবেশন করো বৎস। তোমাদের আজ বড়ো প্রফুল্ল লাগছে।"

—— "বেদমন্ত্র শুনতে আমাদের বড়ো সুন্দর লাগে, তাত! মনে হয় যেন সবটাই নিবেদনের সুর। বিদ্রোহ করতে এতটুকুও ইচ্ছে করে না।"

—"বিদ্রোহ তো, একমাত্র তারই করবার অধিকার আছে, যে সবটা বুঝে ফেলেছে। কোন কিছুর ইচ্ছাকৃত ভুল বা ভ্রান্তি, ধরে ফেলেছে। আর সে ভ্রান্তির সহজ উন্মূলন না হলে, **প্রতিবন্ধকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোকে বলে বিদ্রোহ। অর্থাৎ বিশেষ রূপে দ্রোহ বা প্রতিবাদ।** তো বৎস, সেটা করতে পারাটা তো **পৌরুষ** বলে সম্মান দাবী করতে পারে। আমাদের ভাল লাগবে, যদি সেই পৌরুষ তোমাদের দ্বারা অর্জিত হয়। ওই একটাই অস্ত্র এই জগতে আছে, যাকে মৃত্যুও পর্যন্ত, অতিক্রম করবার সাহস করে না।"

—— তাতঃ, আজ আমরা শুনতে চাই নুতন কোন কাহিনী। গতকালের সে দস্যুর কাহিনী আমরা বড়ই উপভোগ করেছি। সেই রকম কোন একটা ....।"

—— "বৎস, কাহিনী বলছো কেন তোমরা? ওটা তো ঘটনা। কোন ঘটনাতো, কাহিনী হতে পারে না। কাহিনীতে কহিয়ের কল্পনার মিশেল, আর তদনুরূপ রুচি মিশে যায়, যা' প্রায়শঃই সত্যকে আড়াল করে। আমি তোমাদেরকে যা' বলেছি, সেটা ঘটনা। কাহিনী বলতে যা' তোমরা বুঝো, তা' কিন্তু আমি তোমাদের পরিবেশন করিনি! আর সে ঘটনার সাক্ষী আমি নিজে!

—— তবে, বলুন অন্য কিছু। বলুন সেই ঋষির কথা, সেই দস্যুর কথা। এক জীবন থেকে আর এক জীবনে, তিনি কেমন করে খাপ খাইয়ে নিলেন?

—— না আজ বলবো, অন্য কথা। দস্যু-ঋষির কথা, অন্য সময় বলবো। একটা কথা আমি শুনলাম সীতা-মার কাছে যে, ঋষিবালক-বালিকারা তোমাদের ঘাসের মত নাম নিয়ে, ক্ষ্যাপায় তোমাদের। তাই নাকি গোঁসা হয়েছে ওদের উপর। তো পুত্র লব, আগে তো জানবে যে, কেন অমন নাম হলো তোমাদের! মাকে আমি কথা দিয়েছি, এ' ব্যাপারে তোমাদের ভ্রান্তি আমি হটিয়ে দেবো।

হাঁটবে তোমরা বুক ফুলিয়ে, জগতে ওই নাম নিয়ে। আর এ'ও জেনো লব, ওই দুটো নাম, আমিই তোমাদের রেখেছিলাম। তোমরা জন্মেছিলে যমজ। এমন একটা নাম রাখতে হ'ল—তাও হতে পেরেছিল যমজ। সমান সমান না হলে কী কোন বস্তু মিলতে পারে? যাই হোক, সে কথা জানবার আগে, এখন একটু অন্য কথা জানাই তোমাদের; খুব মন দিয়ে কিন্তু শুনবে।

এই যে আমরা, গাছপালা-পশু-পাখী, নদী-পর্বত-সাগর, সব কিছুরই চার রকম অস্তিত্ব আছে। আমরা খালি চোখে সাধারণতঃ একটাকেই দেখতে পাই। সেটা এই সামনেরটা— যেমন আমাকে দেখছ তোমরা, তোমাদের দেখছি আমি। বাকী তিনটাকে

আমরা দেখতে পাই না। যোগের কী ধ্যানের দৃষ্টি দিয়ে সেগুলোকে দেখে নিতে হয়।

এই শরীরটা মরে গেলে, এটাকে পুড়িয়ে ফেলতে হয়, কী সমাধিস্থ করতে হয়। বাকী তিনটা অস্তিত্ব বা রূপ, থেকেই যায়। তার ধ্বংস কোনকালেই করা সম্ভব নয়। বিশ্বধ্বংস হয়ে গেলেও, ওরা থাকেই আগের মত। তাই আজ এই পৃথিবীটা, আর তার সমস্ত বস্তুকে ঈশ্বর ফিরিয়ে দিতে পারেন, আপন সৃষ্টির উল্লাসে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বর্ষ পরেও।

এই পৃথিবীতে ঐসব প্রাণীর যে যে পরিমান লোভ-লালসা, ঘৃণা-ঈর্ষা-অহংকার কী বিদ্বেষ ছিল, ছায়া ছায়া শরীরের মধ্যে সেগুলোকে নিয়ে, তোমার আমার মাঝখানে ঘুরে বেড়ায় তারা। ক্ষতি করতে চুরি করতে, বিপদ-বিসম্বাদ বাধাতে চায় ওরা, আমাদের অসাক্ষাতে থেকে। আর কোন কিছু অপ্রিয় ঘটে গেলে, আমরা না বুঝেই বলি, গ্রহফের বা কপালদোষ।

আসলে কিন্তু, এসব ঘটায় ও'রাই। এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সময়, যা' ওরা চাইতো তা' হয়তো পূর্ণ হয়নি বা করতে পারেনি। তাই সেটাকেই আবার সফল করতে চায় ওরা, সকলের অসাক্ষাতে থেকে। মুনি ঋষিরা ধ্যানযোগে বুঝতে পেরেছেন, ওদের সেই অকল্যানকর কাজের দিক। তাই তাঁরা যা' বুঝেন, সাধারণ্যে তা' বুঝে না।

বৎস লবকুশ, আমিও সেজন্যই—ও'সব কিছু দেখতে পাই বলেই, তোমাদের রক্ষাকবচ পরাতে, কিছু পন্থা অবলম্বন করেছিলাম। সমস্ত পীড়ার কোন না কোন প্রতিকার থাকেই। ওই যে কুশতৃণের জঙ্গল দূরে দেখতে পাচ্ছো, এই রকম বিপত্তি দূর করতে পারে তা।' নাজুক নাজুক শরীর ওই কুশের, কিন্তু ক্ষমতায় অদ্বিতীয় ওই তৃণ। প্রতিটি মাঙ্গল্যকর্মে, তাই সাধু-ঋষিরা ব্যবহার করেন, সম্মার্জনী বা অঙ্গুরীয়রূপে।

তোমাদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য, আমি হাতে নাতে তোমাদের এখনই একটা ব্যাপার দেখাবো। চলো আমার সাথে। এই চিমটা দিয়ে আমি ওদের মূল খুঁড়ে খুঁড়ে তোমাদের দেখাবো যে, ওখানে আদ্রক জাতীয় বা আদার মত মূল আছে। তা' অতি অতি সুন্দর গন্ধ ছড়ায়। কোন কিছুকে স্পর্শ করলে, আপন গন্ধ আর মহিমাও, সে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত করে ফেলে তার মধ্যে। শুধু শুভ করে যা', অশুভের হাত থেকে বাঁচায় যা'।

কথা প্রসঙ্গে যখন আদ্রক বা আদার কথা এলো, তখন ভেষজবিদ্যাও কিছু শিখে নাও তোমরা, ভবিষ্যতে কাজে লাগবে তোমাদের। কোন কিছুই ফেলা যায় না। সবই কোন না কোন সময় কাজে লাগেই। তোমার না কাজে লাগলেও, অপরের তা' লাগতে পারে। শিখে নিতে অবহেলা করতে নাই।

"সৌপর্ণমসি অপাগ্নে অগ্নিমাসাদং

জহি নিষ্ক্রব্যাদং সেধ।

মাদেব যজং বহ।

ত্বা ক্ষত্র সজাত বন্যুপদধামি।"

.... (অথর্ববেদ / ১৩শ মণ্ডল / সূক্ত-৩ / মন্ত্র-২৭)

মানেটাও শুনে নাও তোমরা। **"তুমি পত্রগুচ্ছে সেজেছো। বড় মনোময় তোমার পত্রসজ্জা বা পোষাক। বিশ্বে যত সুন্দর ভেষজ আছে, তাদের মধ্যে তুমিও অনুপম একটি। রোগের বা পীড়ার প্রকোপ তুমি দূর করতে পারো। শরীরের তিন রকম মন্দীভূত অগ্নিকে বা ক্ষমতাকে তুমি বাড়িয়ে তুলতে পারো। তুমি মাংসকেও জীর্ণ করতে পারো বা সহজপাচ্য করে তুলতে পারো। তোমার স্থান অগ্নির ঠিক পরেই অর্থাৎ অগ্নির তুল্য সম্মানের অধিকারী তুমিও।"**

এসো, আমরা খুঁড়ে দেখি ওই কুশতৃণের পাদমূলের মৃত্তিকা। আর আগে ওদের কাছে চেয়ে নাও ক্ষমা, এই বলে যে—**"আমাদের কাজে যে ব্যথা তোমরা পাবে, হে তৃণবন্ধু—তার জন্য ক্ষমা কোরো। জ্ঞান বর্ধনের জন্য আমাদের এই প্রচেষ্টা। অন্য কোন বালখিল্য কর্ম করতে আমরা তোমাদের বিরক্তি বা যন্ত্রনার কারণ হচ্ছি না। আমাদের সদিচ্ছাকে তুমি স্বাগত জানাও।"** চিমটের ডগা দিয়ে এক এক করে, তুলে ফেললেন ঋষি কয়েকটা মূল। স্বস্থানে মাটিগুলোকে সরিয়ে দিয়ে, তমসার জলে ধুয়ে ফেললেন সেগুলো। তারপর পত্র পাত্রে সেগুলো রেখে বললেন ঃ

—— বৎস লবকুশ, এদের চেহারাটা দেখো, কেমন সেই আদ্রকের মত গ্রন্থিল আর কুণ্ডলায়িত। বৎসগণ, বেদাভ্যাসী ব্রাহ্মণগণ এই কুশতৃণের মর্য্যাদা দিয়ে থাকেন সর্বাগ্রে। শুনে নাও ব্রহ্মপুরাণের ব্রহ্মসূত্রের এই শ্লোকটা ঃ—

"বিষ্টরাস্তু কুশা এতে ব্রাহ্মণা প্রতিরূপকাঃ।

যজ্ঞকার্য্যেষু দৈবেষু পৈত্রেষু শুভকর্মসু।।

.... ব্রহ্মপুরাণ।

এসো—আমরা এই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত কথাগুলোকে, বুঝবার চেষ্টা করি। ভাল লাগবে শুনতে তোমাদের। **"এই কুশ ঘাসগুলো হলো ব্রাহ্মণের প্রতিনিধি। যাগযজ্ঞে, দৈব আরাধনার সকল কাজে, এমনকি—পৈত্রিক ও' সকল শুভ কাজে ব্রাহ্মণ যেমন সর্বাগ্রে সম্মান পান, তেমনি ওইসব কাজে সর্বাগ্রে, কুশতৃণকেও উপাদান হিসাবে মেনে নেবে।"**

আবার শুনো অথর্ব বেদ কী বলেছেন ঃ—

"অক্রন্ কর্ম কর্মকৃতঃ সহবাচঃ ময়োভবা।

ভেষজমসি ভেষজং বর্হি পুরুষায় ভেষজম।।

............অথর্ববেদ/মণ্ডল-৫৩/সুক্ত-২/মন্ত্র ৬১

এসো, ভেতরের মানেটাকে জেনে নিই—"মুনিগণ যাঁরা মননেই সুখী হন, যাঁদের বারুণীস্নানে চিত্তশুদ্ধি হয়েছে, যারা সুস্থ দেহ আর যাজন কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন, তাঁরাও আজ তোমার প্রশংসায় মুখর। কেননা তুমি হে কৃশতৃণ, জীবন থেকে সমস্ত কু-কে তুমি সরিয়ে দাও। পাপকে দূর করো। তুমি ভেষজ তো বটেই, তাছাড়া দেহমনের ভয়কেও তুমি হটিয়ে দাও। প্রাণের পরিপূর্ত্তির সম্যক ভেষজ বলে, পুরুষানুক্রমে আমরা তোমাকে বরণ করে নিয়েছি।"

"বৎস, তাহলে এবারতো তোমাদের আর বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না যে—কেন আমি তোমাদেরকে, তোমাদের জন্মমুহূর্ত্তে এই কুশতৃণের দ্বারা, সম্মার্জনা করেছি। ভূতাপ ভয় অন্যান্য উপসর্গও, যেমন এই তৃণনাশ করতে পারে, তেমনি বাড়বৃদ্ধি ঘটাতে, নীরোগ করতে এর জুড়ি মেলা ভার।

জ্যেষ্ঠ যে, তাকে কুশের অগ্রভাগ দ্বারা মার্জনা করতে হয়। আর কনিষ্ঠ যে, তাকে মার্জনা করতে হয় 'লব' দ্বারা। অর্থাৎ মধ্যভাগ থেকে মূল পর্য্যন্ত যে অংশ, তার দ্বারা। বৎস লব, তোমার ক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছিল। কারণ তোমার এই শরীর, কুশের জন্মের পরে এই পৃথিবীর আলো দেখেছিল। এখন কী মনে হচ্ছে, ঘাসের নামের মত অর্থহীন ওই নাম তোমাদের!"

সমবেত ঋষি বালক বালিকারা, অত্যাশ্চর্য্য এই কথা শুনে—ভুলে গেল সব অবজ্ঞা। সবাই জড়িয়ে ধরলো তারা লব-কুশকে। দূর হতে সীতা লক্ষ্য করলেন সব। বড় প্রীত হয়েছেন তিনি। মহাঋষি দূর করে দিয়েছেন, সব বালখিল্যতা, লব-কুশের মন থেকে। মনে মনে প্রণাম জানালেন তিনি, মহাঋষিকে। বিশ্বমাতা আপন কন্যার মত হর্ষমুখী হয়ে, দাঁড়ালেন ঋষির সামনে।

(প্রথম খণ্ড সমাপ্ত)





ঈশ্বরপ্রতিম প্রবাদ-পুরুষ অঘোরীবাবার সাম্রাজ্য বক্রেশ্বর নদীর উভয়তীর। এই মহাশ্মশানে আজ থেকে প্রায় ১৫০ বছর আগে থাকতেন।







ঋষি অষ্টাবক্র পূজিত বক্রেশ্বর শিব। তাঁরই নাম অনুসারে এই শিবের নাম হয়েছে।

বার্ত্তা রেখে গেলাম

সবিনয়ে জানাচ্ছি যে

(১) এই বই শুধু নর্মদা-পরিক্রমার প্রচারের জন্য—ব্যবসার জন্য নয়।

(২) মূল্য হিসাবে যে পয়সা নেওয়া হয়, তা শুধু ছাপার এবং অন্যান্য খরচ ওঠাবার জন্য।

(৩) ক্যুরিয়ারে /ডাকযোগে নিলে প্রকাশকই ডাক মাশুল বহন করবে।

(৪) প্রকাশক ও লেখকের বাড়ী থেকেও সমস্ত ছুটির দিনে হাতে হাতে নেওয়া যেতে পারে।

(৫) ৯ম থেকে ১২শ খণ্ড লেখা হয়ে পড়ে আছে। অর্থাভাবে ছাপা হয়ে উঠছে না। সব সুধী পাঠকের কাছে যথাসাধ্য ভিক্ষা চাইছি।

(৬) ঠিকুজী / কোষ্ঠীর কপি পাঠালে, বিনামূল্যে আর প্রতিকার বলে দেওয়া হয়। ডাকটিকিট সহ খাম পাঠাবেন। কবচও তৈরী করা হয়।

প্রেমানন্দ প্রামাণিক
বিদ্যাধরপুর, সোনারপুর, কোলকাতা-১৫০
২৪ পরগনা (দক্ষিণ)
(বিদ্যাধরপুর স্টেশনের কাছে)

সোমানন্দ অবধূত
ফোন-(০) ৯৮৩০৪৭৯৩২৪

এই লেখকের অন্যান্য বই